জলধর সেন

হিমালয়

হিমালয়

জলধর সেন

সম্পাদনা : বারিদবরণ ঘোষ

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

www.pathagar.com

প্রথম 'মিত্র ও ঘোষ' সংস্করণ, মাঘ ১৩৯৬
সপ্তম মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪২০

—পঁচাত্তর টাকা—

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা : মেমোরিয়াল আর্ট
আলোকচিত্র : দীপংকর সেনগুপ্ত

HIMALAYA
A travelogue by Jaladhar Sen. Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd. 10 Shyama Charan Dey Street, Kolkata 700 073

Price Rs. 75/-

ISBN : 81-7293-105-0

WEBSITE : www.mitraandghosh.co.in

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ হইতে
পি. দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও মানসী প্রেস, ৭৩ শিশির ভাদুড়ি সরণী, কলকাতা ৭০০ ০০৬
হইতে প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

www.pathagar.com

উৎসর্গ-পত্র

ভাওয়াল-অধিপতি, সুধিগণাগ্রগণ্য
শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী
বাহাদুর করকমলেষু—

রাজন,

আপনি সুশিক্ষিত, সাহিত্য-সেবী, বিদ্যোৎসাহী, বদান্য এবং বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের আশ্রয় ; আপনি বঙ্গমাতার সুসন্তান। তাই আপনার গুণমুগ্ধ এই দীন গ্রন্থকার আজ তাহার এই হিমালয় লইয়া আপনার সম্মুখে উপস্থিত। ভক্তিপূর্ণ এই ক্ষুদ্র উপহার দয়া করিয়া গ্রহণপূর্ব্বক আমাকে কৃতার্থ করুন।

বিনয়াবনত
শ্রীজলধর সেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

পৃথিবীর সকল সভ্যদেশের সাহিত্যেই ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থের প্রাচুর্য লক্ষিত হয় ; দেশভ্রমণ শিক্ষার একটি অঙ্গ ; দেশভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না, এমন লোক বোধ করি আমাদের দেশেও এখন একান্ত বিরল।

হয় ত ইহা মনুষ্য জীবনের একটি স্বাভাবিক বৃত্তি। যাঁহারা কোন রকমে বি-এ, এম-এ পাশ করিয়া উপার্জনের পন্থায় দশটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত আফিস করেন এবং অর্থোপার্জন ব্যতীত অন্য চিন্তার অবসর পান না, তাঁহাদের তৃষিত হৃদয়ও অনতিদীর্ঘ অবকাশকালে রথচক্র-মুখরিত ইষ্টকবদ্ধ রাজপথ এবং অট্টালিকা সঙ্কুল শহরের দূষিত বায়ুপ্রবাহ পরিত্যাগপূর্বক মুক্ত প্রকৃতির চিরবৈচিত্র্যময় শ্যামলবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বিশ্ববিধাতার প্রেমধারা পান করিবার জন্য অধীর হইয়া ওঠেন। কেহ দারজিলিং যান, কেহ শিমলাশৈলে আশ্রয় গ্রহণ করেন, কেহ বা শস্যশ্যামলা নদীমেখলা পল্লীগ্রামের কুঞ্জকুটীরে বসিয়া বিরাম সুখ অনুভব করেন।

ইউরোপের কথা ছাড়িয়া দিই ; সেখানে মানুষের অর্থ, সুযোগ, শক্তি আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক। লাপলাণ্ডের ছয়মাসব্যাপী দীর্ঘরাত্রি ইউরোপীয় পর্যটকের চক্ষুর সম্মুখে কেন্দ্রীয় ঊষার বিমল বিভা ব্যক্ত করে ; উত্তর মেরুর চিরহিমানীরাশির মধ্যে তাঁহারা সঙ্গীহীন, অবলম্বনশূন্য দীর্ঘ সাধনায় কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করেন ;—তাঁহাদের সাহিত্য তাঁহাদের সুকঠোর মনুষ্যত্বের স্মৃতিচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া জগতের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

আমাদের ক্ষুদ্র বাঙ্গালী জীবনে সে অর্থ, সে সুযোগ, সে শক্তি লাভ করা দুরূহ। জাহাজে চড়িয়া বিদেশগমনে সামাজিক অধিকারই নাই, কিন্তু চক্ষু থাকিলে, হৃদয় থাকিলে জাহাজে চড়িয়া বিদেশে না গিয়াও আমাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-স্পৃহা চরিতার্থ হইতে পারে। আমাদের ভারতবর্ষকে ভগবান জগতের শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক শোভা হইতে বঞ্চিত করেন নাই। এক হিমালয় তাহার নিভৃত হৃদয় কত রত্ন নরচক্ষুর অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছে, আমরা কি তাহার কিছু সন্ধান রাখি? শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ, শত শত গিরিশৃঙ্গের মুক্ত শোভা, সহস্র নির্ঝরের অস্ফুট কলতান, কত বিচিত্র পুষ্পলতা, কত প্রাচীন স্মৃতি বিজড়িত সুপবিত্র তীর্থ, এই হিমালয়ের দুর্গম বক্ষে সংযুক্ত রহিয়াছে। ইউরোপ হইলে এই এক হিমালয়ের সহস্র সহস্র বিভিন্ন মনোরম দৃশ্য অবলম্বন করিয়া বহু পুস্তক বিরচিত হইতে পারিত। কিন্তু আমাদের?—আমাদের একখানিও নাই।

কেন নাই, একথার উত্তর অতি সহজ। সেখানে রেলপথ যায় নাই, অনেক স্থানে পথ পর্যন্তও নাই, আহারসামগ্রী সেখানে পাওয়া যায় না, শয়নের সুবন্দোবস্তও সে অঞ্চলে নাই। আমাদের ন্যায় শ্রমবিমুখ, বিলাসপ্রিয়, সুখ-লিপ্সু বঙ্গ যুবক শখের খাতিরে সেই সকল বিপদসঙ্কুল দুর্গম পার্বত্যপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে যাইবেন, ইহা একেবারেই অসম্ভব। শিক্ষিত সৌখিন লোকের সে সকল স্থানে গতিবিধি নাই। যে সকল পুণ্যলোভেচ্ছু মুক্তিপথাবলম্বী সন্ন্যাসী এই সকল দুর্লভ দর্শন স্থানে জীবন বিপন্ন করিয়া পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বোধ করি একজনেরও এই ইচ্ছা বা ক্ষমতা নাই যে, এই পুণ্যময় পার্বত্যভূমির মধুর কাহিনী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের পাঠক সমাজের কৌতূহল নিবারণ করেন।

www.pathagar.com

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন বাবু জলধর সেন মহাশয় একবার সংসার সাগরের ঘূর্ণাবর্ত ভেদ করিয়া তাঁহার সংসার-বাস-বর্জিত কর্মহীন জীবন মৃত্যুর মহিমময় তটে নিক্ষিপ্ত করেন, সংসারের সুখের প্রলোভন ছাড়িয়া শান্তির আশায় তিনি হিমালয়ের বিজন বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা কতদূর পূর্ণ হইয়াছিল, সে সংবাদ আমরা রাখি না, কিন্তু তাঁহার বিরহী জীবন আমাদের বঙ্গভাষার দীনভাণ্ডারে যে মহার্ঘ্য রত্ন, তাহা চিরদিন বঙ্গ সাহিত্য অলঙ্কৃত করিয়া রাখিবে বলিয়া আশা হয়। বিধাতা তাহার হৃদয়ের প্রিয়তম সামগ্রী হরণ করিয়া তাহার হৃদয়ের তন্ত্রীতে যে আঘাত করিয়াছিলেন, তাহার করুণ ঝঙ্কার প্রত্যেক বঙ্গীয় পাঠকের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইবে। বঙ্গভাষার সৌভাগ্য, তিনি হৃদয়ে গভীর আঘাত পাইয়া হিমালয়ের অমর কাহিনী বঙ্গভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এ আঘাতে তাঁহার যতই ক্ষতি হউক, বঙ্গভাষার মহোপকার হইয়াছে : পাঠকগণও একটি বিস্ময়পূর্ণ, অদৃষ্টপূর্ব, অসাধারণ দৃশ্য পরম্পরার সহিত পরিচিত হইয়াছেন।—ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে, নাইটিংগল পক্ষী কণ্টকের উপর বক্ষ স্থাপন না করিয়া কখনও গান গাহিতে পারে না। কবিবর শেলীও বলিয়াছেন, 'Our sweetest songs are those that tell of the saddest thoughts'—তাই বুঝি জলধরবাবুর ভ্রমণকাহিনী এত সুমধুর।

জলধরবাবু স্বভাবভীরু লোক, সহজে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহেন না। বর্তমান ভূমিকা লেখকের সহিত এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ বিষয়ে কিছু সম্বন্ধ আছে। আমি তাঁহার ডাইরীখানি তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া যদি হিমালয়-কাহিনী যথানিয়মে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশ না করিতাম, তাহা হইলে তিনি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া বঙ্গভাষায় এ রত্ন প্রকাশ করিতেন কিনা এ সম্বন্ধে আমার ও যাঁহারা জলধরবাবুকে জানেন তাঁহাদের অনেকেরই সন্দেহ আছে। আজ স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে এই কাহিনী প্রকাশিত হওয়ায় আমার যত আনন্দ, তাহা অপেক্ষা অধিক আনন্দ আর কাহারো হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা জানি না ; এবং সেই জন্যই আজ অতীত বর্ষের এই কাহিনী স্মরণ করিয়া সে কথার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক বোধ করিলাম না।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

www.pathagar.com

সম্পাদকীয়

।। নেপথ্যলোক ।।

ভ্রমণপিপাসুদের কাছে হিমালয়ের বিস্ময় যতখানি আকর্ষণীয়, পৃথিবীর আর কোনো রম্যভূমির আকর্ষণ সম্ভবত ততখানি নয়। এর সুবিশাল বিস্তার, সুউচ্চ শৃঙ্গারাজি, সুবিস্তীর্ণ তুষারদেহ অজানা গুহা, অজ্ঞাত বিস্ময় যুগে যুগে মানুষকে উদ্বুদ্ধ, বিস্মিত এবং হাতছানি দিয়ে চলেছে। এক দুর্নিবার আকর্ষণে মানুষ জীবন ও মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে এর সন্নিকৃষ্ট হবার চেষ্টা করেছে। সে ইতিহাস হিমালয়ের মতোই বিস্ময়কর এবং গম্ভীর। শত সহস্র গুহাবাসী অপরিজ্ঞাত সন্ন্যাসী ও পরিব্রাজকের কাহিনী আমাদের জানাশোনার বাইরেই থেকে গেছে।

তবুও আমাদের কাছে এখন যে বিশাল ভ্রমণসাহিত্য উপস্থিত হয়েছে, তার পরিমাণ নিতান্ত তুচ্ছ নয়। বাংলা ভাষায় রচিত কিছু ভ্রমণ-সাহিত্য এখন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ-সাহিত্যের তুল্যমর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়, হিমালয়-কেন্দ্রিক বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্যের সূচনা কখন থেকে—তাহলে আমরা বিগতকুণ্ঠ হয়ে বলতে পারবো—জলধর সেনের 'হিমালয়' থেকেই।

বাঙালীদের মধ্যে প্রথম সার্থক ভারত-পর্যটক সম্ভবত চৈতন্যদেব। বস্তুত তাঁর ভ্রমণ-বিবরণ দিয়েই বাংলা সাহিত্যে অসচেতন ভ্রমণ-সাহিত্যের উদ্ভব—একথা বলা সম্ভবত অত্যুক্তি হবে না। তবে সবচেয়ে সচেতন বাংলা ভ্রমণকাহিনীটি সম্ভবত বিজয়রাম সেন রচিত তীর্থ-মঙ্গাল। কবি বিজয়রাম সেন রাজসদৃশ ধনী কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের ভারত-ভ্রমণের সঙ্গী হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। ভ্রমণকালে তিনি যে বিবরণ কাব্যাকারে লিখে রেখেছিলেন তা সম্পূর্ণ হয় ১১৭৭ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে—এখন থেকে প্রায় ২২০ বছর আগে। এর আগেই তাঁরা বেড়াতে বের হয়েছিলেন নৌকাযোগে। কলকাতা থেকে যাত্রারম্ভ করে তাঁরা নবদ্বীপ, হাঁড়রা, ঝিনুকঘাটা, টুঙ্গিবালী, জলঙ্গী, রাজমহল, মুঙ্গের, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বিন্ধ্যগিরি, রামনগর, ফতুয়া, চৌকিঘাটা দর্শন করে পুনশ্চ মুঙ্গের, মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ, নদীয়া হয়ে খিদিরপুরে ফিরে আসেন। বিজয়রাম পুঁথির আকারে যে ভ্রমণবিবরণ লিখে রাখেন, সেটি সম্পাদনাপূর্বক প্রাচ্যবিদ্যামহার্নব নগেন্দ্রনাথ বাবু ইংরেজি ১৯১৫, সন ১৩২২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশ করেন। তারপর থেকে এটি দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে এই বই আছে। এটিও পুনশ্চ প্রকাশযোগ্য মনে করি।

আধুনিককালে যাঁরা ভ্রমণে বের হন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় রামমোহনের। তবে তিনি কোনো ভ্রমণকাহিনী লিখে যাননি। রমেশচন্দ্র দত্ত ইংরেজিতে তাঁর বিদেশভ্রমণের কথা লিখে গেছেন Three Years in Europe বইতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদেশবাসের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র এবং ডায়েরীতে। এই সময়েই সঞ্জীবচন্দ্র রচনা করেন তাঁর সুখ্যাত 'পালামৌ'। স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারের প্রকাশের আগে এটি ১২৮৭-৮৯ বঙ্গাব্দের 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিকভাবে ছ'টি প্রবন্ধাকারে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

কিন্তু এসব কোনো রচনাই হিমালয়কে স্পর্শ করেনি। সেদিক থেকে উত্তরপ্রদেশকে

www.pathagar.com

কেন্দ্র করে প্রথম যে লেখাটি বাংলায় প্রকাশিত হয়, সেটি জলধর সেনের 'টপকেশ্বর ও গুচ্ছপাণি'। 'ভারতী ও বালক' পত্রিকার মাঘ ১২৯৯ সংখ্যায় এটি আত্মপ্রকাশের পর এই পত্রিকার পর পর দুটি সংখ্যায় 'সহস্রধারা' ও 'হৃষিকেশ' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৭ বর্ষ থেকে 'ভারতী ও বালক' নাম পরিবর্তন করে শুধু 'ভারতী' নামে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৩০০ বঙ্গাব্দের সূচনা থেকেই 'ভারতী'তে 'হিমালয়' ভ্রমণের ধারাবাহিক রচনা আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে।

অন্যদিকে ১৩০১ বঙ্গাব্দের সূচনা থেকে 'সাহিত্য' পত্রিকায় জলধরের উত্তরপ্রদেশ ভ্রমণের নানা কাহিনী একে একে প্রকাশিত হতে থাকে। এগুলি পরে একত্রিত করে 'প্রবাস-চিত্র' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৫ বৈশাখ ১৩০৬, এপ্রিল ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে। ২০৮ পৃষ্ঠার এই বইটিতে প্রবাস-যাত্রা, গুরুদ্বার, কালাপাণি, কলুঙ্গার যুদ্ধ, টপকেশ্বর, গুচ্ছপাণি, চন্দ্রভাগা-তীরে, সহস্রধারা, মুশৌরী, তিহরী, অতিপ্রাকৃতকথা ও উত্তরকাশী প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়। অনেক পরে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে এর একটি 'পরিবর্তিত, পরিবর্জিত ও পরিবর্ধিত' সংস্করণ প্রকাশিত হয় স্কুল কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠোপযোগী সংস্করণ হিসাবে। আসলে এটি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার (১৯৪১-৪৩) দ্রুতপাঠ্য পুস্তক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল।

পরের বছর ১৩০৭ বঙ্গাব্দ, ১৯০০ সালে প্রকাশিত হল এই বহুখ্যাত 'হিমালয়' বইটি। ৩৩৯ পৃষ্ঠার এই বইটির ভূমিকা লেখেন লেখকের ছাত্র-কাম-বন্ধু দীনেন্দ্রকুমার রায় (জন্ম ১৮৬৯, জলধরের চেয়ে বয়সে ন'বছরের ছোট। 'হিমালয়' প্রকাশকালে লেখকের বয়স পুরো চল্লিশ বছর, এর ভূমিকা লেখক তখন একত্রিশ)। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হল 'পথিক'। এটিকে 'প্রবাস-চিত্র' এবং 'হিমালয়'-এর পরিশিষ্ট বলা যেতে পারে। ১৩১১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হল 'হিমাচল-বক্ষে'—'প্রবাস-চিত্র', হিমালয় ও পথিকে যাহা বলিতে পারি নাই, হিমাচল-বক্ষে তাহার কিছু বলিবার চেষ্টা করিলাম।' সাধুভাষায় লেখা 'হিমালয়ে'র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'হিমাদ্রি' প্রকাশিত হয় ১৩১৮ বঙ্গাব্দে। এছাড়া 'পুরাতন-পঞ্জিকা' এবং 'মুসাফির-মঞ্জিল' বই দু'টির মধ্যেও একাধিক হিমালয়-বিষয়ক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। ফলে এক জলধর সেনের কলম থেকেই হিমালয়-বিষয়ক ভ্রমণ-সাহিত্যের সূচনা হল বলা চলে। রামানন্দ ভারতীর (রামকুমার বিদ্যারত্ন, লীলা মজুমদারের দাদামশাই) হিমারণ্য 'সাহিত্য' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হতে থাকে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা থেকে। এটি সম্প্রতি এই 'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশনা থেকেই প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। সেদিক থেকে 'হিমালয়-সাহিত্যে'র দ্বিতীয় রচনা রামানন্দের, প্রথম 'হিমালয়-সাহিত্যে'র সূচক জলধর সেন। দীর্ঘদিন এটি অমুদ্রিত অবস্থায় থাকায় এ যুগের রসিক পাঠকের করায়ত্ত ছিল না। এখন হিমালয়-সাহিত্যের এই প্রথম নিদর্শনটি পুনশ্চ আমরা বিশাল পাঠকগোষ্ঠীর হাতে তুলে দিতে সমর্থ হয়েছি।

হিমালয়-ভ্রমণে লেখক দেশভ্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে বের হননি। কোনদিনও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। প্রথমা কন্যার জন্মের ১২ দিন পর মৃত্যু এবং তারও মাত্র ১২ দিন পর প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু ঘটলে জলধর সেন উন্মাদ-প্রায় হয়ে সংসারে বীতরাগ হয়ে পড়েন। তাঁর এই বেদনামথিত জীবন বাংলা সাহিত্যে হিমালয়-বৃত্তান্তের যে সূচনা কাল ব্যক্তিগত ক্ষতির কথা বিস্মৃত হলে, তা যে এদেশবাসীর পক্ষে মঙ্গলজনক হয়েছিল—তা অস্বীকার করা যায় না।

www.pathagar.com

সাহিত্য পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি জলধরকে অপরিসীম স্নেহ করতেন। তাঁর এবং তাঁর ভাই যতীশচন্দ্রের আগ্রহে 'প্রবাসচিত্র' প্রকাশিত হয় এবং প্রখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কে তার প্রকাশক হতে তাঁরা অনুরোধ করেন। গুরুদাস তখনই সম্মত হয়ে বলেন, আগে জানলে তিনিই এ বই ছাপতেন। আরও বলেন ভবিষ্যতেও এধরনের বই পেলে তিনি ছাপবেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি তিনি রাখলেন 'হিমালয়' প্রকাশ করে। প্রধানত তাঁর পরিবেষণার জন্যেই জলধরের হিমালয় জনপ্রিয়তা অর্জন করতে আরম্ভ করে, যদিও প্রথম পাঁচ বছর ধীরে ধীরেই এটি পাঠকসমাজে বিস্তৃতি পায়। পরবর্তীকালে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স তাঁদের বিজ্ঞাপন দিতেন এই ভাবে :

> জলধরবাবুর পুস্তকের নাম করিতে হইলে সর্বপ্রথম হিমালয়ের কথা বলিতে হয়। এই পুস্তকখানি লিখিয়া জলধরবাবু যদি তাঁহার লেখনীকে একেবারে বিশ্রাম দিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে সর্বপ্রধান ভ্রমণ-বৃত্তান্তের লেখক বলিয়া সাহিত্যজগৎ অভ্যর্থনা করিত।...

কুম্ভমেলায় বেড়াতে গিয়ে পূর্বপরিচিত এক বৃদ্ধ বাঙালী সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হওয়ার ঘটনা থেকেই জলধরের হিমালয়-ভ্রমণের সূচনা ঘটে। এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে জলধর পদব্রজে কেদারবদরী যান। আরও এক 'বৈদান্তিক' সন্ন্যাসী তাঁর সঙ্গী হয়ে পড়েন। এই ভ্রমণের বৃত্তান্তই 'হিমালয়'। মোট ১৮টি অধ্যায়ে এই ভ্রমণকাহিনী সমাপ্ত।

এই ভ্রমণ বিবরণের খসড়ার সূত্রপাত ঘটেছিল একটি ডায়েরির আকারে রচনার মধ্যে। তাঁর কাছে কাঙাল হরিনাথের গান সম্বলিত যে খাতা ছিল, তার শেষে সংযুক্ত সাদাপাতাগুলি জলধর ডায়েরি হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। হিমালয় ভ্রমণের সূচনা হয়েছিল ৫ই মে, ১৮৯০ মঙ্গলবার তারিখে। ৬ই মে ভোরে তিনি বদরিকাশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ৫ই মে থেকে ৮ই জুন পর্যন্ত নিয়মিতভাবে তিনি ডায়েরির আকারে তাঁর যাত্রা-বিবরণের খুঁটিনাটি লিখে রাখেন। এই ডায়েরি রচনা অবশ্যই সচেতনভাবে লিখিত হয়নি। কারণ এই বিবরণ কখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে, জলধর তা স্বপ্নেও ভাবেননি। 'কোন দিন আমার ভ্রমণ-কাহিনী মানুষের নিকট বলতে হবে, সে কথা তো তখন আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আর যে দেশে ফিরে আসবো, সে চিন্তা একদিনের জন্যেও আমার মনে হয়নি। ডাইরি লিখবার অভিপ্রায়ও আমার ছিল না।' (পাঠক, এই গ্রন্থের একেবারে শেষাংশ পড়লেই সব জানতে পারবেন)।

দেশে ফিরেও জলধর এটি প্রকাশের কিছুমাত্র তাগিদ অনুভব করেননি। কিন্তু তাগিদ এল শিষ্য দীনেন্দ্রকুমার রায়ের কাছ থেকেই। এই গ্রন্থে সংযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় রচিত ভূমিকাটি থেকে কিভাবে এই ডায়েরি 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে তা জানতে পারবেন। এবিষয়ে আরও কিছু বক্তব্য একটু পরেই নিবেদন করছি।

বইটি পড়তে পড়তে পাঠক আপনি বিস্মিত হয়ে যাবেন। নব্বুই বছর আগের হিমালয় আপনার সামনে প্রত্যক্ষবৎ হয়ে উঠবে। প্রকৃতি ও মানুষ এখানে পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠবে। লছমনঝোলার প্রাচীন ইতিহাস এখনকার ভ্রমণকারীর কাছে জানা নেই। এখানে তার ইতিহাস জানতে পারবেন এবং এটি যে কলকাতারই এক ব্যবসায়ী

www.pathagar.com

বহু অর্থব্যয়ে নির্মাণ করেছিলেন জেনে পুলক অনুভব করবেন। বার বার রবীন্দ্রনাথকে আবির্ভূত হতে দেখে আপনার কাব্যশক্তি স্ফূর্তিলাভ করবে। যে-সময়ে যানবাহনের এবং পথের সুগমতার কোনোপ্রকার আনুকূল্য ছিল না, সে সময়ে পদব্রজে ভ্রমণের লোমহর্ষক বিবরণ প'ড়ে আপনি রোমাঞ্চিতও হবেন। আর এখনকার সঙ্গে তুলনা করে লেখকের প্রতি শ্রদ্ধান্বিতও হবেন। নানা অজানা তথ্য আপনাকে সমৃদ্ধ করবে। সাধারণ লোকের ধারণা অলকানন্দা গঙ্গায় এসে মিশেছে। দেবপ্রয়াগ গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমে অবস্থিত। এখানে পৌঁছে হয়তো আপনারও এমনতর ধারণা হবে। কিন্তু জলধর বলেছেন গঙ্গাই অলকানন্দায় এসে মিশেছে। গাড়োয়ালিদের সঙ্গে বাঙালীদের তুলনাপ্রসঙ্গে আপনার মধ্যে কৌতুক সৃষ্টি করবে। পড়তে পড়তে এই প্রাঞ্জলতা, সাবলীলতা, প্রসাদগুণ, কৌতুকরস এবং সহানুভূতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে আপনি সহজেই বলে উঠবেন—একটা জাত-লিখিয়ে লেখকের বই পড়লাম বটে!

বস্তুতপক্ষে, বইটি প্রকাশের কিছুকাল পর থেকেই বহু পাঠক লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত এমনতর বহু সোচ্ছ্বাস মন্তব্য করে এসেছেন। বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহাতপ লিখেছেন "জলধরবাবুর 'পথিক' ও 'হিমালয়' যখন পাঠ করি তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য মনে এমন একটা ব্যাকুলতা জন্মায় তাহা বোঝান সহজ নহে।" আনন্দবাজার পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক প্রফুল্লকুমার সরকার লিখেছেন—আমরা যখন কিশোর-বয়স্ক সেই সময়ে সেকালের প্রসিদ্ধ মাসিকপত্র—"ভারতী" ও "সাহিত্য"এ জলধর সেনের হিমালয়বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইত এবং আমরা অত্যন্ত কৌতূহল ও আগ্রহের সঙ্গে ঐগুলি পড়িতাম ; "ক্রমশ প্রকাশ্য" ডিটেকটিভ উপন্যাসের পরবর্তী অধ্যায়গুলি পড়িবার জন্য লোকের মনে যেরূপ অধীর আগ্রহ জন্মিয়া থাকে, জলধর সেনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রায় সেইরূপ আগ্রহই আমাদের মনে জাগাইয়া তুলিত। জলধর সেনের পূর্বেও বাঙ্গালা ভাষায় ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আরও অনেকে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ভ্রমণ-কাহিনীকে যেরূপে প্রাণময় ও সরস করিয়া তুলিতে হয়, তাহাকে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যে উন্নীত করা যায়, জলধর সেনই বোধহয় প্রথমে সেই দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন।" হেমেন্দ্রকুমার রায় স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন —'তার আগেও বাংলা ভাষায় আরো অনেক ভ্রমণ-কাহিনী বেরিয়েছে, কিন্তু ভ্রমণকাহিনীর ভিতরে যে কতখানি মৌলিকতা, সরল লেখার কায়দা, তাজা আনন্দ ও আন্তরিকতা এবং উপন্যাসের উত্তেজনা থাকতে পারে, জলধরবাবুর রচনাগুলিই বাঙালীকে সর্বপ্রথমে তা দেখিয়ে দিলে। আমার তরুণ মনের ভিতরে তিনি তুষার-শিখরী হিমাচলের যে অভাবিত সৌন্দর্য সৃষ্টি করতেন, আজও তা মলিন হয়নি।' ভাষাপর্ব ও রসিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—"হিমালয়" ও "প্রবাসচিত্র" এই দুইখানি অপূর্ব গ্রন্থ ছেলেবেলায় যখন প্রথম পাঠ করি, তখন একটা অনির্বচনীয় রসানন্দ মনপ্রাণকে ভরিয়া দিয়াছিল, এই দুইখানি বইয়ে এক চির-ইঙ্গিত অজানা জগতের আভাষ যেন আনিয়া দিয়াছিল।' সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রদ্ধার্পনেও সেই একই কথা —'তখন আমরা স্কুলের নীচের দিকেই পড়ি ; মাসিকে জলধরবাবুর "হিমালয়" বার হ'তো, সেই লেখা পড়ার জন্যে সমস্ত মাসটা উৎকণ্ঠায় কাটতো ; কবে কাগজ আসবে, কবে প'ড়তে পাবো! হিমালয় এড়ভেঞ্চারের গল্পের সঙ্গে একটা ঘরছাড়া উদাসীর মনের নিবিড় দরদের গাঢ় সংস্পর্শ যেন থাকতো তার লাইনে লাইনে জড়িয়ে। মনে হয়, সে

www.pathagar.com

লেখার যেন তুলনা হয় না। সুকুমাররঞ্জন দাশের স্মৃতিতে হিমালয়-পাঠ এইভাবে উজ্জ্বল —'ছাত্রাবস্থায় তাঁহার "হিমালয়" গ্রন্থে বর্ণিত "দেব-প্রয়াগ" "লছমনঝোলা" প্রভৃতির বর্ণনা পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইতাম এবং স্থান বিশেষ পাঠ করিতে করিতে মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থানাহারের সময় বিস্মিত হইয়া অভিভাবকদিগের নিকট তিরস্কৃত হইয়াছি, এ কথা এখনও মনে পড়ে।' মীরাটের অবনীনাথ রায় ঠিকই বলেছেন—'যাঁরা কোনদিন সশরীরে বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হ'তে পারবেন না, জলধরবাবুর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প'ড়ে তাঁদের ভ্রমণেচ্ছু আত্মাতৃপ্ত হয়। ঝরঝরে ভাষায় ভ্রমণ-কাহিনী লিখতে পারার ক্ষমতা তাঁর আছে একথা স্বীকার্য।' কথাসাহিত্যিক অনুরূপা দেবীর প্রশংসাপত্রটিও উল্লেখযোগ্য— 'শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের "হিমালয়" যখন প্রথম 'ভারতী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, তখন আমরা প্রায় শিশু, কিন্তু সে বয়সেই এই বইখানির নূতনত্ব আমাদের চমৎকৃত করিয়াছিল। ভূগোল-বর্ণিত চির-রহস্যাবৃত হিমালয়কে তাঁহার "হিমালয়" যেন আমাদের নিকটবর্তী করিয়া দিয়াছিল। বহু বর্ষ পরে পরিণত বয়সে নিজে বদরী-কেদার হইতে ফিরিয়া পুনশ্চ ঐ "হিমালয়"খানি পাঠ করিয়াছি এবং আমার উত্তরাখণ্ডের পত্রাবলীর মধ্যেও উহার উল্লেখ করিয়াছি।'

স্বভাবতই এতসব প্রশংসা ও অনুরাগ ঋদ্ধিযুক্ত লেখকের মধ্যে প্রবল অসূয়া এবং অসহিষ্ণুতার সঞ্চার করে থাকে। আমরা আগেই লক্ষ্য করে এসেছি দীনেন্দ্রকুমার রায় এ গ্রন্থে একটি চমৎকার ভূমিকা রচনা করে দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গাক্রমে বইটির প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকার কথাও তিনি সেখানে উল্লেখ করেছিলেন। এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে জলধর সেনের ডায়েরির খসড়া দীনেন্দ্রকুমার উদ্ধার করে না দিলে বাংলা সাহিত্য এই মূল্যবান সম্পদ থেকে চিরকাল বঞ্চিত হত। দীনেন্দ্রকুমার যখন ভূমিকা লেখেন, তখন তিনি এই 'হিমালয়' যে জলধর সেনেরই লেখা তা স্বীকার করে তার ভূমিকা যে ইতস্তত রং ও রিফু করার তাও উল্লেখ করে যান।

'হিমালয়' প্রকাশের অনেকদিন পর, ততদিনে এর প্রায় ১৫।১৬টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়ে গেছে, দীনেন্দ্রকুমার 'হিমালয়ের' গ্রন্থস্বত্ব স্পষ্টত দাবী না করলেও এই গ্রন্থ প্রধানত তাঁরই রচনা এমনতর দাবী উচ্চারণ করলেন মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত (১৩৩৯-৪৩) আত্মজীবনী সেকালের স্মৃতির ৯, ১০, ১১ সংখ্যক কিস্তিতে। এই সেকালের স্মৃতি অতি সম্প্রতি বর্তমান সম্পাদকের প্রবর্তনায় আনন্দ পাবলিশার্স কর্তৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। কৌতূহলী পাঠক ঐ পুস্তকের ৮৯-১০৮ পৃষ্ঠার বক্তব্যগুলি পড়ে দেখতে পারবেন। আমি যথাসংক্ষেপে দীনেন্দ্রকুমারের বক্তব্য নিয়ে এখানে তুলে ধরছি। প্রথমেই তিনি বলেছেন দীনেন্দ্রকুমারের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন বলেই জলধরের 'জীবনের স্রোত পরিবর্তিত' হয়েছিল। ভারতী পত্রিকার সঙ্গে তিনি আগেই লেখক হিসাবে সংযুক্ত ছিলেন। দীনেন্দ্রকুমার জলধরের হিমালয় ভ্রমণের ডায়েরিতে 'নূতনত্ব থাকায়' খুশি হয়ে জলধরকে তা প্রকাশের জন্য অনুরোধ করেন। জলধর এটি আদৌ প্রকাশযোগ্য করে লেখা নয় বললে দীনেন্দ্রকুমার জেদ করে 'ভারতী'তে প্রকাশের উদ্যোগ নেন এবং 'নলচে ও খোল' বদলে ভারতী সম্পাদিকার কাছে পাঠান—'আমি তাঁহার সেই লতার লিখিত তিন পৃষ্ঠা অবলম্বনে নিজের কল্পনার

www.pathagar.com

রং চড়াইয়া চলতি 'ভাষায়' পাক্কা এক ফর্মার 'আদি ও অকৃত্রিম' সচল ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিয়া ফেলিলাম।' লেখা ভারতী-সম্পাদিকার দারুণ পছন্দ হল। কিন্তু জলধর বললেন—'কি ছেলেখেলা আরম্ভ করিলেন?' কিন্তু ঐ 'ছেলেখেলা' প্রকাশিত হল। ফলে দীনেন্দ্রকুমারের 'ভূতোনন্দী খাটুনী আরম্ভ হ'ল'—হিমালয়ে না গিয়েও তিনি অভূতপূর্ব গ্রন্থ লিখে ফেললেন। ফলে পাঠকসমাজ জলধরকে 'ধন্য ধন্য' করতে লাগলেন। তাই শুনে সুরেশ সমাজপতি মশাই দীনেন্দ্রকুমারের জন্য দুঃখপ্রকাশ করলেন। আর দীনেন্দ্রকুমার বইটির প্রচুর সংস্করণের কারণে জলধরের আয় অনুমান করে ঈর্ষ্যান্বিত হলেন। রমনীমোহন শেষ 'প্রবাস-চিত্রে'-ও দীনেন্দ্রকুমারের হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করলেন। চন্দননগরের হরিহর শেঠও বইয়ের গ্রন্থকার হিসাবে জলধর সেনের নাম দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন। দীনেন্দ্রকুমার একটি কথা যথার্থ বলেছেন—তাঁর অনভিজ্ঞ হস্তক্ষেপের ফলে বইয়ে কিছু অসঙ্গতি থেকে যায়। এই বইয়ের পাঠকও সেই অসঙ্গতি লক্ষ্য করেন। যেমন 'বৈদান্তিক' সঙ্গী জলধরের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেও পরবর্তী অধ্যায়গুলিতেও সঙ্গী হিসাবে তিনি বর্তমান আছেন, অথচ কোথাও তাঁর প্রত্যাবর্তনের কথা উল্লিখিত হয়নি। তাছাড়া পত্রিকায় প্রকাশের সময় ডায়েরি থেকে যে নতুন করে লেখা হয়েছিল, সে প্রসঙ্গও একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। দীনেন্দ্রকুমার স্বীকার করেছেন তিনি 'ভূতের ব্যাগার' খেটেছেন—তা সত্য। আমরাও মনে করি ডাইরি পরিমার্জনার ব্যাপারে দীনেন্দ্রকুমারের অবশ্যই হাত ছিল। কিন্তু পরিমার্জনা এক জিনিস, নকল করা এক জিনিস এবং গ্রন্থস্বত্ব ভিন্ন জিনিস। ভারতীতে হিমালয় প্রকাশের আগেই কিন্তু জলধরের তিনটি রচনা—'টপকেশ্বর ও গুচ্ছপাণি', 'সহস্রধারা', এবং 'হৃষীকেশ' 'ভারতী ও বালকে' পত্রস্থ হয়েছিল। এগুলিও কি দীনেন্দ্রকুমার কোনো অজ্ঞাত ডায়েরি থেকে সংগ্রহ করে জলধর সেনের নামে প্রকাশিত করেছিলেন? হিমালয় প্রকাশের দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছর পরে যে ভাষায় দীনেন্দ্রকুমার বৃদ্ধ জলধরকে নস্যাৎ করার জন্য যুদ্ধংদেহি বলে আহ্বান জানিয়েছিলেন—তা যে নিন্দনীয় তা দীনেন্দ্রকুমারের অতি অনুরাগীও স্বীকার করবেন। এই অবাঞ্ছিত কলহ সম্পর্কে তাই সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন—'সেদিন এই লেখা নিয়ে কাগজে একটা বাদানুবাদ দেখে বড় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল মনটা। জলধরবাবুকে এত বড় গৌরবের সম্পদ থেকে বঞ্চিত ক'রে দিলে ভীষণ নিষ্ঠুরতা হয় না কি তাঁর প্রতি?' আর চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্রূপ করেছিলেন এইভাবে—'রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের লেখার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে যখন তাঁর প্রসিদ্ধ (অধুনা শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের সাধু প্রচেষ্টায় প্রসিদ্ধতর) "প্রবাস চিত্র" প্রকাশিত হয়।...আগে আমি মনে করতাম তিনি বুঝি অজাতশত্রু। কিন্তু শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় আমার সে ভ্রম দূর ক'রে দিয়েছেন।' তাছাড়া স্বয়ং দীনেন্দ্রকুমার সরলা দেবীকে সাক্ষ্য মেনে লিখেছিলেন।—শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর এ সকল কথা এখনও স্মরণ থাকিতে পারে।' হয়ত এত দিন পরে আমার এই কবুল জবাব পাঠ করিয়া তিনিও মনে মনে হাসিবেন।'

প্রকৃতপক্ষে সে সময়ের লেখকগোষ্ঠী এই অবাঞ্ছিত কুরুচিকর বাদানুবাদের উপর একটা যবনিকা টেনে দিতে চেয়েছিলেন। তাই সত্যটুকু জানার জন্য কবি নরেন্দ্র দেব সরলা দেবীকে একটি চিঠি লেখেন। সরলা দেবী তাঁর চিঠির উত্তরে যে চিঠি দেন, সেই

www.pathagar.com

স্বল্পজ্ঞাত চিঠিটি এখনকার পাঠককুলের কাছে সত্য নির্ধারণের জন্য উদ্ধার করে দিই। তা থেকে সহজেই একালের পাঠক একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারবেন।

20, Old Ballyganj
Calcutta
12-11-33

কল্যাণবরেষু,

'বসুমতী'তে দীনেন্দ্র রায় কি লিখিয়াছেন—আমি পড়ি নাই, সৌরীনের কাছে তার মর্ম শুনিয়াছি। আমার এ বিষয়ে যা মনে পড়ে বিবৃত করিতেছি।

মার শরীর খারাপ হওয়ায় দিদির সঙ্গে দার্জিলিং গিয়াছি। মলাটে আমার নাম না থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ভারতীর সম্পাদক আমিই ছিলাম। সেই সময় দীনেন্দ্র রায় তাঁর বন্ধু জলধর সেনের কুমারী (madain) লেখা আমাকে দেন। বলেন, তাঁর বন্ধু অতি লাজুক, তিনি অনেক কষ্টে তাঁর ডায়েরি থেকে এটি উদ্ধার করেছেন। তাঁর বন্ধুর ভরসা নেই যে আমি জিনিসটা পছন্দ করে 'ভারতী'তে স্থান দেব। দীনেন্দ্রকুমার জিজ্ঞাসা করেন।

—আমি কি মনে করি এর ভিতর কিছু পদার্থ আছে?

—পদার্থ? আমি দেখিলাম এটি একটি অনুদ্ধার খনি হইতে লব্ধ একখানি মণি। যে বাঙালী বাঙালার প্রাচীর পার হইয়া পশ্চিমের আকাশতলে বেড়াইবার ছুটি পাইয়াছে তার হাতে ছাড়া এ লেখা ফুটিতে পারে না। সেই মুক্ত ভ্রাম্যমাণ, লোটা কম্বলওয়ালা, শিক্ষিত একেলে বাঙালী যুবকের ভ্রমণবৃত্তান্ত আমার চিত্তকে একেবারে মুগ্ধ করিল। আজও তাঁর দেরাদুন প্রবাসী বাঙালী বন্ধুর গৃহ হইতে নিমন্ত্রণ ও সহস্রধারা, নালাপাণি, কাকঝোরা প্রভৃতি হইতে পদে পদে পদব্রজে বদরিকা পর্যন্ত যাত্রা ও পুনরাগমনের চিত্র আমার স্মৃতিতে গাঁথা রহিয়াছে।—কলম্বস যেমন আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন দীনেন্দ্র রায় তেমনি জলধর সেনকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। একথা সত্য। তার বেশী আর কিছু নয়।

ইতি
সরলা দেবী

দীনেন্দ্রকুমার যাঁকে সাক্ষী মেনেছিলেন, সেই সাক্ষীর সাক্ষ্য আমরা উদ্ধার করলাম অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

অতএব আমরা জলধর সেন রচিত 'হিমালয়' গ্রন্থটি সোৎসাহে একালের পাঠকদের হাতে তুলে দিলাম। প্রিয়ভাজন প্রকাশক 'মিত্র ও ঘোষের' অন্যতম কর্ণধার শ্রীসবিতেন্দ্রনাথ রায়কে বইটি প্রকাশের বিষয়ে যে মুহূর্তে প্রস্তাব দিয়েছি, সেই মুহূর্তে তা শুধু কর্ণে ধারণ না করে, শিরোধার্য করেই দ্রুত পুনঃপ্রকাশে তৎপর হয়েছেন। আমাকে হিমালয়ের "নেপথ্যলোক" উদঘাটনের ভার দিয়েছিলেন। তা যথাযথ পালন করেছি কিনা পাঠককুল বিচার করবেন। হিমালয়ভ্রমণে অভিজ্ঞ, হিমালয় গমনেচ্ছু এবং হিমালয় জিজ্ঞাসু—সকলের কাছেই এই বই এখনও যদি আবেদন সৃষ্টি করতে পারে, তবেই এই উদ্যোগের সার্থকতা।

রোজভিলা, বর্ধমান,
বইমেলা ১৯৯০

বিনয়াবনত
বারিদবরণ ঘোষ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হিমালয়

বিষয় সূচী

পদব্রজে ৩
দেবপ্রয়াগ-পথে ১২
দেবপ্রয়াগ ২১
শ্রীনগর ২৭
রুদ্রপ্রয়াগ ৩৬
কর্ণপ্রয়াগ-পথে ৪৪
কর্ণপ্রয়াগ ৫০
নন্দপ্রয়াগ ৫৬
যোশীমঠের পথে ৬৪
যোশীমঠ (জ্যোতির্মঠ) ৭১
বিষ্ণুপ্রয়াগ ৭৯
পাণ্ডুকেশ্বর ৮৬
বদরিকাশ্রমে ৯৫
বদরিনাথ ১০৪
বদরিকাশ্রমে নারায়ণ দর্শন ১১১
ব্যাসগুহা ১১৭
বিশ্রাম ১২৩
প্রত্যাবর্তন ১২৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পশ্চিম দেশে ভ্রমণ করতে গিয়ে আমি কেমন ধীরে-ধীরে যেন দেরাদুনের অধিবাসী হ'য়ে পড়েছিলুম। দেরাদুনের বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী অধিবাসিগণ তাঁদের স্বভাব-সুলভ স্নেহের বশবর্তী হ'য়ে আমাকে তাঁদের আপনার জন ক'রে নিয়েছিলেন। আমিও যেন কেমন হ'য়ে গিয়েছিলুম। দু-দশদিনের জন্যে যেখানেই ছুটে যাই না কেন, ক্লান্ত হলেই দেরাদুনের বন্ধুগণের স্নেহশীতল আশ্রয়ে এসে হাঁফ ছাড়তুম। এই বিদেশে হিমালয়ের ক্রোড়ের মধ্যেও আমার ঘরবাড়ি হ'য়ে গিয়েছিল। আমি এক সংসারের-পাশ ছিন্ন করবার জন্যে লম্বা এক-দৌড়ে-হিমালয়ের কোলের মধ্যে গিয়েছিলুম ; কিন্তু সংসারের আসক্তি আমার পিছনে পিছনে ছুটে এসে এই পাহাড়ের নিভৃত নেপথ্যদেশেও আমাকে গ্রেপ্তার ক'রেছিল। এই সব কারণে মধ্যে মধ্যে ভারি একটা দুর্দমনীয় বাসনা হ'ত যে, একেবারে পাহাড়ের মধ্যে ডুবে যাই—খুব একটা লম্বা পথে যাত্রা করি—নিতান্ত পথের সন্ধান না হয়, একেবারে নিরুদ্দেশ-যাত্রাই করা যাক! তাতে কার কি ক্ষতি?

দেশে থাকবার সময় সাধু-সন্ন্যাসীর মুখে কেদারনাথ বদরিনাথের কথা অনেক শুনা গিয়েছিল। কিন্তু কোন দিন স্বপ্নেও সে-সব দেশে যাব, এ কথা মনে উঠে নাই। এখন আমার মধ্যে মধ্যে—সেই সব দেশে যাবার ইচ্ছা হ'ত ; কিন্তু আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে সে কাজটা যে হ'য়ে উঠবে, সে বিষয়ে খুব সন্দেহ ছিল। কেদারনাথ বদরিনাথে যাত্রী অতি কম যায়, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর সংখ্যা ত আরো অল্প, প্রতি বৎসর পাঁচ সাত জনের বেশী হবে না।

আমার বদরিকাশ্রমে যাবার জন্যে অত্যন্ত আগ্রহ হ'তে লাগলো ; কিন্তু কোন সুবিধা ক'রে উঠতে পাল্লুম না। তার তিন চার বৎসর আগে থেকে গবর্ণমেণ্ট যাত্রীদের বদরিকাশ্রম যাওয়া বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। কয় বৎসর গাড়োয়াল রাজ্যে এমন ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হ'য়েছিল যে যাত্রীদের পথ ছেড়ে দিলে তারা হয়ত অনাহারে মারা পড়তো ; আমি কিন্তু সেই থেকেই বরাবর চেষ্টায় আছি, সুযোগ ক'রে উঠতে পারলেই একবার যাবো।

তারপর এক বছর হরিদ্বারের মহাকুম্ভ মেলায় গিয়ে আমার একজন পূর্বপরিচিত শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হ'লো। ইনি বাঙ্গালী ; বাল্যকাল হতেই ইনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন : এখন ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। বলা বাহুল্য, পথেঘাটে যে রকম সন্ন্যাসী দেখা যায়, ইনি সে প্রকৃতির নন ; ইনি প্রকৃতই একজন সাধু ব্যক্তি; আধুনিকভাবে শিক্ষিত এবং সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞ। আমি নানা প্রকার অনুরোধ ক'রে তাঁকে হরিদ্বার হ'তে দেরাদুন নিয়ে এলুম। কিন্তু তিনি লোকালয়ে আসতে স্বীকার পেলেন না। কাজেই তাঁকে টপকেশ্বরের এক পর্বতগুহায় রেখে বাসায় এলুম। অবকাশমত তাঁর নিকট যাতায়াত করতে লাগলুম ; দুই একদিন সেই নির্জন পর্বতগহ্বরে বাসও করা গেল ; এবং এই রকম ক'রে আমরা দুজন—একজন সন্ন্যাসী ও একজন গৃহবাসী—পরস্পরের নিকট অধিকতর পরিচিত হ'তে লাগলুম। অবশেষে তাঁর সঙ্গে আমার বদরিকাশ্রমে যাওয়া স্থির হ'য়ে গেলো। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেরাদুনস্থ বন্ধুবান্ধবমণ্ডলীর মধ্যে এ সংবাদ রাষ্ট্র হ'লো। আমার সকল হিন্দুস্থানী বন্ধুর ত চক্ষুস্থির!

www.pathagar.com

তাঁরা ভাবলেন, তাঁদের ভবিষ্যৎবাণী বুঝি বা সফল হয়।

সন্ন্যাসী মহাশয়কে আমি 'স্বামীজি' বোলে ডাকতুম। তাঁর সঙ্গে আমার যাত্রা করার পরামর্শ স্থির হ'য়ে গেল, আমি যে সত্যই এমন একটা বড় রকম ব্যাপারে প্রবৃত্ত হচ্ছি, আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তা কেউ বিশ্বাস করতে রাজী হ'লেন না। যদি আমি কথঞ্চিৎ করুণা উদ্রেক করিবার অভিপ্রায়ে কোন বন্ধুর কাছে মুখ ভার ক'রে বলি, "ভায়া হে, ছেড়ে ত চল্লুম, একেবারে ভুলো না।" অমনি দুই বিন্দু অশ্রু এবং একটি দীর্ঘশ্বাসের পরিবর্তে এক মুখ হাসি আমাকে বিব্রত ও অপ্রস্তুত ক'রে ফেলতো ; বিদ্রুপের স্বরে তাঁরা বোলতেন, "তুমি যাবে?—তীর্থভ্রমণে? দেখলেও ত বিশ্বাস হয় না।" বাস্তবিক আমার মত শ্রমকাতর মনুষ্য যে বহুকষ্ট স্বীকার ক'রে পদব্রজে পর্বতে পর্বতে ঘুরে বেড়াবে, এ কথা তাঁরা কি ক'রে সহজে বিশ্বাস করেন? আমারই এক এক সময়ে মনে হ'তে লাগলো, এই সমস্ত পাহাড়-পর্বতের মধ্যে এত দীর্ঘ পথ হাঁটা কি আমার পক্ষে সম্ভব হবে? সামান্য দূরে ক্ষুদ্র এক চড়াইয়ে উঠতে হ'লেই আমার ডাণ্ডীর দরকার হয়—আর আমি কি ক'রে এত পথ অতিক্রম ক'রবো? আর পথে বিপদের সম্ভাবনাও ত কম নয়।

কিন্তু নানা জনের নানা কথার মধ্যে প'ড়ে আমার ভ্রমণেচ্ছা ক্রমেই দৃঢ় হ'তে লাগলো ;—যতই চারিদিক থেকে পথের ভীষণতা সম্বন্ধে কথা শুনতে লাগলুম, ততই আমার যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হ'তে লাগলো,—শেষে যাত্রা করবার দিন পর্যন্ত স্থির হ'য়ে গেলো। তখন আমার বন্ধুদের পরিহাস আর বিদ্রুপ কোথায়?—বিদায়ের অশ্রুতে সব ভেসে গেল। সকলেরই মনে হ'ল, এই হয় ত শেষ দেখা। আর কি ফিরে আসতে পারবো? এখন থেকে আমার দৈনিকলিপি উদ্ধৃত করি।

৫ই মে, ১৮৯০ ; মঙ্গলবার।—আগামী কাল অতি প্রত্যূষে আমার যাত্রা করবার দিন। বন্ধুবান্ধব সকলেই খুব বিষণ্ণ, যেন আমি চিরদিনের জন্যে সকলের স্নেহবন্ধন ছিঁড়ে চ'লে যাচ্ছি। পাড়ার বাঙ্গালী স্ত্রীপুরুষ সকলেই কাতরতা প্রকাশ করতে লাগলেন, বন্ধুবান্ধবেরা আপনার আপনার নামলেখা পোষ্টকার্ড আমার গানের বইয়ের ভিতর রেখে দিলেন। সমস্ত দিন এই ভাবে কেটে গেল। দেরাদুনে এমনও দুই একজন লোক ছিলেন, যাঁরা আমার উপর অনেক বিষয়ে খুব বেশী নির্ভর করেন ; মনে মনে অখিল-নির্ভরের উপর তাঁদের ভার সমর্পণ কল্লুম। রাত্রিতে আমার নিদ্রা হ'ল না। সামান্য কোথাও যেতে হ'লেই নানা উৎকণ্ঠায় রাত্রে নিদ্রা হয় না, আর এ ত আমার সুদীর্ঘকালের জন্য যাত্রা। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথাবার্তায় ও নানা কাজে সমস্ত রাত্রি কেটে গেল। আয়োজনের জন্যে কিছু ব্যস্ত হ'তে হ'লো না : দীনের বেশে বের হব, তার আর আয়োজন কি করবো?

৬ই মে, বুধবার।—আজ রাত্রি সাড়ে-চারটার সময় দেশত্যাগের বন্দোবস্ত ; তৎপূর্বেই বন্ধুবর্গ বিদায়ের জন্যে সমবেত হ'লেন। জ্যোৎস্নারাত্রি, সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, সুষুপ্ত। আমাদের জীবনের ক্ষুদ্র পরিবর্তনে পৃথিবীর ধারা কি পরিবর্তিত হয়? সকলকে ছেড়ে চল্লুম, আত্মীয় বন্ধুবর্গ অনেক দূর পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এলেন। তাঁদের এই দীর্ঘকালের স্নেহবন্ধন ছিন্ন করা সবিশেষ কষ্টকর ব'লে মনে হ'তে লাগলো। তাঁদের আর বেশী দূর অগ্রসর না হ'তে অনুরোধ কল্লুম ; শেষে তাঁরা অনিচ্ছাসত্ত্বেই ফিরলেন। আমিও ফিরে ফিরে অনেকক্ষণ ধ'রে তাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম। আমার মনে হ'ল, এতেই এত কষ্ট, আর নিতান্ত আপনার লোকের কাছ থেকে এ রকম বিদায় নেওয়া

www.pathagar.com

না জানি আরো কত কষ্টকর! দিন-কতক আগে 'Pilgrim's Progress' পড়েছিলুম ; তারই একটা ছবির কথা আমার বার বার মনে আসতে লাগল। নানা চিন্তার মধ্যে অগ্রসর হ'তে লাগলুম।

সূর্যোদয় হ'ল। আমরা হৃষীকেশের পথে আসতে লাগলুম,—এ আর একটা পথ। এ পথেও লোকজনের সংখ্যা বড় অল্প। পাহাড় ও জঙ্গল অতিক্রম ক'রে বেলা ১১টার সময় 'খানু' নামে একটা ছোট গ্রামে উপস্থিত হ'লুম। গাছ পাতায় ঢাকা পাঁচসাত ঘর গৃহস্থের বাড়ি নিয়ে এই গ্রামখানি শাখাপত্রসমাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র বিহঙ্গ-নীড়ের ন্যায় স্নিগ্ধ ও শান্তিপূর্ণ। এই গ্রামের পাশ দিয়ে একটা ছোট ঝরণা চ'লে যাচ্ছে। আমরা সেই ঝরণার ধারে একটা গাছের তলায় আশ্রয় নিলুম ; ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অধীর হ'য়েছিলুম, প্রাণ ভ'রে ঝরণার জল পান করা গেল। তারপর সেই বৃক্ষতলেই আহারাদি শেষ ক'রে অপরাহ্ণ ৫টার সময় আবার যাত্রা আরম্ভ কল্লুম।

গ্রাম যখন ছাড়িয়ে গেছি—তখন দেখলুম দুজন সন্ন্যাসী আমাদের আগে আগে যাচ্ছে। ভাবলুম, আমরাও দুজন আছি, এ দুজন সাধু ব্যক্তির সঙ্গ লওয়া যাক না ; কিছুদূর একসঙ্গেই চার জনে যাওয়া যাবে। সেই দুজন সাধুকে ধরবার জন্যে আমরা একটু তাড়াতাড়ি চলতে লাগলুম ; কিন্তু সন্ন্যাসিদ্বয়ের কাছে গিয়ে আমার হাসিও এলো, রাগও হ'ল। দেখি একজন আমারই বাসার চাকর ; চুরি অপরাধে আজ কুড়ি পঁচিশ দিন পূর্বে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। আজ তাকে যে রকম জাঁকাল সন্ন্যাসীর বেশে দেখলুম, এবং যে রকম উৎসাহের সঙ্গে সে ঘন ঘন "হর হর বম্ বম্" করছে, তাতে কার সাধ্য তাকে চোর বলে। তবে তার নিতান্তই গ্রহ-বৈগুণ্য যে, আজ আমার সম্মুখে পড়ে গেছে। আমি স্বামীজি'কে সমস্ত কথা খুলে বল্লুম। তিনি বল্লেন, "হয়ত ওর সঙ্গীর ঝুলিতে কিছু অর্থ আছে, তাই আত্মসাৎ করবার জন্যে বেটা এ-রকম ভেক ধরেছে।" গৈরিক বসন ও জটা কমণ্ডলুর মধ্যে এই রকম কত চুরি ডাকাতি ও নরহত্যা ছদ্মবেশে দ্বিতীয় সুযোগের প্রতীক্ষা করছে, তার আর সংখ্যা নেই। আমার এই ভ্রমণ-বিবরণে পাঠকের ও-রকম অনেক সাধুদর্শন ঘটবে।

আমার চাকর বাবাজি হয় ত প্রথমে মনে ক'রেছিল, আমি তার এই পরিবর্তন দেখে তাকে চিনতে পারবো না ; তাই তার পশ্চিমে বুদ্ধির দ্বারা আমার বাঙ্গালী বুদ্ধির পরিমাণ স্থির ক'রে নিশ্চিন্ত ছিল। সে আমাদের দেখে আরো জোরে জোরে 'বম্‌বম্' ক'রতে লাগলো। এ ভণ্ডামী আমার নিতান্তই অসহ্য হ'য়ে উঠলো, আমি একটু হেসে বল্লুম, "আরে লৌণ্ডে, কবসে চোরী ছোড়্‌কে সাধু বন্ গিয়া?"—আমার কথা শুনে বাবাজির মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল। সে একটা কথাও বলতে পারলে না। তখন তার সেই বিশ্বস্তচিত্ত সঙ্গী সাধুটিকে সমস্ত বল্লুম। সে বেচারী নিতান্ত ভাল-মানুষ। এই অল্পবয়সী, জোয়ান ছোক্‌রা তার চেলা হ'তে স্বীকার করায় সে তাকে সঙ্গী করেছে ; একটু আধটু ধর্মোপদেশ দেয়, আর বেশ ভাল ক'রে খাওয়ায়-দাওয়ায়। আমি বল্লুম, "সাধু তুমি ওকে রাখ, খেতে দেও, তাতে আমার আপত্তি নেই ; কিন্তু যদি তোমার ঝুলিতে কিছু টাকাকড়ি থাকে ত তা সাবধান ক'রে রেখো। দশ বারো দিনে যে এমন সাধু হ'তে পারে দু পাঁচ ঘন্টার মধ্যে আবার তার নরঘাতক দস্যু হওয়ারও আটক নেই।"—পরে জেনেছিলুম, সাধু আমার এই অযাচিত উপদেশ গ্রহণ ক'রেছিল।

www.pathagar.com

সন্ধ্যার সময় আমরা 'ভোগপুরে' উপস্থিত হলুম। এ-গ্রামে অনেকগুলি লোকের বাস। দু-চারটে ছোট কোঠাঘর দেখে বুঝলুম, এখানে ধনীও দু-পাঁচ ঘর আছে ; অবিলম্বে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। এ-অঞ্চলে যে গ্রামে দু পাঁচঘর বর্ধিষ্ণু লোকের বাস, সেইখানেই গ্রামের লোকের ব্যয়ে ও যত্নে এক-একটা ধর্মশালা থাকে ; বিদেশী সাধু অতিথি সেখানে আশ্রয় পায় ; গ্রামের লোকে যথাসাধ্য আহার-সামগ্রী দিয়ে যায়। তবে গ্রামে দোকান থাকলে, কি পথিকের হাতে পয়সা থাকলে তাদের ধর্মশালার সাহায্য নেবার বড় দরকার হয় না। বাঙ্গালাদেশে ধর্মশালার মত জিনিসের অভাব বড় বেশী। নানা বিষয়ে আমরা ভারতের অন্যান্য দেশের লোক অপেক্ষা উন্নত ও সভ্য ; কিন্তু পথিক বা রোগগ্রস্ত ব্যক্তি পথিপ্রান্তে প্রাণত্যাগ কল্লেও তাদের দিকে ফিরে তাকাবার আমাদের অবসর নেই ; এতই আমরা কাজে ব্যস্ত। তবে আমাদের মধ্যেও যে দু-পাঁচজন এ-দলের বাইরে আছেন, এ-কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে। কিন্তু আমার যেন মনে হয়, পরোপকার, কি বিপন্নকে আশ্রয় দান এবং অতিথি-সৎকার প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোক অপেক্ষা অশিক্ষিত গাড়োয়ালী কৃষকের হৃদয়ের উচ্চতা অনেক বেশী।

ভোগপুরের ধর্মশালায় রাত্রিবাস করা গেল, আহারাদির কোন দরকার হ'লো না ; পথশ্রমে বড় ক্লান্ত হয়েছিলুম, শয়নমাত্রেই নিদ্রা।

৭ই মে, বৃহস্পতিবার।—প্রত্যূষে উঠে আবার যাত্রা। এবার সেই পূর্ব পরিচিত হৃষীকেশের জঙ্গলে প্রবেশ করা গেল। জঙ্গল পরিচিত হ'তে পারে, কিন্তু রাস্তা সম্পূর্ণ অপরিচিতি ; পূর্বে যে রাস্তায় এসেছিলুম, এবারও সেই রাস্তায় যাচ্ছি কি না বুঝতে পাল্লুম না। বেলা একটার সময় হৃষীকেশে পৌঁছলুম। বৃক্ষতলে বিশ্রাম করা গেল, আহারাদি কিছুই হ'লো না। অপরাহ্ণে রৌদ্রের তেজ কমতে যাত্রা ক'রে লছমন-ঝোলায় উপস্থিত হ'তে সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। লছমন-ঝোলায় গঙ্গার উপর যে ক'খানা দোকান-ঘর ছিল, দেখলুম তা যাত্রীর দলে পূর্ণ। সেইদিন এখানে একদল উদাসী সন্ন্যাসী এসেছে। এরা শিখ। গুরু নানক একেশ্বরবাদ প্রচার করেছিলেন ; কিন্তু এরা এখন পৌত্তলিক। ইহারা হিন্দুর সমস্ত তীর্থই পর্যটন ক'রে থাকে এবং নানকের লিখিত ধর্মগ্রন্থ পূজা করে। এরা সেই পুস্তককে 'গ্রন্থসাহেব' বলে। এই দলে প্রায় ২০০ লোক। এদের কথা পরে ব'লব।

পশ্চিম দেশে যাওয়ার আগে আমি প্রায়ই পদ্মানদীর ও-পারে আমার কোন বন্ধুর বাড়ি সর্বদা যাতায়াত করতুম। সেখানকার এক ব্রাহ্মণ ঠাকুর একবার বদরিকাশ্রমে গিয়েছিলেন ; কিন্তু আমাদের মত ইংরেজী-পড়া কতকগুলি ছেলের বিশ্বাস ছিল ঠাকুর হরিদ্বার পর্যন্তও যাননি। যা হ'ক, দেশের লোকে গয়া, কাশী, বৃন্দাবন যায় ; সুতরাং সে সব জায়গার গল্প আমরা সর্বদা শুনতে পেতুম ; কিন্তু বদরিকাশ্রমে দেশের লোক বড়-একটা যায় না ; কাজেই সেখানকার কাহিনী সম্বন্ধে বামুন-ঠাকুরই প্রধান 'অথরিটী' ছিলেন। তিনি অনেকগুলি আজগুবী গল্প করেছিলেন ; তার মধ্যে তাঁর লছমন-ঝোলার গল্প আমার বেশী মনে ছিল এবং তৎসম্বন্ধীয় একটা ভয়াবহ ভাব ছেলেবেলা থেকে একেবারে রক্তের সঙ্গে মিশে ছিল। আমি যে গ্রামের কথা বলছি, সেখানে একটা জায়গায় প্রতি বৎসর বর্ষার সময় কাদায় জলে মিশে একটা নরককুণ্ড হ'য়ে থাকত, এবং সেখান থেকে উদ্ধার লাভের জন্যে গ্রামের লোক একটা বাঁশের সাঁকো প্রস্তুত ক'রে রাখত। সে সাঁকোর 'আইডিয়া' সহরের লোককে দেওয়া শক্ত। কাদার মধ্যে দু'খানা বাঁশ পুঁতে

www.pathagar.com

তার উপর একটা বাঁশ ফেলে খানিক উপরে আর একটা বাঁশ বেঁধে দেওয়া হ'তো; সকলকে সেই নীচের বাঁশে পা দিয়ে উপরের বাঁশ ধ'রে ধীরে ধীরে সেই কর্দমাক্ত স্থান পার হ'তে হ'ত। হঠাৎ হাত কি পা ফস্‌কে গেলে সেই মহাপঙ্কে একেবারে নিমজ্জন ছাড়া অন্য গতি ছিল না। লছমন-ঝেলার গল্প শুনে অবধি, আমার এই অপরূপ সাঁকোর নাম রেখেছিলুম লছমন-ঝোলা। তখন কি একবার স্বপ্নেও ভেবেছিলুম আসল 'লছমন-ঝোলা'ও আমাকে পার' হ'তে হবে?

কিন্তু এখন যাঁরা লছমন-ঝোলা দেখবেন, তাঁরা পূর্বের লছমন-ঝোলা কি রকম ছিল, তা বুঝতে পারবেন না। অতএব সেকালের ঝোলার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি।

প্রথমে একটা দড়ির সিঁড়ি প্রস্তুত ক'রতে হয়; খুব মোটা দু' গাছা দড়ি সমান্তরালভাবে বসিয়ে তার মাঝে মাঝে সিঁড়িতে যেমন পা দেওয়ার জন্যে কাঠ থাকে, তেমনি ছোট ছোট শক্ত কাঠ বেশ ভাল ক'রে বেঁধে সেই দড়ির সিঁড়িগাছটা নদীর দুই পারে বেশ কোরে আটকিয়ে দেয়। তার উপরে পা দিয়ে পার হ'তে হয় এবং হাতে ধরবার জন্য নীচে যেমন উপরেও সেই রকম শক্ত রশি এপার ওপার বেঁধে দেয়। সেই রশি-দুটো দুই কুক্ষির মধ্যে দিয়ে দু'হাতে ধ'রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে হয়। একবার মনে করুন, ব্যাপারটা কি ভয়ানক। দুই কুক্ষির মধ্যে দুই রশি, আর পা সেই রসি-নির্মিত সিঁড়ির উপর। পায়ের তলায় চার পাঁচশো হাত নীচে ভয়ানক বেগবতী গঙ্গা। একবার কোন রকমে পিছলে গেলে আর রক্ষা নেই। প্রথমে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ বেশ ঝুলতে পারা যায় বটে; কিন্তু পা আবার যথাস্থানে স্থাপন করা অতি কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে। আরো এক ভয়ানক কথা এই যে, এই রকম ঝোলার উপর দিয়ে একটু গেলেই পা এমন ভয়ানক দোলে যে, হাত পা ঠিক রাখা দুরূহ হ'য়ে পড়ে। প্রতিক্ষণেই মনে হয়, এইবারই হয়ত প'ড়ে যাবো। লছমন-ঝোলা পার হওয়া এই জন্যই এত ভয়ের কারণ ছিল। এই ঝোলা পার হ'তে গিয়ে কত যাত্রী যে মারা গেছে তার সংখ্যা নেই। সেই জন্যেই সে-কালের লোক লছমন-ঝোলা পার হ'লেই নারায়ণ-দর্শনের আশা করতো। সে-কালে বদরিনারায়ণের পথে আরো চার পাঁচটা ঝোলা ছিল বটে; কিন্তু সেগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট, এই এক লছমন-ঝোলার ভয়েই অনেক লোক সে-পথে যেতে পারতো না। এখন চেতলার পুলের মত সর্বত্র টানা পুল হয়েছে। লছমন-ঝোলার বর্তমান পুলটি কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী রায় সূরজমল ঝুনঝুনিওয়ালা বাহাদুর বহু অর্থব্যয়ে প্রস্তুত করেছেন। এ পুল পার হ'তে পয়সা দিতে হয় না। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এই পুল প্রথম খোলা হয়; তার পর হ'তেই বদরিনারায়ণের (বদরিকাশ্রমের) যাত্রীর সংখ্যা অনেক বেশী হয়েছে।

সত্য কথা বলতে কি, 'লছমন-ঝোলা' সম্বন্ধে ছেলে-বেলা থেকে মনে মনে যে ভয়াবহ-ভাব পোষণ ক'রে রেখেছিলুম, লছমন-ঝোলায় উপস্থিত হ'য়ে তার কিছুই না দেখে খানিকটা নিরাশ হ'য়ে পড়লুম; এখন দু'বছরের ছেলেরা পর্যন্ত মনের আনন্দে খেলা করতে করতে ঝোলা পার হ'তে পারে। পূর্ব বিভীষিকা মনে করিয়ে দেবারও কিছু দেখা গেল না। কেবল দেখলাম এ-পারে দু'খানি ও-পারে দু'খানি জীর্ণ কাষ্ঠ-খণ্ড দাঁড়িয়ে তাদের অতীত গৌরবের সাক্ষী দিচ্ছে।

দোকানগুলি সব দখল হ'য়ে গেছে দেখে আমরা লছমন-ঝোলা পার হ'য়ে অপর

www.pathagar.com

পারে বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ কল্লুম। পূর্বকথিত দোকানঘরগুলিতে সাধুর দলের সকলের স্থান সংকুলান না হওয়ায় তাঁহাদেরও অনেকে এই সমস্ত বৃক্ষতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি—প্রথম কয়েকঘণ্টা অন্ধকার ; ধুনীর আলোকে অন্ধকার গভীর হ'তে লাগলো। আমরা অন্ধকারের মধ্যেই বালির উপর কম্বল বিছিয়ে বসলুম এবং অন্ধকারেই দু'চারখানা রুটী তৈয়ারী ক'রে ধুনীর আগুনে সেকে একটু গুড় দিয়ে আহার কল্লুম। সমস্ত দিন অনাহার ও পথশ্রমের পর এই আহার এবং অন্ধকার নদী-সৈকতে বালুকার উপর এই কম্বলশয্যা খুব শান্তিদায়ক হ'লো। আমার বোধ হ'ল, আমরা সংসারে নানা রকম বিলাসিতার মধ্যে জোর ক'রে নতুন নতুন অভাবের সৃষ্টি ক'রে নিই ; তাই সংসারে আমাদের এত দুঃখ, কষ্ট, পদে পদে ভগ্ন মনোরথের ক্লেশ ও নৈরাশ্যের যন্ত্রণা।

যা হোক, সে রাত্রে যে রকম শান্তি উপভোগ করতে পারব ঠিক করেছিলুম, আমার অদৃষ্টে তা ঘটে নি। শয়নের প্রায় অর্ধঘণ্টা পরে আমি আমার ডান হাতের আঙ্গুলে এক ভয়ানক দংশন-যাতনা অনুভব কল্লুম। সর্পাঘাত কি রকম জানিনে, কিন্তু আমাকে যে জীবে কামড়েছিল, তার যন্ত্রণা কখনো ভুলব না! অনেকে কথায় কথায় সহস্র বৃশ্চিক-দংশনের কথা পেড়ে থাকেন, আমার আজিকার 'এ'দংশন যদি বৃশ্চিক-দংশন হয়, তবে আমি নিঃসন্দেহে ব'লতে পারি, এই একটিই যথেষ্ট, 'সহস্র' দূরে থাক, দুইটিরও দরকার হয় না। বেদনার জ্বালায় আমি চীৎকার ক'রে উঠলুম ; সঙ্গী 'স্বামীজি' হাতের উপর দু-তিন জায়গায় দৃঢ় ক'রে বাঁধন দিলেন ; কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তীব্র বিষ সর্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত ক'রে ফেলল, আমার সর্বশরীর অবশ হ'য়ে গেল, নড়বার পর্যন্ত শক্তি রইল না, আমি যাতনায় গভীর আর্তনাদ করতে লাগলুম। দুই চারজন নিকটস্থ সন্ন্যাসী এসে অনেক ঝাড়তে লাগলেন, কিন্তু কিছুমাত্র ফল হ'লো না। আমার সঙ্গী স্বামীজি বড়ই কাতর হ'য়ে পড়লেন ; তিনি আমাকে মার মত কোলে ক'রে বসলেন, কিন্তু কি ক'রবেন কিছুই স্থির করতে পাল্লেন না।

এই রকমে প্রায় একঘণ্টা কেটে গেল ; যাতনা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এমন সময় বুঝি আমাকে রক্ষা করবার জন্যেই ভগবান একজন সন্ন্যাসীকে লছমন-ঝোলা পার ক'রে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি একটু আগে লছমন-ঝোলায় পৌঁছেছিলেন। দু-একজন সাধুর মুখে আমার এই রকম ভয়ানক দংশন-যাতনার কথা শুনে তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে উপস্থিত হ'লেন। তিনি আমাকে যে উপায়ে আরোগ্য কল্লেন, তা অতি আশ্চর্য। আমার যে অঙ্গুলি দষ্ট হ'য়েছিল, সন্ন্যাসী সেই অঙ্গুলি মুখের মধ্যে দিয়ে দষ্টস্থান একটু কামড়িয়ে ধরলেন, বোধ হ'লো আমার শরীরের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটছে। শরীরে যন্ত্রণা আছে তা বুঝেছি, কিন্তু তার যন্ত্রণা অনুভব করতে পাল্লুম না। সন্ন্যাসী অল্প একটু কামড়িয়ে আঙ্গুল ছেড়ে দিলেন। ক্লোরফর্ম করলে শরীর যেমন ধীরে ধীরে অবসন্ন হ'য়ে পড়ে, আমিও পাঁচসাত মিনিটের মধ্যে সেই রকম অচেতন হ'য়ে পড়লুম।

প্রাতঃকালে সাধুর দলের যাত্রার আয়োজনের গোলমালে নিদ্রাভঙ্গ হ'লো। দেখলুম, আমি স্বামীজির কোলের মধ্যেই রয়েছি ; তিনি আমাকে কোলে নিয়ে সমস্ত রাত্রি কাটিয়েছেন। বিদেশে পথিপ্রান্তে এই রকম বিপন্ন অবস্থাতে একজন সন্ন্যাসীর নিকট যে মাতার স্নেহ ও প্রিয়তমার যত্ন পাওয়া যেতে পারে, এ-কথা আমার নিতান্ত অসম্ভব ব'লে মনে হ'ত ; কিন্তু এ সংসারে, গৃহহীন পথিকের জন্যেও ভগবানের প্রেম স্বর্গ হ'তে

www.pathagar.com

মানবহৃদয়ে নেমে আসে। কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হ'লো।

৮ই মে, শুক্রবার—শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত, তবু সকালে উঠে রওনা হওয়া গেল। বারো মাইল গিয়ে আর চলবার ক্ষমতা রইল না, তাই 'ফুলবাড়ি' চটিতে সমস্ত দিন কাটানো গেল। সন্ধ্যার পূর্বে রওনা হ'য়ে ছয় মাইল রাস্তা চ'লে সন্ধ্যার সময় 'বাগড়ী' চটিতে পৌঁছলুম। উলুবেড়ে থেকে উড়িষ্যার পথের ধারে যেমন সুন্দর সুন্দর চটি ছিল, তাদের সঙ্গে তুলনায় এ সমস্ত চটি কিছুই নয়; বিশেষতঃ গত তিন চার বৎসর গবর্ণমেণ্টের আদেশে বদরিকাশ্রমে যাত্রী যাওয়া বন্ধ থাকায় সেই সমস্ত পাতার কুটীর একেবারে ভেঙে গেছে। এ বৎসরও যাত্রী যাওয়া বন্ধ থাকবার কথা ছিল; কিন্তু কুম্ভমেলা উপলক্ষে হরিদ্বারে বহু যাত্রীর সমাগম হওয়ায় অল্প কয়েক দিন হ'লো যাত্রী যাওয়ার হুকুম হ'য়েছে; কিন্তু ভগ্ন চটিগুলি মেরামত হ'য়ে ওঠেনি এবং সেগুলোতে আজও দোকান বসে নি। আমরা দ্বিতীয় যাত্রী দল, আমাদের পূর্বে একদল মাত্র যাত্রী গিয়েছে। 'বাগড়ী' চটিতে পৌঁছে দেখি সেই পূর্বদিনের উদাসী সাধুর দল সেখানে সেদিনের জন্যে আড্ডা গেড়েছেন। একখানি মাত্র পাতার ঘর প্রস্তুত হ'য়েছে, আর তাতেই সামান্য জিনিসপত্রের দোকান ব'সেছে। বলা বাহুল্য, সে দোকানে যা কিছু জিনিস ছিল, তা সেই দুইশত সাধুর পক্ষেই নিতান্ত অল্প; আমরা দেখলুম দোকানদারের কাছে আর ক্রয়োপযোগী কোন জিনিসই নেই।

এখানে এই সাধুদের একটু পরিচয় দিই। এদের বড় বড় দল আছে এবং একজন দলপতি আছেন। তাঁর আদেশানুসারে দলস্থ লোক ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হ'য়ে নানা তীর্থপর্যটনে বাহির হয়; কাশীতে, নর্মদাতীরে এবং অমৃতসহরে ও আরো অনেক স্থানে এই সাধুদের অনেক বড় বড় মঠ আছে। মঠের অগাধ সম্পত্তি; হাতী ঘোড়া প্রভৃতিও অনেক। যে দলের সঙ্গে আজ আমাদের দেখা হ'লো, তাদের মধ্যে একজনকে প্রধান কোরে এরা ভ্রমণে বাহির হয়েছে। এদের সঙ্গে অনেক লোকজন আছে, বড় বড় পিতলের হাঁড়ী প্রভৃতিও সঙ্গে দেখলুম। এরা যেখানে উপস্থিত হয়, সে সময় সেখানে অন্যান্য যে সমস্ত লোক থাকে, তাদের সকলকেই সযত্নে আহার করায়, এমন কি বাইরের লোকের খাওয়া না হলে এরা জলস্পর্শও করে না। এদের কোন রকম বদখেয়াল দেখলুম না; সকলেই সন্ন্যাসী এবং সকলেরই মাথায় বেণীভাঙান চুল। এরা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু; সঙ্গে 'গ্রন্থসাহেব' আছেন; তাঁর রীতিমত পূজা আরতি ও স্তব পাঠ হয়; তা ছাড়া এরা বিশেষ কোন ধর্মালোচনায় যে সময়ক্ষেপ করে তা নয়; দু একজন ধর্মপিপাসু সাধু ব্যক্তি আছেন; কিন্তু এদের অধিকাংশ লোকই খুব আমোদপ্রিয়; এমন কি দেখলুম, দুই তিন দল তাস ও দাবা খেলা আরম্ভ ক'রে দিয়েছে।

আমরা এদের কাছে আসবামাত্র এরা খুব যত্নের সহিত আমাদের অভ্যর্থনা করলে; কোন রকমে আতিথ্য-সৎকারও সম্পন্ন হ'লো। তার পর সেই অনাবৃত আকাশতলে—প্রকৃতির রত্নখচিত নীল চন্দ্রাতপের নীচে শয়ন করা গেল। এদের একজন আমাকে বাঙ্গালী দেখে বাঙ্গালা ভাষায় আমার সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। তাঁর বয়স এখনও ত্রিশ হয় নি। অতি বিনয়ী; শাস্ত্রজ্ঞানও বেশ আছে বলে বোধ হ'লো। ইনি বাঙ্গালী, কিন্তু বাড়ি কোথায় তা প্রকাশ কোল্লেন না; তবে জানতে পাল্লুম, এগার বৎসর বয়সের সময় মাত্র ইনি এই সাধুর দলে প্রবেশ করেছেন; এবং এই দলের মধ্যে থেকেই শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন

www.pathagar.com

করেছেন। অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে খানিক বাঙ্গালা ভাষায় খানিক হিন্দীতে কথাবার্তা হ'লো। শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক তর্কবিতর্ক হ'লো ; কিন্তু শেষে তর্কের যে রকম মীমাংসা চিরকাল হ'য়ে থাকে তাই হ'লো অর্থাৎ কোন মীমাংসাই হ'লো না। তবে বুঝলুম লোকটি প্রকৃতই ধর্মপিপাসু। বেশ আনন্দে রাত্রি কেটে গেল। শেষরাত্রিতে জেগে দেখি, গায়ের উপর ঝুপঝাপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে, আর খোলা মাঠে শোঁ শোঁ ক'রে বাতাসের শব্দ হচ্চে ; কিন্তু তখন আর কি উপায় করা যাবে ; কম্বল মুড়ি দেওয়া গেল। এই সমস্ত কষ্ট ও অসুবিধা স্বীকারে প্রস্তুত হ'য়েই ত বাহির হ'য়েছি।

৯ই মে, শনিবার—সকালে সম্মুখেই একটা প্রকাণ্ড চড়াই দেখলুম। ক্রমাগত ছ'মাইল উপরে উঠতে হ'লো। দিনকতক আগে আধমাইল উপরে উঠতে গেলেই গলদ্‌ঘর্ম হ'য়ে পড়তুম, কিন্তু আজ দৃঢ়চিত্তে ছয় মাইল উঠলুম। বেলা প্রায় এগারোটার সময় আমাদের চড়াই শেষ হ'য়ে গেল। এই ছ'মাইলের মধ্যে একটাও চটি নেই ; স্থানে স্থানে পর্বতের গায়ে দু'একখানি ছোট ছোট কুঁড়েঘর ; দু'এক ঘর গৃহস্থ শান্তভাবে জীবন নির্বাহ করছে। ছয় মাইল উঠবার সময় মনে হয়েছিল নামা সহজ ; কিন্তু নামবার সময়ও দেখা গেল, কষ্ট বড় কম নয়। যা হ'ক, অনেক কষ্টে নেমে একটা চটিতে উপস্থিত হলুম।

চটিতে একখানা ঘর, আর তাতে সেই ২০০ সাধু। দোকানে যা কিছু খাবার জিনিসপত্র ছিল, তা তারাই আত্মসাৎ ক'রেছে। দুপ্রহর রৌদ্রে একটু ছায়া পর্যন্তও মিললো না ; যে তিন চারটে বড় গাছ ছিল, তার তলাতেও সাধুরা আড্ডা ফেলেছে। রৌদ্রের মধ্যে কিছুক্ষণ কষ্ট পেয়ে শেষে সেখান থেকে বাহির হলুম। আমরা সঙ্কল্প কল্লুম যে, এ-রকম ক'রে চ'লবো যে, হয় এই সাধুদের আগে থাকবো, না হয় খানিক পাছে থাকবো ; সঙ্গে সঙ্গে আর যাচ্ছিনে। এদের সঙ্গে এক চটিতে বাস আর অনাহার ও রৌদ্রবৃষ্টি সহ্য করা একই কথা। তাই সে-দিন এত কষ্টের পরে রৌদ্রের মধ্যে আবার হাঁটতে লাগলুম। কিন্তু এ-দিন যে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম, তা ব'লতে পারি নে। অল্প একটু যেতে না যেতেই ভয়ানক মেঘ ও ঝড় উঠলো। বোধ হ'লো পাহাড়ের গা হ'তে আমাদের উড়িয়ে ফেলে দেয় আর কি। সৌভাগ্যের বিষয় বৃষ্টি হ'লো না। সেই বৃষ্টিহীন ঝড়ের মধ্যে "মহাদেব চটি"তে এসে উপস্থিত হলুম। এখানে একজন বৃদ্ধ বাঙ্গালী ব'সে ছিল ; সে বড়ই দরিদ্র। আমরা তাকে পেয়ে যতদূর সুখী না হই, সে আমাদের পেয়ে খুবই হ'লো। সমস্ত দিন কষ্টের পর সন্ধ্যার সময় আশ্রয় পাওয়া গেল। আশ্রয় শুনে কেউ মনে করবেন না, বেশ চারিদিকে আঁটা সুন্দর ঘর। এ ঘর বটে, কিন্তু গাছের পাতা ডাল দিয়ে ছাওয়া ; চারিদিকে দেওয়াল কি বেড়া কিছুই নেই। দোকানদার তারই একপাশে যেখানে তার দোকান সাজিয়ে রেখেছে, সেইখানটুকু একটু শক্ত ক'রে ঘিরে নিয়েছে। দোকানে পনের ষোল সের আটা, তিন চার সের ঘি, লবণ, লঙ্কা আর কড়াইয়ের ডাল। এমন কি, তার দোকানে খানিকটা গুড় পর্যন্ত বিক্রি হয়। কিন্তু এ সমস্ত জিনিস শুধু দশ পনের জন সাধুর খোরাক ; তবে দোকানদার ভরসা দিলে, শীঘ্রই সে বড় রকম দোকান খুলবে।

যা হোক, দোকানদারের সঙ্গে পরিচয় হ'লো ; সে আমার একটি ছাত্রের পিতা। আমার পরিচয় পেয়ে সে আমাদের একটু বেশী খাতির করলে, এমন কি তার নিজের খাবার জন্যে সঞ্চিত দধিটুকু পর্যন্ত এনে আমাদের দিলে। অন্য সময় হ'লে আমরা সেই

www.pathagar.com

দধি স্পর্শ করতুম কি না সন্দেহ, কিন্তু সেদিন পশ্চিমের মিষ্টান্ন অপেক্ষা সেই দইটুকু আমাদের নিকট পরম উপাদেয় বোধ হ'লো। রাত্রিতে সেই বৃদ্ধ বাঙ্গালী-প্রবাসী মনের আনন্দে গান করলে ; বহুদিন পরে বৃদ্ধের মুখে—

"আয় মা সাধন-সমরে, দেখি মা হারে কি পুত্র হারে।"

গান শুনে বড়ই আনন্দ বোধ হ'লো ; আমিও দুর্বলকণ্ঠে প্রাণ খুলে কবিবর রবীন্দ্রনাথের প্রাণস্পর্শী মহাসঙ্গীত গাইতে লাগলুম—

"মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপতি!
তোমারি রচিত ছন্দে মহান্ বিশ্বের গীত।
মর্ত্যের মৃত্তিকা হোয়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে,
আমিও দুয়ারে তব হোয়েছি হে উপনীত।
কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি,
তোমারে শোনাব গীত, এসেছি তাহার লাগি ;
গাহে যেথা রবিশশী, সেই সভা-মাঝে বসি,
একান্ত গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত।"

গাইতে গাইতে মনে পড়ল একদিন বাঙ্গালা দেশে, আমার ক্ষুদ্র কুটীরে আমার স্ত্রী এই গানটি আমার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়েছিলেন। আজ এই দূরদেশে এ-রকম ভাবে আবার এই গান গাইব, তা কি সেদিন স্বপ্নেও ভেবেছিলুম? এখন কোথায় তিনি, কোথায় আমি? হঠাৎ অত্যন্ত চাঞ্চল্যে মন ভরে' উঠলো। এই হিমালয়, এই নিস্তব্ধতা, এই শান্তি, সব ব্যর্থ মনে হ'লো! অনেক বিলম্বে মনকে আবার সংযত ক'রে আনলুম।

www.pathagar.com

১০ই মে, রবিবার,—পশ্চিম দেশে থাকতে গেলে অনেকেই একটু-আধটু চা খাওয়া অভ্যাস করেন ; দুর্ভাগ্যবশতঃ আমারও সে অভ্যাসটা ছিল ; এবং সব ছেড়ে এসে এখনও মধ্যে মধ্যে সকালবেলা একটু চা-পানের প্রবৃত্তি বলবতী হ'য়ে উঠে। তাই আজ ভোরে এই 'মহাদেব চটি'তে একটু চায়ের যোগাড় করা গিয়েছিল। দোকানদার বেচারা তার ঝুলি ঝেড়ে চা সংগ্রহ ক'রে আমাদের জন্যে প্রস্তুত কল্লে—তাতে খানিক বিলম্ব হ'য়ে গেল। স্বামীজি ত চটেই লাল। তিনি বোল্লেন, যার এত হাঙ্গামা, তার আবার তীর্থভ্রমণে বাহির হওয়ার সখ কেন?—কিন্তু শর্করা-সংযুক্ত চায়ের সঙ্গে তাঁর ভর্ৎসনটা বেশ সহজে পরিপাক ক'রে বাহির হওয়া গেল। বিগত কল্য আমাদের সঙ্গে যে বাঙ্গালীটি জুটেছিলেন, তিনি তাঁর সঙ্গীদের জন্যে সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁকে আমাদের সঙ্গে নেবার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করা গেল, কিন্তু তাঁর পূর্বসঙ্গীদের ছেড়ে আমাদের সঙ্গ নিতে একদম্ গর্‌রাজী।

আমরা সে-বেলা ছয় মাইল হেঁটে প্রায় এগারটার সময় 'কান্তি' চটিতে উপস্থিত হলুম ; কিন্তু যাদের ভয়ে আগের দিন একটু এগিয়ে এসেছিলুম, আজ দেখি তারা সকালে আমাদের পিছনে ফেলে এই চটিতেই এসে আশ্রয় নিয়েছে! এত বেলায় এই রৌদ্রের মধ্যে আর যাই কোথায়? সেখানেই কোন রকমে কাটাতে হ'লো। কিন্তু রৌদ্রে বড়ই কষ্ট পাওয়া গেল ; তার উপর কিছু আহারেরও যোগাড় হ'লো না। তখন সকালের সেই 'চা'-এর লোভের জন্যে মনে বড় অনুতাপ উপস্থিত হ'লো ; সন্ন্যাসী মহাশয় ভারি খুসী।

এইখানে আর একজন বাঙ্গালী যুবক-সন্ন্যাসী আমাদের সঙ্গী হ'লেন। এঁর একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। ইনি ঢাকা অঞ্চলের লোক, বৈদিক ব্রাহ্মণের ছেলে, ইংরাজী জানেন না, কিন্তু বেশ সংস্কৃত জানেন। প্রথমে কলিকাতার সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন এবং উপবীত ত্যাগ করেন ; তারপর এঁর মাথায় কি একটা খেয়াল চাপে। কলিকাতায় থাকতেই তিন মাসের জন্যে মৌনব্রত অবলম্বন করেন! তখন নাকি ইনি স্লেট হাতে ক'রে বেড়াতেন এবং বক্তব্য বিষয় স্লেটে লিখে দেখাতেন! মনে সব কথাই আস্‌চে, কিন্তু তা মুখ-ফুটে না বলার মধ্যে যে কি পুণ্য লুকানো আছে, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। বোধ করি, এর কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে ; কিন্তু আমি এইটুকু বল্‌তে পারি যে, সব রকম শাস্তি সহ্য করা যায়—কিন্তু মুখ বুজে থাকাটা অসহ্য ; হাজার হাজার কথা একসঙ্গে পেটের মধ্যে জমা হ'য়ে বের হবার জন্যে ক্রমাগত ঠেলাঠেলি কচ্ছে, কিন্তু বের হ'তে না পেরে পেটের ভিতর ভয়ানক একটা অরাজকতা উপস্থিত করছে—এ বড়ই মুস্কিলের কথা। যা হ'ক তিনি সে পরীক্ষা হ'তে উত্তীর্ণ হ'য়ে কাশীতে আসেন এবং সেখানে এক গুরুর কাছে 'দণ্ড' ধারণ ক'রে সন্ন্যাসী হন। কিন্তু এ-রকম মানুষের কোনটাই বেশী দিন পোষায় না! দণ্ডীদের অনেক কঠোরতা করতে হয়! তাদের শূদ্রের বাড়িতে যেতে নেই, তাদের শূদ্র গৃহস্থের বাড়িতে ভিক্ষা নিতে নেই, এমন কি শূদ্রের সঙ্গে একত্রে বসাও নিষেধ। ব্রাহ্মণগৃহেও এক বেলার বেশী অতিথি হওয়ার নিয়ম নেই। পূজা অর্চনা যথারীতি করতে হয় : তাছাড়া দণ্ডখানি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কাছ-ছাড়া করবার যো নেই। দণ্ডী-শ্রেণীতে এমনি ক'রে শিক্ষানবিশী শেষ হ'লে কয়েক বৎসর

www.pathagar.com

পরে গুরুর আদেশে দণ্ড ত্যাগ ক'রে পরমহংস শ্রেণীতে প্রবেশ করতে পাওয়া যায়। প্রকৃত "পরমহংস" হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না, কিন্তু সব দণ্ডীই দণ্ডত্যাগ ক'রে পরমহংসত্ব লাভ করেন। ব্রাহ্মণ ছাড়া কেহ দণ্ডী হ'তে পারেন না। আমাদের দেশে উপবীত গ্রহণ যেমন, দণ্ডগ্রহণও অনেকটা তাই। উপবীতের সময় ব্রাহ্মণ সন্তান যেমন তিনদিন ঘরের মধ্যে ব'সে ফলমূলের ও গৃহসামগ্রীর সর্বনাশ করে এবং মা-বাপের মহাত্রাস জন্মিয়ে শেষে একেবারে ব্রহ্মণ্য-তেজে পরিপূর্ণ হ'য়ে বাহির হন, এঁরাও তেমনি দণ্ড গ্রহণ ক'রে দু'চার মাস বাঁধাবাঁধির মধ্যে বাস করেন ; তার পর দণ্ডখানি জলে ভাসিয়ে পরমহংস হন ও অভিমানের বোঝা ভারী করেন।

আমাদের এই নূতন সঙ্গী সন্ন্যাসীও দণ্ড ত্যাগ ক'রেছেন, কিন্তু পরমহংসশ্রেণীতে 'প্রোমশন' পাওয়ার আগেই কোন কারণে গুরুর উপর বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে দণ্ডখানি জলে ফেলে দিয়েছেন ; সুতরাং এখন তাঁর অবস্থা "না তাঁতী না বৈষ্ণব।" সন্ন্যাসীর পরিধানে গৈরিক বসন, সঙ্গে একটি কাঠের কমণ্ডলু, আর দু-তিনখানা বেদান্তদর্শন। লোকটা ঘোর বৈদান্তিক। দাম্ভিকশ্রেণীকে আমার বিশেষ ভয় ; কিন্তু এই জঙ্গলে এই বৈদান্তিককে পেয়ে মনে বড়ই আনন্দ হ'লো। লোকটা বেশ সরল প্রকৃতির ; তবে বেদান্তের দোষেই হোক, কি নিজের অদৃষ্টের দোষেই হোক, তাঁর দয়ামায়া কিছু কম ব'লে মনে হ'ল। তা না হ'লে আর মা বাপ স্ত্রী সব ছেড়ে এই ভবঘুরে বৃত্তি অবলম্বন করেছেন? ভগবান জানেন, তাঁর মনে কতটুকু শান্তি আছে ; কিন্তু তাঁকে ত সন্ধ্যা-আহ্নিক, পূজা-অর্চনা, ঠাকুর-দেবতাদের প্রণাম প্রভৃতি কিছুই করতে দেখি নি ; উপরন্তু, সে কথা বলতে গেলে মহা তর্কজাল বিস্তার ক'রে সব 'নস্যাৎ' ক'রে দেন। রাস্তাঘাটে এমন তার্কিক লোক একটা সঙ্গে থাকলে আর-কিছু না হ'ক, পথশ্রম অনেক ক'মে আসে। বাবাজীর এখনকার নাম অচ্যুতানন্দ সরস্বতী। বঙ্কিমবাবুর 'আনন্দমঠে'র সবই আনন্দ, আর রাস্তাঘাটের সন্ন্যাসীদের নামেও অধিকাংশেই আনন্দ। নামে আনন্দ আছে বটে, কিন্তু তা কার কতটুকু ভোগে লাগে, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ ; শুধু চিনির বলদের মত আনন্দের বোঝা ঘাড়ে ব'য়ে বেড়ান মাত্র।

'কান্তি' চটির সম্মুখেই একখানা ছোট গ্রাম। সেই গ্রামে সেদিন একটা বিবাহ। ঢোল বাজছিল ; আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভাল কাপড়-চোপড় প'রে, হাত-ধরাধরি ক'রে নেচে বেড়াচ্ছিল ; মুখ ভাবনাশূন্য এবং চক্ষু অত্যন্ত উজ্জ্বল ও চঞ্চল। সন্ধ্যার সময় দূরের এক গ্রাম থেকে বর আসবে। দেখ্‌লুম, মেয়েমহলের ভারি উৎসাহ লেগে গেছে ; তারা ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে নানারকম আয়োজন ক'রছে!

চটিতে জায়গা পাওয়া গেল না ; দূরে একটা বড় সেওড়াগাছের ছায়ায় ব'সে একলা এই দৃশ্য দেখতে লাগলুম। আমার সঙ্গিদ্বয় তখন নিদ্রায় মগ্ন ; আমার চক্ষে আর ঘুম এল না! আমি এই আনন্দের ছবির দিকে চেয়ে থাকলুম। একবার ইচ্ছা হ'লো আজ রাত্রে এখানেই থেকে এদের বিবাহের উৎসবটা দেখে যাই ; কিন্তু উদাসীন সাধুর দল আজ এখানে থাকলে আমাদের রাত্রিতেও অনাহার ; কাজেই বিকেলে চারটের সময় বের হ'য়ে পড়া গেল।

খানিকপথ এসেই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হ'লো। নিকটে গ্রামও নেই কোন পর্বতগহ্বরও নেই। আরো কষ্টের কারণ এই হ'লো যে, বৃষ্টির সঙ্গে এমন ঝড় বইতে লাগলো যে,

www.pathagar.com

প্রতি মুহূর্তেই নীচে প'ড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেল। আমরা পর্বতের গায়ে একটা অতি সংকীর্ণ পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম; আমাদের বাঁয়ে পর্বতের মধ্যে গঙ্গা। আমরা যেখান দিয়ে যাচ্ছিলুম, সেখান হ'তে যদি কোন রকমে একবার হাত-পা ছেড়ে দেওয়া যায় ত একেবারে পাঁচ ছয়শত ফিট নীচে গঙ্গার জলে দেহখানি নয়,—কখানা ভাঙা হাড় মাত্র পড়তে পারে। আমার হাতে সেই সাড়ে চার হাত পার্বতীয় লাঠি ; তারি উপরে ভর রেখে বহুকষ্টে কাপড় ও উত্তরীয় কম্বল ভিজাতে ভিজাতে একটা জায়গায় উপস্থিত হলুম। তখনও সমান তেজে বৃষ্টি ও ঝড় হচ্ছে। সেখান হ'তে পাঁচশ ফিট নীচে নামতে হবে ; রাস্তা এক রকম নেই বল্লেই হয়। পূর্বের রাস্তাটি ভেঙে গেছে, এখনো মেরামত হয় নি—সামান্য 'পাকদাণ্ডি' আছে মাত্র। রাস্তা সংক্ষেপ করবার জন্যে বলবান পাহাড়ীরা এড়োএড়ি যে সমস্ত ভয়ানক পথে কখনো বা গাছের ডাল ধ'রে, কখনো বা পাথরে পা আটকিয়ে, কখনো কখনো এক পাথর থেকে লাফ দিয়ে আর একটা সম্মুখের পাথরে চ'ড়ে যাতায়াত করে—তারি নাম 'পাকদাণ্ডি'। একে ঝড়বৃষ্টি, তাতে এই রকমের পথ, তার উপর আবার নীচে নামতে হবে ; বেলাও বেশী নেই ; সুতরাং আমরা যে মহা ভাবনায় প'ড়ে গেলুম, তা বলা বাহুল্য মাত্র! তবে এইমাত্র ব'লতে পারি যে, সহস্রধারা দেখতে যাওয়ার সময়ের আমি ও আজকের আমিতে তফাৎ বিস্তর। পাঠকমহাশয় হয়ত আমার এই গর্বাতিশয্যে কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করবেন ; কিন্তু বাস্তবিক ব'লতে কি, সে সময় পশ্চিমদেশে আমার প্রথম আসা ; তার পর তিন বৎসর ধ'রে পাহাড়ে চলাফেরা করতে করতে এখন শক্ত-সামর্থ্য হয়েছি ; নতুবা এই পা দু'খানার উপর কখনো এত বিশ্বাসস্থাপন করতে পারতুম না। দাঁড়িয়ে ভেজার চেয়ে পথ চলতে চলতে ভিজলে কষ্ট কম হবে, মনে ক'রে তিনজনে অতি ধীরে ধীরে, কখনো ব'সে কখনো গাছের গুঁড়ি ধ'রে নামতে লাগলুম ; এবং এক-একবার জোরে বাতাস এসে আমাদের বিষম ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলতে লাগলো।

ধীরে ধীরে নেমে অনেকক্ষণ পরে একটা পুলের ধারে এলুম। এ পুলটা ব্যাসগঙ্গার উপরে। একটি ছোট নদী গঙ্গায় প'ড়েছে। এই নদীর নামই ব্যাসগঙ্গা। আমরা বরাবর গঙ্গাকে বাঁয়ে রেখে চলেছি, অর্থাৎ গঙ্গা দক্ষিণমুখো চলেছে, আর আমরা উত্তরমুখো চলেছি। লছমন-ঝোলা হ'তে গঙ্গা পার হ'য়ে, বরাবর গঙ্গা বাঁয়ে রেখে চলতে চলতে এই নদী আমাদের পথরোধ কল্লে। ব্যাসগঙ্গাও হিমালয় থেকেই বাহির হ'য়ে কতকটা দক্ষিণদিকে এসে শেষে পশ্চিমমুখো হ'য়ে গঙ্গায় পড়েছে। এখানে ইংরেজ-বাহাদুর একটা ছোট টানা-সাঁকো তৈয়ারী ক'রে দিয়েছেন ; সাঁকোটা চল্লিশ হাতের বেশী হবে না। সাঁকো খুব ছোট করতে হয়েছে ব'লে এত নীচে তৈয়ার করানো হ'য়েছে, এ জন্যে উপরের রাস্তা থেকে আমাদের প্রায় পঁচিশ ফিট নীচে নেমে আসতে হ'য়েছিল। সাঁকোর প্রায় দেড়শ-দুইশ হাত সম্মুখে ব্যাসগঙ্গা গঙ্গায় পড়েছে।

এখানে একটা চটি আছে, তাহার নাম "ব্যাসচটি"। এ চটি একেবারে জলের ধারে। নিকটে অনেকদিনের পুরানো ভগ্নপ্রায় দুটো মন্দির আছে। সেখানকার লোকে বলে, ঐ মন্দিরের সম্মুখে ব'সে ব্যাসদেব অনেক দিন তপস্যা ক'রেছিলেন। যেখানে বড় মন্দিরটি আছে, সে জায়গাটি বড় সুন্দর। নীচেই নদী, ওপারে ছোট বড় অনেক গাছের সার। গাছগুলো বাতাসে দুলছে, আর তাদের চঞ্চল ছায়া নদীর নির্মল জলে সর্বদাই কাঁপচে।

www.pathagar.com

কিন্তু গাছের শোভার চেয়ে ময়ূরের শোভাই বেশী। ওপারের গাছগুলিতে ময়ূরের পাল। একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, এখনও আকাশে বেশ মেঘ আছে। দলে দলে ময়ূর পুচ্ছ খুলে যে কি সুন্দর নৃত্য আরম্ভ ক'রেছে, তার আর কি বলবো? তাদের ডাকে সেই বনভূমি ও নিস্তব্ধ নদীতীর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। একটা দোকানে বসে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে আমি মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম। কবির কথা এখন আমার মনে আসতে লাগলো—

"সেই কদম্বের মূল, যমুনার তীর,
সেই সে শিখীর নৃত্য,
এখনও হরিছে চিত্ত,
ফেলিছে বিরহ-ছায়া শ্রাবণ তিমির।"

কিন্তু এ যে বৈশাখ!—তা হ'লেও বৈশাখের বৈকালে মধ্যে মধ্যে শ্রাবণের ঘনঘটা চোখে প'ড়ে যায়।

এখানে নদীর ধারে কয়েকখানা দোকান আছে। অন্যান্য চটির চেয়ে ব্যাসচটিতে দোকানের সংখ্যা কিছু বেশী, এবং তাদের অবস্থাও ভাল ; কারণ শ্রীনগর হ'তে এ দিক দিয়ে ব্যাসগঙ্গার ধারে ধারে নাজিমাবাদের রাস্তা, আর এই রাস্তায় অনেক লোকজন চলে। ভিজে কাপড় কোন রকমে শুকিয়ে এখানেই রাত্রি কাটানো গেল, যতক্ষণ নিদ্রা না এল, অচ্যুতানন্দ বাবাজির সঙ্গে আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তত্ত্ব নিয়ে অন্যের দুর্বোধ্য বাঙ্গালায় কথাবার্তা কওয়া গেল।

১১ই মে, সোমবার—সকালে উঠে তাড়াতাড়ি বের হ'লুম, কারণ এখানে যে দুটি মন্দির আছে, কাল সন্ধ্যার সময় তা আর দেখা হয় নাই। মন্দির-দুটি পাথরের ; দেখলে অনেক দিনের ব'লে মনে হয় ; আর তা এমন জীর্ণ হ'য়ে পড়েছে যে, বোধ হয় আর দু তিন বছরের মধ্যেই ভেঙে একেবারে ভূমিসাৎ হবে।এইসমস্ত প্রাচীন মন্দির রক্ষা করবার জন্য চেষ্টা হওয়া উচিত। মন্দির-দুটির পুরোহিত একজন। মন্দিরের মধ্যে দেখলুম, কতকগুলি সিন্দূরমাখানো পাথর, আর দুটি অস্পষ্টাকৃতি দেবদেবীর মূর্তি। প্রত্যহ পূজো করা দূরে থাক, পুরুত ঠাকুর যে প্রত্যহ মন্দিরের দ্বারও খোলেন না, তা মন্দিরের ভিতরের চেহারা দেখলেই বেশ বোঝা যায়। তবে যাত্রীদল সে পথে যেতে আরম্ভ ক'রলে তিনি মন্দির একটু পরিষ্কার রাখেন ; আর মন্দিরের বাহিরের এক প্রস্তরখণ্ড ব্যাসের আসন ব'লে যাত্রীদের দেখিয়ে তাদের ভক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ অর্থ আকর্ষণ ক'রে থাকেন। স্থানটি দেখে যে খুব ভক্তির উদয় হয়, তার আর সন্দেহ নেই ; কিন্তু প্রতি পদে যদি বিনা বাক্যব্যয়ে এই রকম ক'রে 'নজর' দিতে হয়, তা হ'লে বদরিকাশ্রম পৌঁছিবার বহুপূর্বেই রাস্তার মধ্যে দেউলে হ'য়ে আমাদের দেশে ফিরতে হবে।

আজ আমরা দেবপ্রয়াগে পৌঁছোব। আজ অক্ষয়তৃতীয়া ; বদরিকাশ্রম বদরিনারায়ণের মন্দির আজই খোলা হবে। আমাদের ইচ্ছা ছিল, আর দু-চার দিন আগে বের হ'য়ে অক্ষয়তৃতীয়ার দিন বদরিকাশ্রমে পৌঁছি। কিন্তু তা হয় নি ; কাজেই এখন তাড়াতাড়ি পথ চলতে আরম্ভ ক'রেছি। আমরা স্থির ক'রেছি, যেমন ক'রেই হ'ক আজ দেবপ্রয়াগে পৌঁছিব। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করার জন্য যে শেষে খুব নাকাল হ'তে হবে, তা কে জানতো? সে কথা পরে বলছি!

অনেক দূরে আসার পর তিন চার দল পাণ্ডা এসে আমাদের আক্রমণ ক'রলো।

www.pathagar.com

এরা দেবপ্রয়াগ থেকে খানিক রাস্তা এগিয়ে এসে যাত্রী ধরবার জন্য ব'সে থাকে। আমাকে নিয়ে মহা পীড়াপীড়ি। আমি তাদের বুঝিয়ে দিলুম যে, আমার পাণ্ডার কোন দরকার নেই ; তবে যদি নিতান্তই দরকার হয়, তা হ'লে যে আমাকে প্রথম বলেছে, তাকেই পাণ্ডা ক'রবো। এই কথায় আশ্বাস পেয়ে একজন আমার সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগলো। যতগুলি পাণ্ডা দেখলুম, তার মধ্যে এর বয়স কম, বেশভূষার পারিপাট্যও বেশী। গলায় সোনার হার, হাতে সোনার তাগা, কাঁকালে সোনার গোট, কানে বীরবৌলী। তার নাম লছমীনারায়ণ ; বয়স ত্রিশ বত্রিশ বৎসর।

আমরা দেবপ্রয়াগে পৌঁছে বাজারে একটা দোতলার উপর বাসা নিলুম। বাজারে কোঠাবাড়ি আছে, কিন্তু ছাতে পাথর দেওয়া। অনেকগুলি দোকান ; জিনিসপত্র মোটামুটি সবই পাওয়া যায়। পাণ্ডাদের জ্বালাতন হ'তে উদ্ধার হ'য়ে দোকান ঠিক ক'রে স্থির হ'য়ে ব'সতে আমাদের প্রায় এক ঘণ্টা লাগলো। বাসা করা হ'লে আমার সঙ্গী বৃদ্ধ স্বামীজি তাঁর ব্যাঘ্রচর্ম বিছাতে গিয়ে দেখেন—ব্যাঘ্রচর্ম নেই। এই ব্যাঘ্রচর্মখানি তিনি ভাল ক'রে বেঁধে কোরিয়ার ব্যাগের মত পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে চলাফেরা করেন। তাঁর ব্যাঘ্রচর্মখানি যাওয়াতে তাঁর কিঞ্চিৎ দুঃখ হ'লো বটে, কিন্তু আমার একেবারে চক্ষুস্থির।

দেরাদুন থেকে বের হবার সময় কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে বের হ'য়েছিলুম। রাস্তায় নোট ভাঙানোর সুবিধা হবে না ; কাজেই যা কিছু অর্থ নিয়েছিলুম, তা সবই নগদ টাকা ; আর সিকি, দুয়ানি, আধুলী। সঙ্গে ট্রাঙ্ক কি ব্যাগ প্রভৃতি কিছু নেই। এতগুলি টাকা রাখি কোথায়? —তাই বন্ধুবান্ধববর্গের সুপরামর্শমত মোটা জীনের হাত তিনেক লম্বা ও দু আঙ্গুল কি আড়াই আঙ্গুল চওড়া এক থলি কিনেছিলুম ; তার মধ্যে টাকাকড়ি রেখে সেটা কোমরে জড়িয়ে রাখতে হ'ত। যেদিন রওনা হই, সেদিন সেই রকমই ক'রেছিলুম :— কিন্তু চলবার সময় সেটাতে বড় অসুবিধা বোধ হ'তে লাগলো। তাই স্বামীজির পরামর্শমত সেটা তাঁর ব্যাঘ্রচর্মের সঙ্গে জড়িয়ে দুই পাশে মোটা দড়ি দিয়ে শক্ত ক'রে বেঁধেদিলুম। ঐ ভাবে গত কয়দিন চ'লে এসেছে। আজ খুব শীঘ্র চলতে হবে ঠিক ক'রে সকলেই ভারি তাড়াতাড়ি লাগিয়েছিলেন ; কিন্তু খানিক রাস্তা তাড়াতাড়ি চললেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়তে হয় ; এই জন্যে আমাদের রাস্তায় দু-তিন জায়গায় বসতে হ'য়েছিল। একটা জায়গায় ব'সে স্বামীজি তাঁর স্কন্ধ থেকে ব্যাঘ্রচর্মটা একবার নামিয়েছিলেন,—তার মধ্যে পয়সাকড়ি সব, সঙ্গে কিছু নেই বল্লেই হয়। স্বামীজি প্রথমে বল্লেন, তিনি কখনও সেটা রাস্তায় ফেলে আসেন নি। দেবপ্রয়াগে পৌঁছিবার পর পাণ্ডা বেটারাই কেউ হাতিয়েছে। তিনি আরো বল্লেন যে, এখানে পাণ্ডাদের যে রকম উপদ্রব, তাতে তারা গলায় ছুরি না দিয়ে যে ব্যাঘ্রচর্ম কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে, এই আমাদের ঢের পুণ্যের কথা! আমি হতাশ ভাবে বল্লুম, "আর ব্যাঘ্রচর্ম! আপনার শুধু ব্যাঘ্রচর্ম গেছে মনে ক'রেই পুণ্যের কথা বলছেন, আমার যে যথাসর্বস্ব গেছে ; এর চেয়ে গলায় ছুরি দেওয়া অনেক ভাল ছিল!" আমার মন কি রকম খারাপ হ'লো, তা আর কহতব্য নয়। কিন্তু যাকে পাণ্ডা স্থির করবো ব'লে আশ্বাস দিয়েছিলুম, সে বল্লে, আমরা বাজারের মধ্যে বসি নি, আর পাণ্ডাদের দ্বারাও এ রকম কাজ হয় নি। আমরা নিশ্চয়ই সেটা রাস্তায় কোথাও ফেলে এসেছি।

বাদানুবাদে প্রায় পনের মিনিট কেটে গেল। শেষে সেই পাণ্ডা প্রস্তাব কল্লে যে, রাস্তায় আমরা যেখানে যেখানে বসেছিলুম, সেই সমস্ত জায়গা সে নিজে ও তার সঙ্গে

www.pathagar.com

অচ্যুতানন্দ বাবাজি গিয়ে খোঁজ করে আসবে। কিন্তু তাতে যে কিছু ফল হবে, আমি একবারও সে আশা করি নি। মাথায় হাত দিয়ে ব'সে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলুম। এই পাহাড়ের মধ্যে বন্ধুহীন দেশে কি রকম ক'রে দিন কাটাবে? এক উপায় আছে,—ভিক্ষা; কিন্তু এ পাহাড়ের মধ্যে কে কয়দিন ভিক্ষা দেবে? তবে আর এক রকম সভ্যতাসঙ্গত ভিক্ষা আছে, আতিথ্য স্বীকার করা; এতে কতক অভ্যাস আছে বটে; কিন্তু এ বৎসর দুর্ভিক্ষের প্রকোপ থাকায়—পাহাড়ের মধ্যে যে দুই চারিখানি গ্রাম আছে, সেখানকার লোকেরাই একরকম খেতে পায় না—তা তারা অতিথিকে কি খেতে দেবে? আমি এই সমস্ত কথা চিন্তা করতে লাগলুম, স্বামীজি শুয়ে পড়লেন। অচ্যুতানন্দ স্বামী পাণ্ডাঠাকুরের সঙ্গে অসাধ্য-সাধন করবার জন্য চ'লে গেলেন। রাস্তায় যদি ফেলে এসে থাকি ত সে স্থান যে কোথায় তার কিছু ঠিক নেই; আর তারপর প্রায় তিন ঘণ্টা কেটে গেছে, এঁদের খুঁজতে খুঁজতে কোন আরও একঘণ্টা না লাগবে? এই সময়ের মধ্যে কত যাত্রী, কত বকরিওয়ালা সে পথ দিয়ে যাতায়াত ক'রেছে। এতগুলো লোকের মধ্যে সে ব্যাঘ্রচর্ম কারো চোখে কি পড়ে নি?—যা হোক তাঁদের পথ চেয়ে ব'সে রইলুম! এ দিকেও ভিক্ষা—ওদিকেও ভিক্ষা; দেখা যাক,—তাঁরা ফিরে এলে যা হয় করা যাবে!

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে দেখি তাঁরা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসছেন। তাঁরা অনেক নিকটে এলে অচ্যুতানন্দ বাবাজি খুব চেঁচিয়ে বল্লেন, "মিল গিয়া, মিল গিয়া।" আমি অকূল পাথারে কূল পেলুম। তাঁরা একেবারে প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়িয়েছিলেন। লছমীপ্রসাদ পাণ্ডা এসে থলিসুদ্ধ টাকা মাটিতে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাত দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসে পড়লো। তাঁদের অবস্থা দেখে টাকা কিরূপে কোথায় পাওয়া গেল, তা আর তখন জিজ্ঞাসা কল্লুম না। শেষে তাঁরা শান্ত হ'য়ে ব'ল্লেন যে, রাস্তায় চলতে চলতে যাদের সঙ্গে তাদের দেখা হয়েছে, তাদেরই ব্যাঘ্রচর্মের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন; কিন্তু কেউ কোন কথা বলতে পারেনি; শেষে এক সন্ন্যাসী বলেছিল যে, প্রায় দেড় মাইল তফাতে একটা ঝরণার পাশে একখণ্ড বড় পাথরের উপর সে একখানা ব্যাঘ্রচর্ম পড়ে থাকতে দেখেছে! তার মনে হয়েছিল, বুঝি কোন সন্ন্যাসী সেখানে আসন রেখে বনের মধ্যে প্রবেশ করেছে। এই কথা শুনে তাঁদের মনে আশা হ'ল। তাঁরা দৌড়তে দৌড়তে সেখানে গিয়ে দেখেন যে, ব্যাঘচর্মখানি ঠিক সেখানে সেই রকম বাঁধা অবস্থাতে প'ড়ে আছে। অচ্যুতানন্দ তা তুলে নিলেন, কিন্তু হাতে ক'রেই তাঁর হরিষে-বিষাদ উপস্থিত হ'লো। আসন পাতলা; খুলে দেখেন ভিতরে কিছুই নেই, অথচ উপরে যেমন বাঁধা ছিল তেমনি বাঁধা! দুজনেই মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন। কিন্তু একটু পরেই পাণ্ডাঠাকুর উঠে চারিদিক অনুসন্ধান ক'রে দেখতে লাগলেন; কিছুই দেখতে পেলেন না। তাঁরা সে রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নীচে নেমে গেলেন। আর একটু নীচে গিয়ে দেখেন একটি রাখালবালক কতকগুলি মেষ চরাচ্চে। তাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন সেখান দিয়ে কোন লোক নেমে গেছে কি না। পাণ্ডাজির কেমন বিশ্বাস হ'য়েছিল যে, যে টাকা নিয়েছে, সে কখনো প্রকাশ্য পথ দিয়ে যেতে সাহস করে নি, এদিক ওদিক দিয়ে নেমে গেছে। পশ্চিমে পাণ্ডার এতটা বুদ্ধির পরিচালনা অবশ্য একটু অসাধারণ! যাহোক, প্রথমে রাখাল বালক পাণ্ডাজিকে কোন কথাই বলতে পাল্লে না; শেষে খানিক ভেবেচিন্তে বল্লে যে, সে যেন সেই পথ দিয়ে একজন সন্ন্যাসীকে খানিক আগে যেতে দেখেছে। তাই শুনে পাণ্ডাঠাকুর ঠিক

www.pathagar.com

কল্লেন, এ টাকা চুরি সেই সন্ন্যাসী ছাড়া আর কারও কাজ নয়। রাখাল যে পথ দেখিয়ে দিলে, সে কাঁটা-জঙ্গল ভেঙে তাঁরা সেই দিকে দৌড়তে লাগলেন। কাঁটায় সর্বশরীর ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেল। তাতে ভ্রুক্ষেপ না ক'রে দৌড়তে দৌড়তে দেখলেন—খানিক আগে একজন সন্ন্যাসী উপরের দিকেই উঠ্‌চে। পাণ্ডাঠাকুর তার অলক্ষ্যে তার পিছু পিছু যেতে লাগলেন। সন্ন্যাসী বেশ বলবান বোধ হওয়ায় এই নির্জন প্রদেশে তাকে একেবারে চেপে ধ'রতে তাঁর কিছু ভয় হোলো। যা হোক, রাখাল বালকও ব্যাপার কি জানবার জন্য ধীরে ধীরে পাণ্ডাজির পেছনে পেছনে আসতে লাগলো। অচ্যুত বাবাজিও একটু একটু ক'রে অগ্রসর হ'চ্ছিলেন। চোর সন্ন্যাসী যখন ধীরে ধীরে নীচে রাস্তার উপরে যাবার আয়োজন কচ্ছিলো, তখন পাণ্ডাঠাকুর অদূরে রাস্তার উপর অচ্যুত বাবাজিকে দেখে সাহস পেয়ে এক দৌড়ে সিংহবিক্রমে সেই সন্ন্যাসীর ঘাড় চেপে ধ'রে একেবারে "শালা চোর, নিকালো রূপেয়া" ব'লে চীৎকার ক'রে উঠলেন। ওদিকে অচ্যুত বাবজি "ক্যা হুয়া" বোলে এক লম্ফে সেখানে উপস্থিত। সন্ন্যাসী চোর ত একেবারে থ! তার আর কোন কথা বলবার শক্তি রইল না। সে নিজেও খুব জোয়ান বটে ; কিন্তু আগে পাছে দু'জন ষণ্ডামার্কা দেখে তার বড় ভয় হ'ল, এবং সে সব কথা স্বীকার ক'রে পাণ্ডাজির পায়ে ধ'রে কান্নাকাটি আরম্ভ ক'রলে। তারপর তিনজনে মিলে সেই ঝরণার কাছে এসে থলি খুলে দেখে যে, একটি টাকাও কমে নি। সন্ন্যাসী চোরটা বড়ই নির্লজ্জ ; কোথায় চুরি ক'রে ধরা প'ড়েছে ব'লে পালাবার চেষ্টা ক'রবে, না—কিছু ভিক্ষার জন্যে তাদের দুজনকে ধ'রে ব'সলো। টাকা পেয়ে তাদের এতই স্ফূর্তি হলো যে, দয়ার্দ্র হ'য়ে তারা তাকে এক টাকা বকশিশ দিলেন ; আর সেই রাখালকে ডেকে তাকে চার আনা পুরস্কার দিয়ে এই সংবাদ আমাদের জানাবার জন্যে প্রাণপণে ছুটে আসছেন। আমি পাণ্ডাজিকে পাঁচ টাকা পুরস্কার দিতে গেলুম! সে কিছুতেই তা নিলে না, বোল্লে, "বাবাজি, ইনাম কা ওয়াস্তে ইতনা তকলিফ লেনেকো আদমী মেঁই নেহি হুঁ, আপ্‌কো ওয়াস্তে প্রাণ ব্যাকুল হুয়া থা!" তার এই স্বার্থশূন্য কথাগুলি শুনে, আমি যে টাকা দিয়ে তার পরিশ্রমের মূল্য নির্দেশ ক'রতে গিয়েছিলুম, এ ভেবে মনে বড় লজ্জার উদয় হ'লো ; কিন্তু তার এই মহৎ ব্যবহারে আমার খুব আনন্দ হ'লো। এই পর্বতবাসী একজন অশিক্ষিত পাণ্ডা আমার মত অপরিচিতের জন্যে যে কষ্ট স্বীকার কল্লে, দেশের কোন পরিচিত আত্মীয়বন্ধুও এর চেয়ে বেশী করতে পারতেন না ; এ রকম মহত্ত্বের দৃষ্টান্তও অতি বিরল।

দেবপ্রয়াগ গঙ্গা-অলকানন্দার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। গাড়োয়ালের মধ্যে দেবপ্রয়াগ একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানকার হাটবাজার বেশ ভাল। বদরিনারায়ণের পাণ্ডাদের বাস এইখানেই। প্রায় পাঁচশত ঘর পাণ্ডা এখানে বাস করে। এদের অনেকেরই অবস্থা ভাল ; ঘর-বাড়ি পাকা এবং সকলেই এক জায়গায় থাকে। গঙ্গা ও অলকানন্দা যেখানে সম্মিলিত হ'য়েছে, তারই ঠিক উপরে একটু সমতল স্থান আছে। সেই স্থানের মধ্যেই এই পাঁচশ ঘর গৃহস্থ কোন রকমে বাস ক'রছে।

দেবপ্রয়াগে একটা পুরানো মন্দির আছে ; মন্দিরটা পাণ্ডাদের বাড়ির ঠিক মধ্যখানে। এই মন্দিরে রামসীতার মূর্তি আছে। গাড়োয়ালের রাজা—এখন তাঁকে টিহ্‌রীর রাজা বলে, —এ মন্দিরের অধিকারী। মন্দিরের অনেক ধনসম্পত্তি আছে। টিহ্‌রী রাজ্যের নিয়ম এই যে, রাজার মৃত্যু হ'লে তাঁর নিজ ব্যবহার্য সমস্ত জিনিস এই মন্দিরে পাঠানো হয়। মন্দিরের

www.pathagar.com

সমস্ত আয়ব্যয়ের ভার টিহরীর রাজার উপর ; তাঁর নিযুক্ত পুরোহিতের উপর দেবসেবার ভার আছে।

পাণ্ডার সঙ্গে গিয়ে সঙ্গমস্থলে স্নান কল্লুম ; গঙ্গা ও অলকানন্দার মধ্যে অলকানন্দাকেই বড় ব'লে মনে হয়। এখন আমাদের অলকানন্দার ধারে ধারে যেতে হবে। আমাদের যেখানে বাসা, সেখান থেকে সঙ্গমস্থলে যেতে হ'লে অলকানন্দা পার হ'তে হয়। ইংরাজের প্রসাদে এখন আর ঝোলা পার হ'তে হয় না। যেখানে যেখানে ঝোলা ছিল, সেই সমস্ত জায়গায় এখন এক একটা সুন্দর টানা পুল তৈয়ারি হ'য়েছে। ইংরাজেরা যে কয়টি সাঁকো তৈয়ারি ক'রেছেন, তার মধ্যে এইটিই সব চেয়ে বড় ও সুন্দর। এর নির্মাণ-প্রণালী কলিকাতার সন্নিহিত চেতলার পুলের মত। এই সমস্ত ভয়ানক স্থানে বহু অর্থ ব্যয় ক'রে পুল তৈয়ারি করিয়ে ইংরাজরাজ বহু প্রতিষ্ঠা ও আশীর্বাদভাজন হ'য়েছেন ; প্রকৃতপক্ষে বদরিকাশ্রমের পথ ইংরাজের প্রসাদেই অনেক সুগম হয়েছে।

বিকালে আমরা মন্দির দেখতে গেলুম ; ঠাকুরের গায়ে স্বর্ণ ও মণিমুক্তার অলঙ্কার। আমার পাণ্ডা আমাকে বাঙ্গালীর এক কুকীর্তির কথা শুনিয়ে দিলে। লজ্জায় আমার মুখ চোখ লাল হ'য়ে উঠলো! দেবপ্রয়াগে ভদ্র বেশধারী বাঙ্গালীকে এখন সকলেই সন্দেহের চক্ষে দেখে, এমন কি তার গতিবিধি পর্যন্ত পর্যবক্ষণ ক'রে থাকে। বাঙ্গালীর পক্ষে এ বড় কম লজ্জার কথা নয়। যাকে বড় বেশী বিশ্বাসী ব'লে মনে হয়, সে যদি অবিশ্বাসের কাজ করে তা হ'লে তার পরে কি আর কাউকে তেমন সহজে বিশ্বাস করা যায়? ব্যাপারটা কি, এখানে বলা যাক!

আজ প্রায় পাঁচ বৎসর হ'লো একদিন এক বাঙ্গালী বাবু দেবপ্রয়াগে এসে উপস্থিত হন। তীর্থদর্শন তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর বাড়ি কলিকাতায়, তবে ঠিক সহরের মধ্যে কি না তা বলা যায় না। সে বাঙ্গালীর নামটাও শুনেছিলাম ; সেটা আমার ডাইরীতেও লেখা ছিল ; কিন্তু পেন্সিলের লেখা মুছে গেছে ; আর তাঁর নামটা মুছে যাওয়ায় আমি কিছুমাত্রও দুঃখিতও নই। বাঙ্গালী জাতি থেকে যদি তাঁর নামটা মুছে যেত, তা হ'লে তাঁর কুকীর্তির কথা শুনে আমাকে এত লজ্জিত হ'তে হ'তো না।

দেবপ্রয়াগে এসে তিনি প্রথমে একদিন থাকবেন ব'লে বাসা নিয়েছিলেন। কিন্তু স্থানটি অতি মনোরম বোধ হওয়াতে তিনি এখানে বেশী দিন ধ'রে বাস করতে লাগলেন। এখানে একটা ইংরাজের থানা আছে। থানার লোকজনের সঙ্গে বেশ ভাব হ'লো ; ডাকঘরের বাবুর সঙ্গে বেশ আলাপ পরিচয় হ'লো ; বড় বড় পাণ্ডাদের সঙ্গেও বন্ধুত্ব স্থাপন ক'ল্লেন, এবং একজন ইংরেজী জানা ধনশালী (পশ্চিমে একটু ফিটফাট থাকলেই সে দেশের লোক ভাবে এ ব্যক্তি একজন রাজা মহারাজা হবে) বাঙ্গালী বাবুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতায় সকলেই আপনাকে একটু কৃতার্থ মনে ক'রতে লাগলো।

বাবু প্রত্যহই রামসীতা দর্শন করতে যান ; মহাভক্তির সঙ্গে ঠাকুরদের দিকে—কি ঠাকুরদের গহনার দিকে ঠিক বলা যায় না—চেয়ে থাকেন, এবং আর সব দর্শক ও যাত্রী চ'লে গেলে তিনি সকলের শেষে মন্দির থেকে বাহির হন। তিনি দেখলেন বাহিরের দিক থেকে একটা বড় তালা দিয়ে মন্দির বন্ধ করা হয়, সুতরাং মন্দিরের এই তালার দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়লো। পোস্টামাস্টার বাবুর আফিসের তালাটিও অনেকটা এই রকমের ; কিন্তু সেদিকে আর কাহারও দৃষ্টি পড়ে নি ; আর পোস্টমাস্টারকেও বড় একটা আফিস

www.pathagar.com

বন্ধ ক'রতে হয় না ; কাজেই সেই চাবিটা কোলুঙ্গার উপর অযত্নে প'ড়ে থাকে। বাঙ্গালীবাবু সেই চাবিটা হস্তগত ক'ল্লেন এবং তাকে ঘষে সেই মন্দিরের তালায় লাগাবার উপযোগী ক'রে নিলেন। শেষে একদিন রাত্রিতে যখন সকলে নিদ্রিত—সেই সময় তিনি ধীরে ধীরে মন্দিরের দ্বার খুলে মন্দিরে প্রবেশ ক'ল্লেন এবং দ্বার বন্ধ না ক'রেই ভিতরে চলে গেলেন। মন্দিরের বাহিরে একটা ছোট ঘরে পুরোহিতের একজন লোক শয়ন ক'রে ছিল। সে কার্যবশতঃ উঠে দেখে, মন্দিরের দ্বার খোলা, ভিতর থেকে আলো আস্‌ছে। এত রাত্রিতে মন্দিরের দ্বার খোলা দেখে তার ভারি সন্দেহ হ'লো। সে চুপে চুপে মন্দিরের কাছে গিয়ে দেখে ভিতরে টুক্‌টাক্ শব্দ হচ্ছে। সে উচ্চবাচ্য না ক'রে প্রথমে মন্দিরের পাশে একটা দুয়ার ছিল (সেটা ভিতর থেকে বন্ধ) সেই দুয়ারটাতে শিকল টেনে দিলে ; তার পর নিজের ঘর থেকে সেই বড় দরজার চাবি এনে দুয়ার বন্ধ ক'রে চীৎকার আরম্ভ করলে।

চোর মহাশয় ইতিমধ্যে মন্দিরে প্রবেশ ক'রে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অলঙ্কারগুলি —কতক বা ঠাকুরদের গা থেকে এবং কতক বাক্স ভেঙে বের ক'রে—গায়ের কাপড়ের উপর রেখেছেন। তিনি বিশ্বস্ত-চিত্তে এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত—সহসা মন্দির-দ্বারে জনকোলাহল শুনে তাড়াতাড়ি দুয়ারের কাছে এসে দেখেন দ্বার বন্ধ! দশ মিনিটের মধ্যে চারিদিকে পাণ্ডার দল এসে জুটলো ; মেয়েপুরুষে সেই মন্দির-প্রাঙ্গণ পূর্ণ হ'য়ে গেল। বাবাজি বিনা চেষ্টাতেই ধরা পড়লেন, কাপড়ে বাঁধা জহরৎ সমস্তই বাহির হ'য়ে পড়লো। টিহ্‌রী রাজ্যে দু'বৎসর মেয়াদ খেটে তার পর ইংরেজের কাছে বিচার হ'য়ে তার আরো দু বছরের জেল হ'ল। জেল থেকে বের হ'য়ে সেই পুরুষপুঙ্গব এখন যে কোথায় স'রে পড়েছেন, তা জানা যায় নি। এখন ভদ্রবেশধারী যুবক দেখলেই মন্দিরের লোক তার দিকে সন্দিগ্ধচিত্তে চেয়ে থাকে, এবং বিশেষ সাবধান হয় ; আমি যে তাদের সন্দহ থেকে এড়িয়েছিলুম, তা বোধ হয় না। আমার বয়সের লোক যে কোন একটা বিশেষ অভিপ্রায় ছাড়া এত কষ্ট ক'রে শুধু তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্যে এতদূর এসেছে, এ কথা আর তারা সহজে বিশ্বাস করতে রাজী নয় ; কেন না তাদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অন্য রকমের। শুধু এই হতভাগাই যে এ দেশে আমাদের নামে কলঙ্ক রেখে গেছে তা নয়, পশ্চিমের আরও অনেক স্থানে অনেক বাঙ্গালীর কুকীর্তির কথা শুনতে পাওয়া যায় ; এবং সে সমস্ত কথা শুনে অধোবদন হ'তে হয়। কিন্তু আজকাল অনেক ভদ্রলোক পশ্চিমে গিয়ে আমাদের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার ক'রেছেন এবং ভরসা আছে, তাঁদের মহত্ত্বে আমরা ভবিষ্যতে এ সব দেশে বাঙ্গালী ব'লে পরিচয় দেওয়া বিশেষ গর্বের কথা মনে ক'রবো।

www.pathagar.com

দেবপ্রয়াগ

১২ই মে মঙ্গলবার,—আজ দেবপ্রয়াগে অবস্থান। অনেকদিন পরে লোকালয়ে এসেছি ; বোধ হ'লো এতদিন যেন জীবনের নেপথ্যে নেপথ্যে বেড়াচ্ছিলুম,— তার মধ্যে না ছিল জনকোলাহল না ছিল কিছু ; কেবল মুক্ত প্রকৃতি তার সমস্ত সৌন্দর্য থরে থরে সাজিয়ে —আমার হৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠান ক'রেছিল। আজ হঠাৎ মানব-কোলাহলে সে দৃশ্যের পরিবর্তনে একটু নূতনত্ব পাওয়া গেল। বাজারের দোকানদারদের কেনাবেচার গোল, পাণ্ডাদের যাত্রী সম্বন্ধে আলোচনা, ছোট ছোট ছেলেমেয়ের হাসি গল্প প্রভৃতি শুনে মনে হ'লো এতদিন পরে বুঝি সংসারে ফিরে এলুম। সঙ্গে সঙ্গে একটু আরাম ও সুখভোগের ইচ্ছাটাও বেশ প্রবল হ'য়ে উঠল। এতদিন ত অবিশ্রান্ত পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম, খানিক বোসে আয়েস করার কথা ত একবারও মনে হয়নি। কিন্তু আজ পা দুটো একটু ছুটি নেবার জন্যে মহাব্যতিব্যস্ত ক'রে তুললে। আমি ফিলজফাইজ কল্লুম, যতক্ষণ মানুষ কষ্টের মধ্যে থাকে, যতক্ষণ দেখে যে কষ্ট ছাড়া আর কিছু লাভের কোন সম্ভাবনা নেই, ততক্ষণ সে তা বেশ ঘাড় হেঁট ক'রে সহ্য করে যায় ; কিন্তু যখনই তার ফাঁক দিয়ে একটু সুখের ছায়া নজরে পড়ে, তখনই আবার সে সব ছেড়ে সেই সুখটুকুর পিছু পিছু ছোটে, আর তা লাভ করতে না পাল্লেই নিজের মহা দুর্ভাগ্য ব'লে মনে করে। আমার আজ আর উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না, কিন্তু নগর ত দেখা চাই ; কাজেই আসল্য ঝেড়ে উঠে নগর ভ্রমণে বাহির হওয়া গেল।

দেবপ্রয়াগের দৃশ্যশোভা বড় সুন্দর। পূর্বেই বলেছি এখানে গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গম হয়েছে। গঙ্গার মাহাত্ম্য বেশী, তাই লোকে বলে গঙ্গায় অলকানন্দা মিশেছে; কিন্তু ঠিক কথা বলতে গেলে বলা উচিত অলকানন্দার সঙ্গে গঙ্গা মিশেছে। অলকানন্দা ঘোররবে নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে ; তার উচ্ছৃঙ্খল বেশ, তার তরঙ্গকল্লোল, আর তার উচ্চ তটভূমির বিস্তীর্ণ পাথরের উপর শ্যামল শৈবালের স্নিগ্ধ শোভা দেখে তাকে কবিতার একটা জীবন্ত প্রতিকৃতি বোলে বোধ হয়। সেই ভৈরব দৃশ্যের মধ্যে গঙ্গা কুলু কুলু রবে তার নির্মম জলরাশি ঢেলে দিচ্ছে। আমাদের বঙ্গের সমতল ক্ষেত্রে দুটো নদীর একটা সঙ্গম বড় বিশেষ ব্যাপার নয় ; দৃশ্যতেও তেমন কিছু বৈচিত্র্য থাকে না—কেবল সঙ্গমস্থলটা খানিকটা প্রশস্ত হয় মাত্র ; আর দুটো নদী যে কেমন ক'রে মিশে গেল, তার খবরও পাওয়া যায় না, স্বতন্ত্র অস্তিত্বের চিহ্ন ত দূরের কথা! কিন্তু এ দেশের পার্বত্য নদী পার্বত্য জাতির মতই তেজস্বী ; সহজে আত্মবিসর্জন ক'রতে রাজী নয়, যথেষ্ট আয়োজন ক'রে তবে আত্মবিসর্জন করে।

বদরিকাশ্রমের পথে যে ক'টা জায়গা দেখেছি, তার মধ্যে দেবপ্রয়াগই আমার সব চেয়ে ভাল বোধ হ'লো। সে যেন ঠিক একখানি ছবি। পর্বতের বিবিধ দৃশ্য, ছোট ছোট ঘর বাড়ি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আঁকা-বাঁকা রাস্তা, অনুচ্চ মন্দির, যেন পর্বতের গা খুঁদে বের করা হয়েছে। তার পর বৃক্ষলতা, নানারকম সুন্দর সুন্দর ফুল, স্বচ্ছন্দচিত্ত গাড়োয়ালীদের নিঃশঙ্ক পদচারণা ও বেশবিন্যাসশূন্য প্রফুল্ল বালক-বালিকার ছুটোছুটি বা শাখাপত্র-প্রচুর দীর্ঘ বৃক্ষমূলে জটলা, এ সব দেখে মনে হয় না যে এ আমাদের সেই বহু প্রাচীন, জ্ঞানবৃদ্ধ, নিয়মাবদ্ধ, এবং দুঃখ ও অশান্তিপূর্ণ পৃথিবীরই একটা অংশ। এখানে

www.pathagar.com

এসে বাস্তবিকই—

"শুধু জেগে উঠে প্রেম মঙ্গল মধুর,
বেড়ে যায় জীবনের গতি ;
ধূলিধৌত দুঃখ শোক শুভ্রশান্ত বেশে
ধরে যেন আনন্দ মূরতি।
বন্ধন হারায়ে গিয়ে স্বার্থ ব্যাপ্ত হয়
অবারিত জগতের মাঝে,
বিশ্বের নিশ্বাস লাগি জীবন-কুহকে,
মঙ্গল আনন্দধ্বনি বাজে।"

আমরা এখানে এসে যেখানে বাসা নিয়েছিলুম, সেখান হ'তে পাণ্ডাদের যেখানে বাস, সেখানে যেতে হ'লে একটা সাঁকো পার হ'তে হয় ; এ সাঁকোটা অলকানন্দার উপর। দেবপ্রয়াগ আবার দু'ভাগে বিভক্ত, বাজারটা ইংরেজদের, আর বাকী শহরটা তিহরীর রাজার। এই অলকানন্দা বৃটিশ গাড়োয়াল ও স্বাধীন গাড়োয়ালের সীমা নির্দেশ করেছে।

এখানকার পাণ্ডাদের মধ্যে বেশ লেখাপড়ার চলন আছে, তবে এখানে বড় কেউ ইংরেজী লেখাপড়ার ধার ধারে না। হিন্দী ও সংস্কৃতেরই চর্চা বেশী। কলিকাতার কোন হিন্দী সাপ্তাহিক কাগজ এখানে তিন-চারখানা আসে। এখানে আমাদের দেশের কাগজ আসে শুনে মনে বড় আনন্দ হ'লো; আমার পাণ্ডা আমাকে সেই কাগজ একখানা এনে দিলে ; তাতে আমাদের দেশে শেয়ালের উপদ্রবের খবর পাওয়া গেল ; একটা গ্রামে হরিসংকীর্তন হয়েছিল, তার এক দীর্ঘ বিবরণ, আরো কত কি পড়লুম,—পরনিন্দা, পরকুৎসা, এবং সঙ্গে সঙ্গে হরিসভার সঠিক বিবরণ পাঠ ক'রে আমার যথেষ্ট উপকার ও প্রচুর আনন্দ হ'লো ; কিন্তু এ সকল সংবাদে এই পাহাড়ী জাতির কি লাভ, তা অনুমান করা আমার সাধ্যাতীত। বিকেলে পোস্টামাস্টার বাবুর কাছে শুনলাম, এদেশে কারো নামে একখানা খবরের কাগজ আসা বিশেষ গৌরবের বিষয়।

দেবপ্রয়াগে প্রায় ৫০০ ঘর পাণ্ডার বাস ; কিন্তু এত লোকের বাসের জন্যে আমাদের দেশে যতখানি প্রশস্ত জায়গার দরকার, ততখানি দূরের কথা, সমস্ত গাড়োয়াল রাজ্যে তার শতভাগের একভাগ সমতলভূমি আছে কি না সন্দেহ। দেবপ্রয়াগে সমতলভূমি নেই। পাহাড়ের গায়ে যে ঢালু আছে, তারই উপর লোকের বসবাস। একটা জায়গা একটু কম ঢালু—সেইখানে এই পাঁচ ঘর পাণ্ডা বাস ক'চ্চে। একটা বাড়ির মধ্যে হয়ত দশ-পনেরটি গৃহস্থের বাসস্থান। বাড়িগুলি অপ্রশস্ত, ঘরে জানালার সম্পর্কমাত্র নেই, যেন এক একটা সিন্দুক, আলো ও বাতাসকে যতদূর সম্ভব তাদের ভিতর থেকে নির্বাসিত ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। কোন কোন বাড়ি তিন চার তলা। রাস্তার ভাল বন্দোবস্ত নেই, কারো ঘরের বারান্দা দিয়ে, কারো ঘরের ভিতর দিয়ে যাওয়া আসা ক'রতে হয়! এই ত বাড়ির অবস্থা—এর এক এক ক্ষুদ্র কুটীরে এক এক বৃহৎ পরিবারের বাস। তার মধ্যেই রান্নাঘর, গোরুর ঘর এবং নিজেদের থাকবার বন্দোবস্ত। পা দুটো যেমন জুতো জোড়াটার ভিতরকার সমস্ত স্থানটা অধিকার ক'রে জলকাদা থেকে আপনাদের বাঁচিয়ে দিব্য স্বচ্ছন্দে বাস করে, এদের এই সংকীর্ণ ঘরে বাসও অনেকটা সেই রকমের। আলাদীনের প্রদীপের দৈত্য যেমন এক রাত্রির মধ্যে এক সুবৃহৎ অট্টালিকা তৈরী ক'রেছিল, সেই রকম একটা

www.pathagar.com

দৈত্য এসে যদি এই সব ক্ষুদ্র কুটীর ভেঙে একরাত্রির মধ্যে বড় বড় ঘর তৈয়ারী ক'রে দিয়ে যায়, তবে এই পাণ্ডা বেচারীরা তাদের মধ্যে একদিন বাস ক'রেই হাঁপিয়ে উঠে।

পাণ্ডাদের ঘর-দ্বারের অবস্থা এরকম হ'লেও তারা খুব গরীব নয়। বদরিনারায়ণের অনুগ্রহে প্রতি বৎসর এই সময় তারা বেশ দু'দশ টাকা রোজগার করে, আর তাতেই তাদের সমস্ত বছরটা চলে যায়। হরিদ্বার, কাশী, গয়া কি অযোধ্যার পাণ্ডারা যে রকম জোর-জবরদস্তী ক'রে যাত্রীর কাছ থেকে টাকা আদায় করে, এরা সে রকম নয়; আর এরা অল্পেই সন্তুষ্ট। মধ্যে মধ্যে এরা নীচে নামে, অনেকে কাশী পর্যন্তও যায়; কিন্তু বাঙ্গালাদেশ পর্যন্ত এগোয় না! গ্রীষ্মের ভয়েই তারা বাঙ্গালায় যেতে চায় না। হরিদ্বার, হৃষিকেশ প্রভৃতি জায়গা হ'তে তারা যাত্রীদের সঙ্গ নেয়। পাণ্ডারা অতি শুদ্ধাচারী; এদের মধ্যে কর্ণাটি, দ্রাবিড়ী, সৌরাষ্ট্রী ও দক্ষিণী ব্রাহ্মণই বেশী। এদেশে মোটেই মুসলমান নেই। পাণ্ডারা মাছ মাংস স্পর্শও করে না; এদের চলন মিতাক্ষরার মতে।

সঙ্গী সন্ন্যাসী দুজন আজ সমস্ত দিন বিশ্রাম করবেন, ঠিক ক'ল্লেন; আমি বেচারা দিনটা কেমন ক'রে কাটাই, ভেবে না পেয়ে বেরিয়ে পড়লুম। অনেকক্ষণ পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়ানো গেল, অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ হ'লো। আমি খানিক বেড়াচ্ছি, খানিক বা একখানা পাথরের উপর ব'সে প্রকৃতির শোভা দেখছি; অস্তমান সূর্যের রশ্মিজাল পর্বতের পাশ দিয়ে শ্যামল প্রকৃতির মধ্যে এসে বিকীর্ণ হ'য়ে পড়চে। আমার দৃষ্টি কখনো ধূসর পর্বত-অঙ্গে, কখনো সূর্যকিরোণোদ্ভাসিত জ্যোতির্ময়ী অলকানন্দার উপর।

দেখতে দেখতে কতকগুলি পর্বতবাসিনী রমণী এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়ালো। এই নির্জন প্রদেশে আমাকে একা ব'সে থাকতে দেখে তারা যে বিস্মিত হয়েছিল, তা তাদের চাহনিতেই বেশ বুঝতে পারা গেল। ধীরে ধীরে সাহস পেয়ে তারা আমাকে দুই একটা ক'রে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'ল্লে। কেন দেশ ছেড়ে এসেছি, দেশে আমার আর কে আছে, আবার কবে দেশে ফিরবো, এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে দেখলুম, আমার প্রতি সহানুভূতিতে তাদের হৃদয় আর্দ্র হ'য়ে গেল। তারা প্রকাশ্যে আমায় কিছু না বল্লেও তাদের মনের ভাব স্পষ্ট বুঝতে পেরে আমার বড় আনন্দ হ'লো। এই দূরদেশে আমার মত প্রবাসীর প্রতি মা, বোনের স্নেহের আভাস ভারি প্রীতিকর!

অলকানন্দা ও গঙ্গার সঙ্গমের একটু উপরে বেশ একটু নির্জন জায়গা আছে। বেড়াতে বেড়াতে সন্ধ্যার একটু আগে সেখানে গিয়ে একটা শিলাখণ্ডে ব'সে পড়লুম। নদীর কলতানের সঙ্গে প্রাণ ভেসে যেতে লাগলো। সন্ধ্যা হ'তে আর বেশী বিলম্ব নেই; কিন্তু আমার সে জায়গা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে হ'লো না। নদীর দিক হ'তে মুখ ফিরিয়ে পিছনে চাইতেই দেখি একটু দূরে দুটি মেয়ে,—বেশ সুন্দর দেখতে! অপরিচিত বেশ, চুলগুলো এলোমেলো হ'য়ে এদিক ওদিক লতিয়ে পড়েছে, হাতে কতকগুলো সুন্দর লতাপাতা ও ফুল। তারা উপর থেকে নেমে আসছিল। আমাকে দেখে তারা একটু থমকে দাঁড়াল, দু'জনে কি বলাবলি ক'ল্লে, তারপর যে দিক থেকে এসেছিল সেই পথে ফিরে যাবার যোগাড় ক'ল্লে। আমি তাদের সঙ্গে কথা কইবার প্রলোভন কিছুতেই সংবরণ ক'রতে পারলুম না! তাদের ডাকতেই ফিরে এল। মেয়ে দুইটির মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত বড়, সে একটু বেশী লাজুক। সে সলজ্জভাবে পাশের একটা বড় পাথরে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। আজন্ম পার্বত্য-প্রকৃতির মধ্যে বর্ধিত হলেও তার লজ্জাশীলতা দেখলুম

www.pathagar.com

আমাদের বঙ্গবালিকাদের মতই প্রবল এবং সেই রকমই মধুর। ছোট মেয়েটি আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। আমি তাদের বাড়ি কোথা, কে আছে, কয় ভাই, কয় বোন প্রভৃতি প্রশ্নে আলাপ আরম্ভ ক'ল্লুম। প্রথমে তাদের কথা কইতে একটু বাধ-বাধ ঠেকলো, কিন্তু শীঘ্রই সে সঙ্কোচভাব দূর হয়ে গেল। অনেকক্ষণ কথাবার্তা হ'ল। সব কথা মনে নেই, কিন্তু একটা কথা আমাকে বড় বেজেছিল, তাই সেটা বেশ মনে আছে। আমি যখন তাকে বল্লুম যে, "আমার বাপ নেই, স্ত্রী নেই, ছেলেও নেই" তখন সে তার করুণ ও আয়ত চক্ষুদুটি আমার মুখের উপর রেখে অতি কোমল স্বরে ব'ল্লে, "লেড়্‌কি ভি নেই?" কথাটা আমার প্রাণে তীরের মত বিদ্ধ হ'ল! আমার একটি "লেড়্‌কি" ছিল, জানিনে কোন অপরাধে তাকে তিন বৎসর হারিয়েছি। আজ এই বালিকার একটি কোমল প্রশ্নের সেই সুপ্ত স্মৃতি জেগে উঠলো। আমার চোখে জল দেখে বালিকার মুখখানি কেমন শুকিয়ে গেল। সে তার অপরিষ্কার ওড়না দিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে, তার কোমল ছোট ছোট আঙ্গুল দিয়ে আমার হাতের আঙ্গুল নাড়তে লাগল। তার সেই স্নেহস্পর্শে, তার অকপট সহানুভূতিতে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলুম। বালিকা আমাকে আর কোন কথা বলতে পারলে না। আমি জানতে পাল্লুম মেয়েটি তার মা-বাপের একমাত্র সন্তান, তাই বুঝি তার মনে হ'য়েছিল মানুষের একটি মেয়েও না থাকা কতটা অসম্ভব!

সন্ধ্যা বেশ ঘন হ'য়ে এল। মেয়ে দুটি আগে আগে পথ দেখিয়ে চলতে লাগলো, আর ঘন ঘন "হুসিয়ারী" "খবরদারি" বলতে লাগলো, পাছে আমার পায়ে ঠক্কর লেগে আমার পায়ে ব্যথা হয়। আমাকে তারা রাস্তায় তুলে দিয়ে বিদায় নিলে। আমার বড় কষ্ট বোধ হ'ল। হায়, আবার কখনো কি জীবনে তাদের সঙ্গে দেখা হবে? যদিই বা হয়, তা হ'লে আর কি তাদের সেই করুণারূপিণী সরলা বালিকা মূর্তিতে দেখবো—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাসার দিকে অগ্রসর হলুম।

বাসায় এসে দেখি, পাণ্ডারা অনেকে সেখানে উপস্থিত। আমার সঙ্গী সন্ন্যাসিদ্বয় আমার জন্যে বিশেষ উৎকণ্ঠিত হ'য়ে পড়েছেন। তাঁরা সন্ন্যাসী, তাঁদের নিজের গতিবিধি বেশ ঠিক আছে ; কিন্তু আমি গৃহস্থ ; মনের চাঞ্চল্য যথেষ্ট আছে ; কখন কোথায় চলে গিয়ে কি বিপদে পড়ি এই ভয়ে তাঁরা সর্বদাই ব্যস্ত। আমি যে সন্ন্যাসীর সঙ্গে এই তীর্থভ্রমণে বের হ'য়েছি, তিনি আমাকে প্রতিপদে হারান, দু'পা আগে গেলে ব্যস্ত হন, দু'পা পাছে পড়লে রাস্তায় ব'সে আমার জন্যে অপেক্ষা করেন। আজ দেখলুম অনেকক্ষণ আমাকে না দেখে তিনি ঠিক ক'রে ব'সে আছেন—আমি হয়ত কোথাও চ'লে গিয়েছি! যাহোক, আমাকে পেয়ে তাঁরা নিশ্চিন্ত হ'লেন। সন্ধ্যার পর আমাদের অনেক কথা হ'লো, পূর্বরাত্রের সেই বাঙ্গালী বাবুর কথাও উঠলো। আমার সঙ্গী সন্ন্যাসী এ গল্প শুনে বড়ই মর্মাহত হ'লেন। বাঙ্গালা, উড়িষ্যা ও আসামের লোকজন ধর্মে ভূষিত হ'য়ে যাতে মনুষ্যত্ব লাভ করতে পারে, এই চেষ্টায় তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত অক্লান্তভাবে যুবকের মত পরিশ্রম ক'রেছেন, আজ সেই বাঙ্গালীর একজন এতদূরে এসে বাঙ্গালীর নামে একটা কলঙ্কের ছাপ রেখে গেছে মনে ক'রে তাঁর চোখে জল এল।

পুণ্যভূমি উত্তরাখণ্ডে পাহাড়ের মধ্যে এসে মনে করেছিলুম, ঝগড়া-বিবাদ, বাদ-বিসংবাদ, ভ্রাতৃবিরোধ ও আত্মীয়বিচ্ছেদ বুঝি বহু পশ্চাতের সমভূমে ফেলে এসেছি ; কিন্তু ক্রমে দেখলুম এখানেও বিবাদ মামলা মোকদ্দমা আমাদের দেশেরই মতন। এখানেও

www.pathagar.com

ভাই ভাইকে প্রবঞ্চিত ক'রতে ছাড়ে না, জ্ঞাতি জ্ঞাতির বুকে ছুরি মারবার জন্যে প্রস্তুত। আমার পাণ্ডার সঙ্গে তার ছোট ভাইয়ের এক মোকদ্দমা উপস্থিত। তাদের পিতা মৃত্যুকালে দুই ভাইয়ের দু'রকম প্রকৃতির পরিচয় পেয়ে, তাঁর যা কিছু ছিল, সমস্ত ভাগ করে দিয়ে যান, এমন কি খাতা পর্যন্ত ভাগ করে দেন।

'খাতা' কথাটা একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার। প্রত্যেক পাণ্ডার কাছে একখানা খাতা থাকে। যিনি তীর্থভ্রমণে গিয়ে যে পাণ্ডার যজমান হন, তিনি সেই পাণ্ডার খাতায় নিজের নাম, গ্রামের নাম, ভাই, বোন, বাপ, মা—এমন কি ছেলেপিলের নাম পর্যন্ত লিখে দিয়ে আসেন। পাণ্ডারা পুরুষানুক্রমে সেই নামগুলি মুখস্থ ক'রে রাখে এবং অনেক বৎসর পরে কোন ভদ্রলোক তীর্থভ্রমণে গেলে বাপ পিতামহের পরিচয় নিয়ে তারা সেই খাতা দেখিয়ে নিজেদের স্বত্ব সাব্যস্ত করে। খাতা দেখাতে না পাল্লে কিন্তু দাবী নামঞ্জুর।

আমার পাণ্ডার পিতা সেই খাতাখানা পর্যন্ত দু'ভাগ ক'রে ছেলেদের দিয়ে যান, সুতরাং ভাইয়েদের মধ্যে বিবাদের কোন কারণ ছিল না; কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ বাড়ির পিছনে আধহাত চওড়া ও পনের ষোল হাত লম্বা উঁচু-নীচু যে জমিটুকু ছিল, সেটুকুর কথা অন্যান্য বিষয় ভাগের সময় পিতার মনে আসে নি। সেই জমিটুকু নিয়েই দুই ভাইয়ের এখন বিবাদ! সে জায়গাটুকু যে আপাততঃ সাপ, ব্যাং, ইঁদুর, বিড়াল ও আবর্জনা ছাড়া আর কারো কাজে আসতে পারে, এমন সম্ভাবনা আমার একবারও মনে হয় নি; কিন্তু তাদের অভিপ্রায় অন্য রকম। দু'জনেই বলে যে, চিরদিন কিছু এমন অবস্থা থাকবে না, কিছুকাল পরে যদি এই কোঠা ভেঙে নূতন কোঠা তৈয়ের ক'রতে হয়; তবে ঐ জায়গাটায় খুব কাজ দেবে। এ দিকে দুই ভাই মিলে যে মোকদ্দমা জুড়েছে, তাতে যা কিছু আছে তাও যে যাবে—সে বিষয়ে তাদের বিন্দুমাত্রও দৃকপাত নাই। আমরা ছোট ভাইটিকে সেখানে ডাকালুম, দুজনকেই অনেক বোঝানো গেল, কিন্তু কেউ বুঝতে চাইলে না। আমাদের দেশের শিক্ষিত ভাইয়েরাই বোঝে না, আর এরা ত অশিক্ষিত পাহাড়ী। দুই ভাইয়ের পক্ষেই অনেক হিতাকাঙ্ক্ষী জুটেছেন। বড়র পক্ষীয়েরা সাক্ষী দেবেন, বাপ মৃত্যুকালে এ জমিটুকু বড় ভাইকেই দিয়ে গেছেন, কারণ বড় ভাইয়ের পোষ্য অনেক; ছোটোর পক্ষ হোতে প্রমাণ হবে এটা মিথ্যে কথা। আমি ভাবলুম এরা ধার্মিক, হয়ত ধর্মকথায় এদের মন নরম হবে; সুতরাং "যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী" ও "নলিনীদলগত জলবৎ তরলং" প্রভৃতি বড় বড় বাঁধি শ্লোক আউড়ে তাদের মন নরম করবার চেষ্টা কল্লুম; কিন্তু চোরা না মানে ধর্মের কাহিনী। এ বৈষয়িক ব্যাপারে আধ্যাত্মিকতা কিছুতেই খাটলো না। শেষে উভয়ে আমাকে অনুরোধ কল্লে যে, টিহরী রাজদরবারে বিচার হবে; যদি কাউন্সিলের কোন মেম্বরের সঙ্গে আমার পরিচয় থাকে ত তাঁর কাছে একখানা অনুরোধপত্র দিতে হবে, যেন পুনঃ পুনঃ দিন ফিরিয়ে তাদের হয়রাণ করা না হয়, এবং বিচারটা যেন ন্যায়সঙ্গত হয়। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে টিহরীর রাজদরবারের দুই একজন মেম্বরের সঙ্গে অল্প পরিচয় ছিল। আমি একটা অনুরোধপত্র লিখে দিলুম যে, যেন এ সম্বন্ধে একটু বিশেষ অনুসন্ধান হয়।

১৩ই মে, বুধবার।—আজ খুব ভোরে পাঁচটার আগে উঠে দেবপ্রয়াগ ছেড়ে চল্লুম। এখন হ'তে আমরা বরাবর অলকানন্দার ধার দিয়ে চলতে লাগলুম। ন'মাইল চ'লে 'রাণীবাড়ি' চটিতে এসে পৌঁছানো গেল। এ জায়গাটা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার নেই।

www.pathagar.com

আমরা বৈকালে রওনা হওয়ার যোগাড় কল্লুম, কিন্তু দেখতে দেখতে চারিদিকে ঘোর ক'রে বেশ মেঘ হয়ে এলো। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে যে কষ্ট পাওয়া গিয়েছিল তা বেশ মনে আছে, সেই জন্য আর মেঘ মাথায় ক'রে বের হওয়া কারও ভাল বলে মনে হলো না। এখানে রাত্রিটাও কাটানো গেল। রাত্রিতে বৃষ্টি দেখে মনে হলো, না বেরিয়ে ভালই করেছি।

১৪ই মে, বৃহস্পতিবার।—প্রাতে যাত্রা। সাত মাইল চ'লে এসে একটা ঝরণার ধারে উপস্থিত হ'লুম। ঝরণার উপরে একটা প্রকাণ্ড শিবমন্দির। শিবের নাম "বিল্বকেশ্বর"। আমার সঙ্গী সন্ন্যাসিদ্বয় মন্দিরের মধ্যে শিব দেখে এলেন। সেখানে কিন্তু আমার "প্রবেশ নিষেধ", কারণ সন্ন্যাসীদের পয়সা দিয়ে শিবদর্শন ক'রতে হয় না, কিন্তু গৃহীর পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। ঠিক সে সময় আমার হাতে পয়সা ছিল না, সেও এক কারণ বটে! আর এক বিশেষ কারণ এই যে, এই রকম পয়সা দিয়ে ক্রমাগত ঠাকুর দেখার প্রবৃত্তি আমার বলবতী ছিল না। এই দুই কারণে আমার শিবদর্শন ঘটলো না। ঝরণার জলপানে তৃপ্ত হ'য়ে আমি এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। খানিক পরে স্বামীজি শিব দেখে ফিরে এলেন। তাঁর মুখে শুনলুম, সেই মন্দিরের মধ্যে পাথরের উপর খুব বড় পায়ের চিহ্ন আছে ; পাণ্ডারা তা অর্জুনের পদচিহ্ন ব'লে ব্যাখ্যা ক'রে থাকে। শুনলুম, সেই অসাধারণ পদচিহ্নের মধ্যে আমাদের মত ক্ষুদ্র প্রাণীর তিনখানি পা বেশ পাশাপাশি শুয়ে থাকতে পারে। অর্জুন অতবড় বীর, তাঁর পা আমাদের পায়ের মত হ'লে আর তাঁর পদগৌরব থাকে কোথায়? সুতরাং তাঁর পায়ের চিহ্ন খুব জাঁকাল হওয়াই যুক্তিসঙ্গত! এ সব বিষয়ে আমাদের পুরাণকারদিগের খুব বাহাদুরী আছে ; হনুমান বেচারাকে খুব প্রকাণ্ড ক'রে আঁকতে হবে, অতএব সূর্যকে তার কুক্ষিগত করানো হ'লো। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সূর্যের আকার বিস্তৃততর হয়েছে, সুতরাং হনুমানজীর মহিমার তাতে বৃদ্ধি বই হ্রাস হয়নি। এই রকম কুম্ভকর্ণের নাসারন্ধ্র খুব বড় দেখানো দরকার—অতএব তার এক এক নিশ্বাসে বিশ-পঁচিশটে রাক্ষস বানর উদরে প্রবেশ ক'রছে, আর বের হ'চ্ছে! কিন্তু তারপর যখন যুক্তি ও তর্কের কাল আসে, তখন এই সমস্ত গাঁজাখুরী গল্পের এক একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রস্তুতের অত্যন্ত দরকার হয়ে পড়ে। তাতে দিনকতক চারিদিকে খুব বাহবা প'ড়ে যায় বটে, কিন্তু শেষ ফল এই হয় যে, এই সমস্ত গল্পের সেই প্রাচীন স্নিগ্ধ ভাবগুলিও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় এবং তা হ'তে একটা নূতন সত্য আবিষ্কারের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে পড়ে। এই সমস্ত কথা চিন্তা করতে করতে আরও দু'মাইল চ'লে এসে গাড়োয়ালের রাজধানী শ্রীনগরে প্রবেশ করা গেল।

www.pathagar.com

শ্রীনগর

১৪ই মে, বৃহস্পতিবার।—বেলা প্রায় এগারোটার সময় গাড়োয়ালের প্রধান নগর শ্রীনগরে উপস্থিত হওয়া গেল। ভারতবর্ষের উত্তরে দুই শ্রীনগর আছে ; এক হচ্ছে ভূস্বর্গ, কবিতা ও কল্পনার চিরলীলানিকেতন, সমগ্র হিমালয় প্রদেশের রম্য কুঞ্জকানন কাশ্মীর-রাজধানী; আর অন্যটি এই গাড়োয়ালের প্রধান নগর। কাশ্মীর-রাজধানীর তুলনায় এ শ্রীনগর অবশ্য অনেকটা শ্রীহীন, কারণ এখানে প্রকৃতির সৌন্দর্যই আছে, কিন্তু সে সৌন্দর্য বেশী করে ফুটিয়ে তোলার জন্যে কোন আয়োজন এখানে হয় নি, কিংবা মানবের রুচি এই সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্যে কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করেনি। কিন্তু তবু এ সৌন্দর্যের মধ্যে একটা মহান গম্ভীর ভাব আছে, তা শুধু প্রাণ দিয়েই অনুভব করা যায়। চারিদিকে হিমালয়ের অসমান শৃঙ্গ আকাশ স্পর্শ করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, মধ্যে অলকানন্দায় নির্মল জলপ্রবাহে উপলখণ্ড ধুয়ে চলে যাচ্ছে ; দুই একটা জায়গায় বড় বড় প্রস্তরস্তূপ প'ড়ে তাদের গতি ব্যাহত করবার চেষ্টা ক'রছে। সেখানে তাদের বেগ বড়ই ভয়ানক। নির্মল তরল প্রবাহ বটে, কিন্তু তাদের গতি কে রোধ করতে পারে? নদীর পাড়ে এবং অসমতল পর্বত-উপত্যকায় নানা রকমের গাছ। ফুলের গাছ যে কত, তার সংখ্যা নাই। কোথাও রাশি রাশি ইট ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে রয়েছে, একরাশ সতেজ লতা তাদের জড়িয়ে ধরে—বেশীর ভাগ জায়গা সবুজ পাতায় ঢেকে আশপাশের দু'-পাঁচটা গাছকে তাদের "ললিত লতার বাঁধনে" বাঁধার চেষ্টা ক'চ্ছে। তার অল্প দূরেই শ্রীনগর, পূর্বগৌরবের লুপ্ত চিহ্ন পুরানো রাজবাড়ির ভগ্নাবশেষ, আর স্থানে স্থানে নানা শিল্পকার্যবিশিষ্ট প্রাচীন দেবালয়।

শ্রীনগরের দৃশ্য-শোভার মধ্যে মোটেই বিলাসের ভাব নেই। এখানে আমি এমন একটা জায়গা দেখেছি ব'লে মনে হয় না, যেখানে নদীতীরে, জ্যোৎস্না-পুলকিত, কুসুমসুরভিপ্লাবিত রাত্রে নৈশবায়ুহিল্লোলিত লতাকুঞ্জে নায়ক নায়িকা পরস্পরের হৃদয়াবেগ ঢেলে দিয়ে তৃপ্তি অনুভব করতে পারেন। সমস্ত স্থানটা যেন যোগীঋষির তপ-জপের পক্ষেই একান্ত উপযোগী। হৃদয়ে শান্তি আনে, বিলাসিতার চাঞ্চল্য জাগায় না।

আমরা শ্রীনগরে প্রবেশ ক'রে একটা ছোট পরিচ্ছন্ন দোতলা ঘরে বাসা নিলুম। হরিদ্বার ছেড়ে অবধি যত জায়গা দেখেছি, তার মধ্যে শ্রীনগরকেই সহর বলা যায়। পর্বতের মধ্যে এতদূর বিস্তৃত সমতলভূমি আর কোথাও দেখি নি। অন্য যে সমস্ত নগর দেখেছি, কোনটা পর্বতের গায়ে, কোনটা বা তিন চারি বিঘা সমতলভূমির উপর কিন্তু শ্রীনগর ষোল বিঘে কি তার চেয়ে বেশী সমতল জায়গা দখল ক'রে আছে। বাজারের সমস্ত দোকানই প্রায় কোঠাঘর। দোকান বিস্তর, আর সে সকল দোকানে নানা রকম জিনিস পাওয়া যায়। এমন কি নিকটে আর কোন জায়গায় যে সকল জিনিস দেখা যায় না, এখানে তাও পাওয়া যায়। আর এই জন্যই সমস্ত গাড়োয়ালের লোক এখান থেকে দরকারী জিনিস কিনে নিয়ে যায়। তবে এদেশের লোকের দরকারী জিনিসের সংখ্যা নিতান্ত কম—লবণ, লঙ্কা, আটা ও কাপড় হ'লেই সকলের বেশ চলে যায়। এগুলি ছাড়া আর সমস্ত জিনিসই বিলাসের উপকরণ ব'লে সাধারণের বিশ্বাস। বাজারে যে পঞ্চাশ ষাটখানা দোকান আছে, তার প্রায় সকলগুলিই হিন্দুর—দুই একখানা মাত্র মুসলমানের দোকান।

www.pathagar.com

শ্রীনগরে এই দুই একঘর মুসলমান দোকানদার ছাড়া সমস্ত গাড়োয়ালে আর মুসলমান অধিবাসী নেই।

শ্রীনগরে পৌঁছে বাসাভাড়া করার পর সেখানে পরিচিত যে দুই এক জন লোক ছিলেন, তাঁদের কাছে আমাদের শুভাগমন সংবাদ পাঠানো গেল। তাঁরা অবিলম্বে আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত হ'লেন এবং আমাদিগকে তাঁদের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে যথোচিত পীড়াপীড়ি আরম্ভ কল্লেন : কিন্তু আমি তাঁদের বল্লুম, এখানে আমারা এক রাত্রি মাত্র থাকবো, বাসাতেই আহারাদির আয়োজন করেছি, অতএব এখন আর কোথাও নড়াচড়া না ক'রে বদরিনারায়ণ হ'তে ফেরবার সময় তাঁদের বাড়িতে যাব ; এই কথায় বন্ধুবর্গকে তখন বুঝিয়ে স্থির করা গেল। আহার ও বিশ্রামের পর বিকেলে সহর দেখতে বের হলুম। শ্রীনগরের দর্শনযোগ্য স্থানের বিবরণের আগে, উপক্রমণিকায় তার একটু ইতিহাস দেওয়া দরকার, কারণ ইতিহাসের সঙ্গে তার একটু সম্বন্ধ আছে।

অনেকদিন আগে একবার নেপালের রাজা গাড়োয়ালরাজ্য আক্রমণ করেন। গাড়োয়ালের রাজা যুদ্ধে পরাস্ত হন এবং পর্বতে পলায়ন করেন। এই সময় হ'তে গাড়োয়াল নেপালেরই অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু এই সময়ে এখানে কি রকম শাসনপ্রণালী অবলম্বন করা হ'য়েছিল, তার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে রাজপ্রাসাদে ও দুর্গে নেপালীদের অত্যাচারের চিহ্ন আজও বেশ দেখা যায়। যা'হোক, গাড়োয়ালরাজ উপায়ন্তর না দেখে ইংরেজের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন কল্লেন এবং তাঁদের সাহায্যে গাড়োয়াল স্বাধীন হ'লো। কিন্তু এই স্বাধীনতা প্রায় অর্ধেক গাড়োয়ালের পরিবর্তে ক্রীত হ'য়েছিল। কারণ যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ গাড়োয়ালের অনেকখানি অংশ ইংরাজরাজ গ্রহণ করেন ;—এই অংশের নামই বৃটিশ গাড়োয়াল আর অবশিষ্ট অংশের নাম স্বাধীন গাড়োয়াল ; তবে নেপাল ভূটানের মত স্বাধীন নয়। যাঁরা অনুগ্রহ ক'রে পরের হাত থেকে রাজ্যজয় ক'রে দিলেন —আবশ্যক হলে যে তাঁরা তা কেড়ে নিতেও পারেন, এ কথা বলাই বাহুল্য। তবে এ রকম অবস্থায় যতখানি স্বাধীনতা থাকার সম্ভাবনা, গাড়োয়ালের তা যথেষ্ট আছে। আর স্বাধীন গাড়োয়ালের আর একটু ভরসা এই যে, তাতে প্রলোভনের এমন কিছুই নেই, যে জন্যে এদেশে দেশীয় পাগড়ীর পরিবর্তে রাতারাতিই ইংরেজের টুপী ও ছড়ির আমদানী হ'তে পারে ; বরং প্রলোভনের যেটুকু ছিল, সেটুকুর আপদ অনেক আগেই চুকে গেছে। নেপালের কবল থেকে গাড়োয়াল উদ্ধার ক'রে ইংরেজ গাড়োয়ালের উৎকৃষ্ট অংশটুকুই অধিকার ক'রেছেন।

অলকানন্দার পূর্ব পার ইংরেজের অধিকার, পশ্চিম পার গাড়োয়াল রাজ্য বা টিহরীর রাজার সীমানা। দেবপ্রয়াগে অলকানন্দা গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে ; সুতরাং গঙ্গার পূর্ব পার ইংরেজের, পশ্চিম অংশ টিহরীর রাজার। হরিদ্বার ও হৃষীকেশ যদিও গঙ্গার পশ্চিম পার, কিন্তু তা ইংরেজের অধিকারে ; ওদিকে মসুরী ও ল্যান্ডর সহরও ইংরেজের। ল্যান্ডরের পূর্বপ্রান্তের একটা রাস্তা হ'তেই টিহরীর সীমানা আরম্ভ। মসুরী ও ল্যান্ডর আগে টিহরীর রাজাইই ছিল, পরে গবর্ণমেন্ট তা কিনে নিয়েছেন। টিহরীর রাজা মাটির দরে পর্বতের যে জঙ্গলময় অংশ বেচেছিলেন, কে জানতো যে কয়েক বছর পরে সেখানে মহাসমৃদ্ধ দু'টি নগর স্থাপিত হবে এবং তা ভারতের শ্রেষ্ঠবিলাসীদের জন্যে গ্রীষ্মকালের বিরামকুঞ্জে পরিণত হবে?

www.pathagar.com

নেপালরাজ গাড়োয়াল আক্রমণ করবার পর—গাড়োয়ালরাজ রাজ্য ত্যাগ ক'রে পলায়ন কল্লেন। নেপালীরা অরক্ষিত প্রাসাদ ও সুরম্য রাজপুরী সম্পূর্ণরূপে শ্রীভ্রষ্ট করে ফেলেছিল। পরে ইংরেজের সহায়তায় যখন গাড়োয়াল পুনর্জীবিত হ'লো, তখন গাড়োয়ালের রাজা আর শ্রীনগর ফিরে এলেন না ; তিনি শ্রীনগর হ'তে বত্রিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অলকানন্দার অপর পারে টিহরীতে পলায়ন ক'রেছিলেন ; সেই জায়গাটা সুন্দর ও সুরক্ষিত দেখে সেইখানেই তিনি বাস করতে লাগলেন। শ্রীনগর ইংরেজরাজ্যের অধিকারভুক্ত হ'য়ে বৃটিশ গাড়োয়ালের প্রধান নগররূপে পরিণত হ'লো। তা হ'লো বটে, কিন্তু ইংরেজের কাছারী সেখানে রৈল না ; শ্রীনগর হ'তে ৬ মাইল দূরে পাহাড়ের উপরে "পাউড়ি"তে কমিশনার সাহেবের পীঠস্থান হ'লো, একটা রেজিমেন্টর আড্ডা পড়লো, এবং আফিস আদালত সমস্ত সেখানে স্থাপিত হ'লো ; কেবল ডাক্তারখানা শ্রীনগরে। "পাউড়ি"র কাছারীবাড়ি ও সাহেবদের বাড়ি তৈয়ারীর জন্যে গাড়োয়ালরাজ্যের বহুমূল্য সুন্দর প্রাসাদের অনেক ভগ্নাবশেষ সেখানে চালান হ'য়েছে। "পাউড়ি"তে একবার যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সময় ও সুযোগের অভাবে যাওয়া হয় নি।

আমার বন্ধু পণ্ডিত হরিকিষণ অপরাহ্ণে আমাদের সঙ্গে নিয়ে প্রথমেই ডাক্তারখানায় গেলেন। ডাক্তারখানায় অনেকগুলি রোগী দেখা গেল। ডাক্তারবাবু বাঙ্গালী কায়স্থ, বাড়ি কলিকাতার বাগবাজারে। তিনি এখানে সপরিবারে বাস কচ্ছেন। এই পর্বতের মধ্যে একঘর বাঙ্গালী ভদ্রলোক গৃহস্থ দেখে ভারি আনন্দ হ'ল। তাঁর সুন্দর প্রফুল্ল ছেলেমেয়েগুলি দেখে বোধ হ'লো আমরা আবার যেন বাঙ্গালাদেশে ফিরে এসেছি। ডাক্তারবাবু আমাদের যথেষ্ট যত্ন ক'ল্লেন, এবং তাঁর বাসাতেই থাকবার জন্য বিশেষ অনুরোধ ক'ল্লেন। তাঁর যত্ন ও আগ্রহে আমরা খুব সন্তুষ্ট হ'য়ে ডাক্তারখানা পরিদর্শন করতে বের হলুম। গবর্ণমেন্টের সাধারণ ডাক্তারখানায় রোগী সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে রকম বন্দোবস্ত হয়ে থাকে, এখানেও সে চিরাগত নিয়মের কোন ব্যতিক্রম দেখা গেল না, সুতরাং সেখানে আর বেশী সময় না কাটিয়ে পুরাতন রাজবাড়ির ভগ্নাবশেষ দেখতে গেলুম। গিয়ে দেখি সে এক লঙ্কাদগ্ধের ব্যাপার! রাশি রাশি ইঁট আর পাথর স্তূপাকারে প'ড়ে আছে, আর যদি দুই এক বছর পরে কোন পর্যটক এখানে আসে ত এই স্তূপীকৃত ইঁট পাথরকে সুশ্যামল শৈবাল সজ্জিত দেখে একটা ছোটখাট গিরিশৃঙ্গ ব'লে মনে করবে। সেই নীরস, অনাবৃত পাহাড়ের বুকে ভগ্ন-প্রাসাদের বড় বড় দেওয়ালগুলো হাঁ কোরে রয়েছে ; তার খানিকটা তফাতে একটা পাথরের প্রকাণ্ড সিংহদ্বার—বহুকাল হোতে এমনি অসহায় অবস্থায় ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কাৎ হয়ে পড়েছে এবং এই অবস্থাতেই আরো কয়েক বছর ঝড়বৃষ্টির প্রকোপ সহ্য করার দুঃসাহস প্রকাশ কোচ্ছে। এক ধারে একটা ভাঙা মন্দির ; বহুদিন আগে তার দরজাজোড়া একদল ধর্মধ্বজী নেপালী এসে তুলে নিয়ে গিয়েছে ; বোধ করি তা দিয়ে পশুপতিনাথের কোন মন্দিরের সিঁড়ি তৈয়েরী হয়েছে। আমরা সেই পুরানো রাজবাড়ি ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগলুম। অনেক দূরে একটা বড় মন্দির ; পাথরে নানা রকম দেবদেবীর মূর্তি ; সকলই হিন্দুদেবমূর্তি কি না ঠিক বুঝতে পাল্লুম না,—বুঝবার জন্য তেমন চেষ্টাও করি নি। একটা জায়গায় দেখলুম শ্রীযুত গজানন মহাশয়—তিনি দেবতাকুলে সব চেয়ে নিরীহ—হস্তচতুষ্টয়ে গদা ও তীরধনুক নিয়ে মহাতেজে অগ্রসর হচ্ছেন।—নিরীহ কেরানী দেবতাটির এই যুদ্ধসাজ বড়ই অমানান

www.pathagar.com

দেখাচ্ছিল। মহাভারতের ত কোথাও গণেশের একটা বীর-পরাক্রম প্রকাশের কারণ উল্লেখ দেখা যায় না, তবে যদি অন্য কোন পুরানে এ সম্বন্ধে কিছু থাকে, তা হোলে একটা কথা বটে। কতকগুলি দেবতার চেহারা চক্ষে একটু নূতন ঠেকলো ; তেত্রিশকোটির মধ্যে হ'তে তাঁদের চিনে নেওয়া আমার মত লোকের পক্ষে বিলক্ষণ কঠিন ব্যাপার! তবে একটা কথা মনে হোলো যে, যদি সেগুলি হিন্দু দেবমূর্তি না হয়, তবে নিশ্চয়ই বৌদ্ধ দেবমূর্তি হবে, কারণ নেপালীরা যখন সেখানে ছিল, তখন তারা যে দুই এক জায়গায় নিজেদের ভাস্কর-বিদ্যা প্রকাশ করেনি, এ কখনো সম্ভব নয়। একটা চক এখনো বর্তমান আছে, শুনলুম তার ভিতরে সাপ বাঘ ও ভল্লুকের চিরস্থায়ী আড্ডা হ'য়েছে। দেখলুম তার ফুকোরের মধ্যে রাজ্যের পাখী বাসা ক'রেছে ; তার ভিতরে দুই একটা ফাটল দিয়ে বড় বড় অশ্বত্থ গাছ মাথা তুলেছে। এই সমস্থ দেখে-শুনে চকের মধ্যে আর প্রবেশ ক'রতে সাহস হ'লো না।

চকের সম্মুখেই নহবতখানা। এটা এখনো ঠিক আছে, কোন দিক আজও ভেঙে পড়ে নি! আমাদের সঙ্গী একটা ছোকরা ভিতরে গিয়ে কোন দিক দিয়ে একেবারে নহবতের চূড়ায় উঠে বসলো। শুনা গেল উপরে উঠবার রাস্তা সহজে চিনে নেবার যো নেই ; যারা সে রাস্তা বেশ চেনে, তারাই সহজে উপরে উঠতে পারে। আবার তার ভিতরে হারানোও নাকি খুব সহজ ; কিন্তু তাতেও আমরা উপরে উঠবার ঝোঁক ছাড়ি নি। শেষে যখন শুনলুম, তার ভিতর বহুজাতীয় সর্পবংশের নির্বিবাদ বংশবৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধিসাধন হচ্ছে, তখন আমাদের প্রবল ঝোঁক অবিলম্বে ছেড়ে গেল। বেলা যায় ; সূর্যের উজ্জ্বল কিরণ এসে প্রাসাদের ছাদহীন উন্মুক্ত প্রাচীরের গায়ে হেলে পড়েছে, চোখে বড় খটকা লাগলো। এই অতীত কীর্তির ভগ্নাবশেষ ও মনুষ্য-গৌরবের অসারতার চিহ্নের উপর অমানিশার গাঢ় অন্ধকার যবনিকাই সম্পূর্ণ উপযোগী।

এখান হ'তে আমরা কেদারনাথ মহাদেব দেখতে গেলুম। কাশীর বিশ্বেশ্বরের আকার ও কেদারনাথের আকার অনেকটা এক রকম ; একটি অনুকরণে যেন আর একটি তৈয়ের হয়েছে, কিন্তু কোন্‌টি "ওরিজিনাল", তা স্থির করা বড় কঠিন। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের মাথায় কলসী বা ঘটি ক'রে জল ঢালতে হয়, কিন্তু এখানে কেদারনাথের মাথায় হিমালয় একটি ঝরণা উৎসর্গ ক'রে দিয়েছেন ; তা হ'তে অবিরাম অবিশ্রাম জল প'ড়ে কেদারনাথের মাথা ঠাণ্ডা হচ্ছে। কেদারনাথের মন্দির অলকানন্দার ঠিক উপরে ; মন্দিরের কোন রকম জাঁকজমক নেই। কাছেই একঘর সেবাইতের বাড়ি। তাঁর অবস্থা দেখেই দেবতার আর্থিক অবস্থা বেশ অনুমান ক'রে নিলুম। উভয়েই দেখলুম কোন উপায়ে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে আত্মরক্ষা ক'রে আপনাদের সম্মান ঘোষিত ক'চ্ছেন। এখান হ'তে ফিরে বাজারে এলুম। দেখলুম ভিন্ন ভিন্ন দোকানে নানারকম জিনিস খরিদবিক্রী হচ্ছে। আমার মনে পড়ে, অনেক দাম দিয়ে আমরা এখানে তিনটে গোল বেগুন কিনেছিলুম। বাজারে একবার পানের অনুসন্ধান করা গেল, কিন্তু তা পাওয়া গেল না ; শীতকালে মধ্যে মধ্যে এখানে পানের আমদানী হয়, কিন্তু বছরের অন্য কোন সময়ে তা পাওয়া কঠিন।

আমরা সন্ন্যাসী বটে কিন্তু তাই ব'লে ভাল জিনিসের প্রলোভন ত্যাগ করার সংযম কিছুই শিখি নি ; কাজেই আমাদের খানিকটা সময় জিনিসপত্রের দরদাম ক'রতেই কেটে গেলো। বৈরাগ্য-ধর্ম অবলম্বন ক'রে সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়েছি, তখনো দর কচ্চি, "না

www.pathagar.com

বাপু, তিন পয়সা হবে না, দুপয়সা পাবে, দাও"—এবং দুপয়সায় যখন তা পাওয়া গেল, তখন যেই একজন বল্লে, "ওটার এক পয়সা দাম হওয়াই উচিত ছিল"—অমনি এক পয়সা ঠকিচি মনে ক'রে আমাদের দীর্ঘকালের এত আদরের সন্ন্যাস এক পয়সার চিন্তাকে জড়িয়ে তার পুনরুদ্ধারের পথ খুঁজতে ব্যগ্র হ'য়ে উঠলো। শুধু আমরা নই, এ রকম সন্ন্যাসী বিস্তর।

এখানকার বাজারের রাস্তাগুলি সমস্তই বাঁধানো। সকল রাস্তাই পরিসরে তেমন বড় নয়, তবে একটা খুব চওড়া আছে। বাজারের মধ্যে দিয়ে যেতে স্কুল দেখলুম। স্কুলটিতে মাইনর পর্যন্ত পড়ানো হয়। এটা খৃষ্টান মিসনারীদের স্কুল ; স্কুলের লাগাও হেডমাস্টারের বাসা। হেডমাস্টারের বাড়ি এই দেশেই ; আগে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, এখন খৃষ্টান হ'য়েছেন। "ইয়ং বেঙ্গল"দের যে সকল গুণ সর্বদা দেখা যায়, এ লোকটিতে তার কিছুরই অভাব দেখলুম না। বেশ মিষ্টভাষী, সদালাপী। তিনি খৃষ্টান বটে, কিন্তু খৃষ্টধর্মে তাঁর যে কিছু আস্থা আছে, তা বোধ হ'লো না ; ধর্ম একটা থাকলেই হ'লো, এই রকম তাঁর মনের ভাব। তবু যে কেন তিনি খৃষ্টান হ'য়েছেন, তা আমি বুঝতে পাল্লুম না। যদি পূর্বধর্ম বদলিয়ে নূতন কোন ধর্ম অবলম্বন ক'রতে হয় ত আমাদের এই নবাবলম্বিত ধর্মের উপর প্রবল আগ্রহ থাকা উচিত, যার বলে আমরা পাপ ও অন্যায়ের খানিকটে উপরে উঠতে পারি। তা না ক'রে যদি "যথাপূর্ব তথাপর" রকমেই কাল কাটাই, তবে ধর্মমত বদলানোও যা, না বদলানোও তাই। অনেক কথাবার্তার পর মাস্টারজির নিকট হ'তে বিদায় নিয়ে আমরা সকলে ফিরে এলুম!

তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। আমার সঙ্গী সন্ন্যাসীদ্বয় আর "পাদমেকং ন গচ্ছামি" ব'লে ব'সে পড়লেন। চারিদিকে এত সুন্দর দৃশ্য, আর চাঁদের উজ্জ্বল শুভ্র আলোকে তা এমন মধুর দেখাচ্ছিল যে, এমন চুপ ক'রে ঘরে প'ড়ে থাকা আমার কিন্তু কিছুতেই পুষিয়ে উঠলো না। পণ্ডিত হরিকিষণের সঙ্গে আবার বের হ'য়ে পড়লুম। পণ্ডিতজীর সঙ্গে আমার এই নূতন পরিচয় নয়,—কিছুদিন আগে তাঁর সঙ্গে প্রায় এক বৎসর কাটিয়েছি। তাঁর পুরো নাম শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিকৃষ্ণ দুর্গাদত্ত রুরোলা। তাঁর পাণ্ডিত্য অসাধারণ ; কিন্তু পাণ্ডিত্য অপেক্ষা তাঁর কবিত্বশক্তি অনেক বেশী ছিল। তিনি তাঁর প্রণীত একখানা কবিতাপুস্তক মোক্ষমূলরকে উপহার পাঠিয়েছিলেন। মোক্ষমূলর প্রত্যুত্তরে লিখেছিলেন, "আমি যদি মৃত্যুর পূর্বে এই প্রকার কবিতার একটি লাইনও লিখিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে জন্ম সফল মনে করিব।"—অবশ্য এতে অধ্যাপকবরের যথেষ্ট বিনয় প্রকাশ হয়েছে ; কিন্তু যাঁর কবিতা প'ড়ে তিনি এ রকম একটা মন্তব্য প্রকাশ ক'রেছিলেন, তাঁর প্রতিভাও প্রশংসনীয়। আজ নির্জন পথে এই জ্যোৎস্নারাত্রে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক দিনের অনেক পুরানো কথা উঠলো।

পশ্চিমদেশে দুই সম্প্রদায় আছে,—এক দল হিন্দু, আর এক দল আর্য। হিন্দুর দল আমাদের দেশের মত ; তাঁদেরও 'হরিসভা' আছে, তবে সে সভার নাম 'ধর্মসভা' ; ধর্মসভা "হিন্দুধর্মসভা", কিন্তু আমাদের দেশের হরিসভার অপেক্ষা এই ধর্মসভার আলোচনার প্রসার একটু বিস্তৃততর। আমাদের দেশের হরিসভায় হরিনাম কীর্তন, পুরাণাদি পাঠ ইত্যাদিই হ'য়ে থাকে ; বড় জোর বাৎসরিক উৎসবের সময় কোন কোন সনাতন-ধর্মপ্রচারক বক্তৃতা উপলক্ষে সেই পবিত্র সভায় দাঁড়িয়ে অন্য ধর্মের বাপান্ত করেন।

www.pathagar.com

কিন্তু পশ্চিমের ধর্মসভায় এ সমস্ত ছাড়াও অনেক বিষয়ের আলোচনা হয়। "ধমসভার" প্রতিদ্বন্দ্বী সভার নাম 'আর্যসমাজ"—এই সমাজ দয়ানন্দস্বামীর প্রতিষ্ঠিত। আর্যসমাজিগণ শুদ্ধ বেদের অনুমোদন ক'রে চলেন ; এবং বেদ অভ্রান্ত ব'লে মনে করেন। তাঁদের মধ্যে জাতিভেদ নেই, পৌত্তলিক ক্রিয়াকর্মও তাঁরা মানেন না। ইংরেজী লেখাপড়া জানা এবং উদার মতাবলম্বী প্রায় অধিকাংশ লোক আর্য। আর্যদের সঙ্গেই আমাদের কিছু বেশী মেশামেশি ছিল ; তবে পণ্ডিত হরিকিষণ ধর্মসভার সম্পাদক ও একজন দিগ্বিজয়ী বক্তা হ'লেও তাঁর সঙ্গেও আমার বেশ বন্ধুতা হ'য়েছিল। যখন দেরাদুনে ছিলুম, তখন এই দুই দলের তর্ক-বিতর্ক ও বক্তৃতার জ্বালায় তিষ্ঠানো ভার হ'ত। সে সমস্ত বক্তৃতায় শাস্ত্র-কথা থাক না থাক, প্রতিপক্ষের উপর তীব্র বাক্যবাণ বর্ষণ ক'রতে উভয়দলই সমান মজবুদ। একবার আমি আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ এই রকম একটা সভায় গিয়ে পড়েছিলুম। সেদিন আমাদের পণ্ডিতজী বক্তৃতা ক'রবেন—অপর পক্ষে আর্য-সমাজের একজন প্রচারক বলবেন। সভায় উপস্থিত হ'য়ে দেখি, কুরুপাণ্ডবের মত দুদল দুদিকে সার দিয়ে বসে গিয়েছেন ; আমরা কোন দিকে বসি প্রথমে ত এই ভাবনাতেই অস্থির—শেষে কিছু ঠিক ক'রতে না পেরে বক্তার টেবিলের সুমুখে ব'সে পড়লুম। বক্তৃতা হিন্দীতে নয়, বিশুদ্ধ সংস্কৃতে ; বেদ বা ধর্মশাস্ত্র নিয়ে যাঁরা তর্ক করবার স্পর্ধা রাখেন, সংস্কৃতে তাঁদের বেশী দখল থাকাই কর্তব্য, তবে আমাদের বাঙ্গালী প্রচারক মহাশয়েরা সেটা অনাবশ্যক মনে করেন। সভায় প্রথমে এক একজন ক'রে বক্তৃতা ক'ল্লেন, শেষে ব'সে ব'সে উভয়পক্ষে ঘোর তর্ক আরম্ভ হ'লো। সুর পঞ্চম ছেড়ে সপ্তমে উঠল, তার পরেই হাতাহাতির যোগাড়। বেগতিক দেখে আমি পলায়নের পথ খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু এক অচিন্ত্যপূর্ব কারণে হঠাৎ সভা ভেঙে গেল। তর্ক ক'রতে ক'রতে আর্যসমাজের একজন বক্তা তাঁর বক্তৃতার মধ্যে একটা ব্যাকরণ-অশুদ্ধ কথা প্রয়োগ করেছিলেন,—তাই শুনে হিন্দুসভার দল হো হো করে চীৎকার করে উঠলো—এবং হাততালি দিয়ে 'ব্যাকরণ নেহি জান্তা, বেদবিচার করনেকো আয়া" ব'লে সভা ভেঙে দিলে। এই রকম হঠাৎ সভাভঙ্গ না হ'লে সেদিনকার প্রচারকার্য হয়ত শ্রীঘর পর্যন্ত পৌঁছত। এ রকম ঘটনা আমাদের দেশে খুব বিরল নয়। অনেকদিন পরে পণ্ডিত হরিকিষণের সঙ্গে দেখা হওয়াতে দুই সমাজ কি রকম কাজ ক'রছেন, এ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা কল্লুম। কথাবার্তায় অনেক সময় কেটে গেল, আমরাও এক পা দু পা ক'রে কমলেশ্বরে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

কমলেশ্বর শ্রীনগরের খুব নিকট, এমন কি এক মাইলের মধ্যে। কমলেশ্বরের নাম আগেই শুনেছিলুম,—ভেবেছিলুম,—হয়ত পাহাড়ের উপর একটা শিবমন্দির ছাড়া এখানে আর কিছুই নেই ; কিন্তু কাছে এসে বুঝলুম, এ শুধু মন্দির নয়, একটি ছোটখাট রাজবাড়ি। চারিদিক সমুচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত সিংহদ্বার। দ্বারে "ভীষণ মূরতি" দ্বারবান ; তাদের মুখে বিনয়ের অভাব এবং ঔদ্ধত্যের ভাব দেখে স্বতঃই মনে হয় এরা দেবমন্দিরের সংস্পর্শে আসবারও সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। চারিদিকের ব্যাপার দেখে বুঝলাম, এটা কখনো সন্ন্যাসীর আশ্রম নয়। মঠধারী যদিও সন্ন্যাসী কিন্তু এই মঠের ত্রিসীমানায় সন্ন্যাসের কিছুই নজরে পড়ে না ; সুতরাং তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথের মহান্ত মহারাজের কথা আমার মনে হ'ল। তাঁরাও অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী, এবং যদিও তাঁরা সন্ন্যাসী, তবু যে রকম বিলাস লালসা ও প্রলোভনের মধ্যে তাঁরা চিরজীবন ডুবে থাকেন, তাতে তাঁদের সন্ন্যাসধর্মের

www.pathagar.com

বর্ণ-পরিচয়টুকুও হয় কিনা সন্দেহ। এই কমলেশ্বরের মহান্ত সম্বন্ধেও আমার এই রকম একটা বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গেল; কিন্তু ভিতরের ব্যাপার জানবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহলও হ'লো।

আমরা সিংহদ্বার পার হ'য়ে প্রকাণ্ড একটা দ্বিতল চকের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হ'লুম; সেই প্রাঙ্গণের এক পাশে শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত লোহার গরাদে দেওয়া এক অনতিদীর্ঘ শিবমন্দির; মন্দিরের মধ্যে মহাদেব লিঙ্গমূর্তিতে বিরাজমান। মন্দিরের বাইরে একটা প্রকাণ্ডকায় পিতলের ষাঁড়। প্রাঙ্গণটি পাথরে বাঁধানো; পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, অতিথি, অভ্যাগত ও যাত্রিদলে সেই প্রাঙ্গণ এবং টানা বারান্দাগুলি পরিপূর্ণ। আমরা গিয়ে শুনলাম, আরতির সময় হয়েছে, তাই এত জনতা। অন্যান্য দর্শকের মত আমরাও একপাশে দাঁড়ালাম, অবিলম্বে ঠাকুরের আরতি আরম্ভ হ'ল।

হঠাৎ চারিদিকে "তফাৎ তফাৎ" শব্দ পড়ে গেল। বুঝলাম মহান্ত বাবাজী আসছেন। তাঁর আগে তিনচারজন চাকর উগ্রমূর্তিতে দর্শকদের তফাৎ ক'রতে লাগলো। একজন বৃদ্ধা একটি ছোট ছেলের হাত ধ'রে আরতি দেখতে এসেছিল, মহান্ত বাবাজীর পরিচারকদের ধাক্কায় ছেলেটি দর্শকদের পায়ের তলায় প'ড়ে গেল। বৃদ্ধা ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠল,—সেই ছেলেটিই তার অন্ধের নয়ন, বার্ধক্যের যষ্টি। পরিচারকদিগের এই নিষ্ঠুর আচরণ দেখে মহান্ত বাবাজী যে কিছু অসন্তুষ্ট বা দুঃখিত হ'লেন, তা বোধ হ'লো না। তিনি কমলেশ্বরের সেবাইত; তাঁর পথের সম্মুখে দাঁড়ালে এ রকম দু-পাঁচটা খুন জখম হওয়া যেন নিতান্তই স্বাভাবিক। মহান্তের এ রকম ভাব দেখে মনটা বড়ই অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো। পুরোহিত রঘুপতির আস্ফালন ও স্পর্ধায় নিরাশ-ক্ষুব্ধ গোবিন্দমাণিক্যের মত আমারো মনে হ'লো—

"এ সংসারে বিনয় কোথায়? মহাদেবী,
যারা করে বিচরণ তোমার চরণ-
তলে, তারাও শেখে নি কত ক্ষুদ্র তারা!
তোমার মহিমা হরণ করিয়ে
আপনার দেহে বহে, এত অহঙ্কার!"

যা হ'ক যখন এসেছি, তখন শেষ পর্যন্ত দেখে যাওয়াই ঠিক ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। মহান্ত প্রথমে কমলেশ্বরের উদ্দেশে প্রমাণ ক'ল্লেন, তারপর যতক্ষণ আরতি হ'লো ততক্ষণ ধ'রে মন্দির প্রদক্ষিণ ক'ল্লেন, অন্যান্য অনেক দর্শকও দূরে থেকে মন্দির প্রদক্ষিণ ক'রতে লাগলো। আরতি শেষ হ'লে মহান্ত ভিতরে প্রবেশ ক'ল্লেন। পণ্ডিতজি বল্লেন, মহান্ত এখন বৈঠকখানায় যাবেন—সেখানে আমাদের যাওয়ার কোন আপত্তি নেই; সুতরাং আমরাও তাঁর বৈঠকখানায় উপস্থিত হ'লুম। দেখলুম একটা প্রকাণ্ড ফরাস বিছানো আছে; একপাশে একটা উঁচু গদি ও তাকিয়া খুব কারুকার্যখচিত এবং বেশ সুকোমল। বুঝলুম মহান্ত মহাশয়ের সেইটিই আসন,— সন্ন্যাসীর উপযুক্ত আসনই বটে!

আমরা যে সময় বৈঠকখানায় গেলুম, তখন মহান্ত মহাশয় হাত মুখ ধুতে বারান্দায় গিয়েছিলেন; আমরা ব'সে ব'সে ভিতরের দিকে আর একটা খুব জমকালো চক দেখলুম। সেটা মহান্তের অন্তঃপুর। এই অন্দরে অবশ্য পরিবারাদি কেউ নাই; সেখানে তাঁর শয়নকক্ষ, বিশ্রামকক্ষ ইত্যাদি আছে। অন্যান্য মহান্তের ন্যায় কমলেশ্বরের মহান্তেরাও

www.pathagar.com

চিরকুমার থাকেন, মৃত্যুকালে চেলাদের মধ্যে কাকেও উত্তরাধিকার ক'রে যান। বর্তমান মহান্তের বয়স পঁয়ত্রিশ ও চল্লিশের মধ্যে ব'লে বোধ হ'লো, দেখতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট। কোন মঠের মহান্তকেই ত এ পর্যন্ত কাহিল দেখলাম না ; মহাদেবের সেবাইত ও ষণ্ড উভয়েই চিরকাল দিব্য সুগোল-দেহ।

কথাবার্তায় মহান্তজি মন্দ নন। আমাকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন, বাঙ্গালা দেশ ভাল কি এদেশ ভাল, এ সম্বন্ধে আমার মতামত জানতে চাইলেন। তিনি একবার তীর্থভ্রমণোপলক্ষে কাশীজি গিয়েছিলেন, সেখানে বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে তাঁর দেখা হ'য়েছিল, সে কথাও ব'ল্লেন। তারপর তিনি নানা রকমের গল্প আরম্ভ ক'ল্লেন— খোসামুদেরাও খুব প্রতিধ্বনি ক'রতে লাগলো। দেখলাম, বাবাজির আধ্যাত্মিকতা ও ভগবদ্ভক্তি আমাদের চেয়ে বড় জেয়াদা নয়, অন্ততঃ কথাবার্তায় ত এই রকমই বোধ হ'লো। যিনি সব ছেড়ে শুধু শ্মশান ও ভস্মমাত্র সার ক'রেছিলেন, তাঁর সেবাইতের এ রকম বিলাসপ্রিয়তা, এ রকম মোসাহেবের দল এবং এই প্রকার রাজভোগ কতটা ন্যায়সঙ্গত, সে বিষয়ের বিচার বাহুল্য। অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকে মনটা খাঁটি ও নির্লিপ্ত রাখার বাহাদুরী আছে বটে, কিন্তু মানুষের দুর্বল হৃদয়ের পক্ষে সে কাজটা বোধ হয় বিশেষ শক্ত। চারদিকের অগণ্য স্তুতিবাদ ও দেশবিদেশ হ'তে প্রেরিত বহুমূল্য উপহার-সামগ্রীর যথেচ্ছ ব্যবহার, যথার্থ বৈরাগ্যাবলম্বী সন্ন্যাসীর কখনই প্রীতিকর নয়। কমলেশ্বরের মহান্তকে দেখে, তাঁর সম্বন্ধে এই সমস্ত আলোচনা আমার মাথায় আসছিল। তিনি কি জানতেন যে, চারদিক হ'তে যখন তাঁর কথায় প্রতিধ্বনি উঠছে, অনুচরগণ শতমুখে তাঁর মহিমাকীর্তন ক'চ্ছে, সেই সময়ে তাঁরই গৃহপ্রান্তে বসে একজন প্রবাসী অতি রূঢ়ভাবে তাঁর বিষয় আলোচনা ক'চ্ছিলো?—আমিও জানতাম না যে, আমার সেই অসংযত সমালোচনা পুঁথিগত হ'য়ে অনেকের সম্মুখে উপস্থিত হবে।

যা হোক মহান্ত বাবাজীর সেই সমস্ত বাজে গল্প ধৈর্যধারণপূর্বক শোনা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। আমি পণ্ডিতজিকে ইসারা ক'রে উঠবার জন্য ব'ল্লাম। আমাদের উঠবার উপক্রম দেখে মহান্তজি প্রসাদ পাবার জন্যে অনুরোধ কল্লেন ; কিন্তু আমার সঙ্গে আরো লোক আছেন, তাঁরা হয়ত খাবার প্রস্তুত ক'রে আমার জন্যে অপেক্ষা ক'চ্ছেন, এই রকম একটা কথা ব'লে তাড়াতাড়ি উঠে এলুম। বাস্তবিক সেখানে প্রসাদ পাবার তেমন কিছু প্রলোভন ছিল না, কারণ পণ্ডিতজি অপরাহ্নে এমন এক সিধে পাঠিয়েছিলেন যে, তাতে আমাদের পাঁচ দিন বেশ সমারোহ ক'রে চ'লতে পারে। এর উপরে আবার আমাদের পরিচিত বন্ধুবান্ধবগণ দেখা ক'রতে এসে যথেষ্ট মিষ্টান্ন উপহার দিয়ে গিয়েছেন। আমার সঙ্গী বৈদান্তিক ভায়া পৃথিবীটা মায়াময় ব'লে নস্যাৎ ক'রতে সম্পূর্ণ রাজী, কিন্তু প্রত্যক্ষ বিদ্যমান মিষ্টান্ন মায়াময় ব'লে ত্যাগ ক'রতে কিছুতেই রাজী হন নি। বৈদান্তিকের দন্তের ক্রিয়া দেখে আমিও অবাক! আমার ভয় হ'য়েছিল সন্দেশগুলো বৈদান্তিকের যথেষ্ট মুখরোচক হ'লেও তাঁর পাকযন্ত্র সেগুলা হয়ত খুব সমাদরে গ্রহণ ক'রবে না।

কমলেশ্বরের মন্দির হ'তে যখন বাসায় ফিরলুম, তখন অনেক রাত হ'য়েছে। বাসায় এসে দেখি সেখানে দলে দলে লোক জমে গিয়েছে, আর পূজনীয় স্বামীজি সেখানে তুলসীদাসের পদব্যাখ্যা ক'চ্ছেন। পাউড়ী হ'তে একজন বন্ধুর আসবার কথা ছিল, তিনি

www.pathagar.com

তখনও এসে পৌঁছেন নি, সুতরাং পরদিন তাঁর জন্যে শ্রীনগরে অপেক্ষা ক'রবো কি না, এই ভাবতে লাগলাম ; এবং শেষে আর একদিন শ্রীনগরে থাকাই স্থির ক'ল্লুম।

১৫ই মে, শুক্রবার।—আজ শ্রীনগরে অবস্থিতি। সকালে কি দু'পুরে কোথাও বের হইনি। বিকেলে নদী পার হ'য়ে অপর পারে পাহাড়ে বেড়িয়ে এলুম। দর্শনযোগ্য বিশেষ কিছু নেই, দু'তিনটে ভগ্নপ্রায় শিবমন্দির দেখা গেল। পাহাড়ের উপরেই মন্দির—খুব প্রাচীন ; পাহাড়ের নাম ইন্দ্রাকিল পাহাড়। শ্রীনগরের গায়ে যে পাহাড় তার নাম অষ্টবক্র পর্বত। স্থানীয় লোকের মুখে শুনলাম, অষ্টাবক্র মুনি এই পর্বতে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন। তপস্যার উপযুক্ত স্থান তার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু কোথায় অষ্টাবক্র ঠাকুরের আশ্রম বা তপোবন ছিল, তা বিশেষ চেষ্টা ক'রেও জানতে পারিনি। কারণ কারও মত এই যে, যেখানে ইংরেজেরা "পাউড়ী" নগর স্থাপিত করেছেন, সেখানেই অষ্টাবক্র মুনির গুহা ছিল।

এখানকার রাজকার্য করবার জন্য একজন "সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট আছে। আমাদের দেশে ম্যাজিস্টেট কালেক্টার এবং পুলিসের যে কাজ তা এই সুপারিণ্টেন্ডেণ্টের হাতে। এতদ্ভিন্ন এখানে চারজন ডেপুটি ও চারজন তহবিলদার অর্থাৎ সাবডেপুটি আছেন। এ ছাড়া কাজ বেশী পড়লে সময় সময় বাহিরের লোকও নেওয়া হয়। অন্যান্য আফিসের মত পাউড়ীতে একটা টেলিগ্রাফ আফিসও আছে। এক কথায় এই সুদূর দুর্গম পাহাড়ের মধ্যে ইংরেজ তাঁদের সুখ-স্বচ্ছন্দতা ও আরাম বিরামের প্রয়োজনমত যতটকু দরকার, সব ঠিকঠাক ক'রে নিয়ে বেশ নিরুদ্বেগে দিনগুলো কাটিয়ে দিচ্ছেন।

www.pathagar.com

রুদ্র-প্রয়াগ

১৫ই মে, শুক্রবার।— আজ শ্রীনগরে আছি। বিকেলে নদী পার হ'য়ে অপর পারে পাহাড় দেখতে গিয়েছিলাম, সন্ধ্যার পূর্বে ফিরে আসা গেল। খানিক পরে পাহাড়ের পাশ দিয়ে চাঁদ উঠে সন্ধ্যার অন্ধকার দূর ক'রে দিলে। তখনও আলো তত উজ্জ্বল হয় নি ; সেই অস্পষ্ট আলোকে বহুদূরে সমুচ্চ পর্বতশৃঙ্গগুলি যেন আকাশের পটে আঁকা ছবির মত বোধ হ'তে লাগলো। অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ানতে শরীর একটু পরিশ্রান্ত হ'য়েছিল, কিন্তু সে জন্য চুপ ক'রে প'ড়ে থাকবার লোক আমি নই। খুব উৎসাহের সঙ্গে গল্প আরম্ভ কল্লুম। এই নির্জন পাহাড়ের কোলে ব'সে আমাদের দেশের ও সমাজের কথা চলতে লাগলো। জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্য, আশা ও আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে যখন কথোপকথন হ'লো, তখন দেখি উৎসাহ ও আনন্দে বৃদ্ধ স্বামীজির গম্ভীর এবং অচঞ্চল মুখকান্তি মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠছে। মহাসমিতিতে একটা শুধু রাজনৈতিক জীবনের প্রতিষ্ঠা দেখি, এবং নিদ্রামগ্ন জাতি যে দীর্ঘকালের জড়তা ত্যাগ ক'রে নিজের নিজের একটা অধিকার লাভের চেষ্টা করছে, এই ভেবে বিশেষ আনন্দ অনুভব করি ; সেই প্রেমের মূল্য সমস্ত রাজনৈতিক অধিকারের মূল্যের চেয়ে বেশী। স্বামিজীর সঙ্গে কথা কইতে কইতে অচ্যুত বাবাজি এসে পাশে বসলেন, এবং একটা সামান্য কথা ধ'রে বেদান্তের তর্ক পাড়লেন। তর্কে আমি পশ্চাৎপদ নই, আর ইংরেজী প'ড়ে অনধিকারচর্চা করবার ঝোঁকটাও আমাদের ইয়ং বেঙ্গলদের খুব বেশী প্রবল। তার একটু কারণও আছে। স্কুলে কলেজে যে সব কেতাব পড়া হয়, তাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল জিনিসের কথাই কিছু কিছু আছে। তার উপর আজকাল স্বাধীন চিন্তার দিন ; সুতরাং আমাদের ক্ষুদ্র মতগুলিকে তর্কজালে গগনস্পর্শ করে বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানসিদ্ধ পূজনীয় ব্যক্তির উপর বর্ষণ ক'রতে আমাদের কিছু সঙ্কোচ হয় না। এ অবস্থায় যে বৈদান্তিকের সঙ্গে তর্কক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'বো, তার আর আশ্চর্য কি?

আমাদের তর্কের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখে স্বামীজি কম্বল মুড়ি দিয়ে শয়ন ক'ল্লেন। তিনি তর্কসমুদ্র পার হ'য়ে এখন বিশ্বাসের তীরে এসে দাঁড়িয়েছেন ; তাঁর এ সব ভাল লাগবে কেন? তাই যখন আমরা নিষ্কর্মা দুটি লোক ক্রমাগত বাক্যবর্ষণ ক'রে পৃথিবীর সৃষ্টিস্থিতি লয় ক'রতে প্রবৃত্ত হ'লাম, তখন তিনি নিদ্রার উদ্যোগ ক'ল্লেন, কিন্তু কানের গোড়ায় এ রকম কলরব হ'লে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরও নিদ্রাকর্ষণের পক্ষে বাধা জন্মে, সুতরাং তিনি কম্বল ছেড়ে উঠে একটি গান জুড়ে দিলেন, ; তার সবটা মনে নেই, দুটো লাইন এই :—

"গোলেমালে মাল মিশে আছে ;
ওরে, গোল ছেড়ে মাল লওরে বেছে।"

আমাদের তর্ক-বিতর্কের এর চাইতে আর কি ভাল মীমাংসা হবে। রাত্রি অধিক হ'লো দেখে সেদিনের মত বেদব্যাসের বিশ্রাম দেওয়া গেল।

শ্রীনগরের সব ভাল ; মন্দের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র জীব, নাম বৃশ্চিক। এখানে বৃশ্চিকের ভয় অত্যন্ত বেশী, বিশেষ তার দংশনজ্বালা আজও আমার বেশ মনে আছে ; সুতরাং যখন শয়ন কল্লুম তখন বড় ভয় হ'তে লাগলো। সমস্ত রাত্রি এই ভয়ে পাশ পর্যন্ত ফিরি

www.pathagar.com

নি। ঘুমও ভাল হয় নি ; স্বপ্নে সমস্ত রাত্রি বৃশ্চিক দেখেছি ; আর বৈদান্তিকের তর্ক শুনেছি।

১৬ই মে, শনিবার।—আজ প্রাতে শ্রীনগর ত্যাগ ক'রে ৯ মাইল রাস্তা চ'লে 'ধাড়ী' চটিতে এলুম। চটিতে এসে দেখি জনমানবের সম্পর্কশূন্য অর্গলবদ্ধ দু'তিনখানা পত্র-কুটির পড়ে আছে। এখানে খাওয়া-দাওয়া হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, ক্ষুধারও কিছুমাত্র অপ্রতুল নেই। গত দুদিন শ্রীনগরে যে সুখে ছিলুম, আজ তার প্রতিশোধ হ'লো। নিকটে এমন কোন গ্রাম নেই, যেখান থেকে খাবার যোগাড় করে আনি, সুতরাং এ অবস্থায় সকলে যা করে আমরাও তাই কল্লুম ;—বেশ পরিপূর্ণ রকম উপবাস করা গেল। ঘরে বসে উপবাস করার মধ্যে গুরুত্ব বিশেষ কিছুই নেই ; কিন্তু এই পাহাড়ের মধ্যে নয় মাইল "চড়াই ও উৎরাই" শূন্য পাকস্থলীতে পার হ'লে শরীরের যে কি দুর্দশা হয়, তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কারো অনুভব করবার শক্তি আছে ব'লে বোধ হয় না। আমি যত কাতর হয়েছিলাম—আমার বোধ হ'লো আমার সঙ্গিদ্বয় তা অপেক্ষা একটু বেশী কাতর হ'য়েছিলেন। স্বামীজি বৃদ্ধ, তার উপর এই পথশ্রম ; দীর্ঘকাল অনাহারে তাঁর কাতর হওয়া অবশ্যই সম্ভব ; কিন্তু বৈদান্তিক ভায়া আমার অপেক্ষাও জোয়ান, তবু তাঁর এ রকম কাতরতার কারণ বোঝা গেল না ; বোধ করি তাঁর পরিপাক-শক্তি ভোজনশক্তিরই অনুরূপ। ধর্মের কোন ধার ধারেন ব'লে বোঝা যায় না ; খানিকটে শুষ্ক নীরস তর্ক পেলেই তিনি খুব পরিতৃপ্ত হন। আমাদের মত ডাল রুটি খাওয়ার পরিবর্তে যদি তিনি যোগীঋষির মত আমলা হর্তুকী খাওয়া অভ্যাস ক'রতেন, তা হ'লে কটা গাছ ফলশূন্য ক'রতে পারতেন, তা আমি অনুসন্ধান ক'রে উঠতে পারিনে। অনাহারে ভায়ার মেজাজ বড় খিটখিটে হ'য়ে উঠলো, আজ আমার উপর তাঁর রাগটা কিছু বেশী, অবশ্য তার কারণও ছিল। শ্রীনগর হ'তে বে'র হ'বার সময় ভায়া আমাকে পুনঃ পুনঃ ব'লেছিলেন যে, রাস্তায় আর এমন সহর নেই ; এখান হ'তেই কিছু খাবার সংগ্রহ ক'রে যাওয়া উচিত ; বিশেষ পথে আজও চটি বসে নি, সুতরাং অনাহারে বড়ই কষ্ট পেতে হবে। সে সময় উদর পূর্ণ ব'লেই হোক—কি পুঁটুলি বেঁধে খাবার ঘাড়ে ক'রে চলাটা ক্ষুধার সময় ছাড়া অন্য সময়ে প্রীতিকর নয় ব'লেই হোক—বৈদান্তিক ভায়ার সে প্রস্তাবে আমি কর্ণপাত করি নাই। সেই জন্য আজ ভায়া আমার উপর গরম : এই সময়ে এই ক্ষুৎপীড়িত বৈদান্তিক প্রবরের জঠরানলে তর্কাহুতি প্রদানের ইচ্ছা আমার বিলক্ষণ প্রবল হ'য়ে উঠলো, কিন্তু স্বামীজির ইঙ্গিত অনুসারে আমি নিরস্ত হলুম। উপায়ান্তর না দেখে একটা গাছতলায় পোড়ে নিতান্ত নিরুপায় ভাবে দুপুরের রৌদ্র ভোগ করা গেল।

বেলা দুটো বাজতে না বাজতেই এখান হ'তে রওনা হবার জন্যে বৈদান্তিক ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুল্লে। এত রৌদ্রে বের হ'তে কারো ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু পাছে রাত্রিতেও অনাহারে আশ্রয়হীন হ'য়ে কাটাতে হয়, এই ভয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। কিন্তু অদৃষ্টে কষ্ট থাকলে কে খণ্ডাতে পারে? আজ কি শুভক্ষণেই পা বাড়ানো গিয়েছিল, তা বলতে পারি নি। একটু যেতে না যেতেই এই বৈশাখ মাসের প্রবল রৌদ্র কোথায় চ'লে গেল এবং তার বদলে ভয়ানক ঝড় জল আরম্ভ হ'লো। কিন্তু এ রকম বিপদ আমাদের পক্ষে নূতন নয়। কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে সেই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে চার মাইল তফাতে একটা চটিতে উঠলাম। এ চটিটার নাম আমার ডাইরী থেকে মুছে গিয়েছে। এখানে একটা পাথরের কোঠা আছে, শুনলাম সেটা গভর্ণমেণ্টের ধরমশালা। ছোট একটা কোঠা আর একটা

www.pathagar.com

ছোট বারান্দা। সেখানেই আড্ডা নেওয়া গেল। এখান হ'তে রাস্তায় মধ্যে মধ্যে এ রকম ধরমশালা নাকি অনেক আছে। যা হোক এখানেই সেই রাত্রিবাসের আয়োজন কল্লুম ; ভিজে কাপড়ে ও ভিজে কম্বলে কোন রকমে রাত্রি কেটে গেল।

১৭ই মে, রবিবার। খুব ভোরে রওনা হ'য়ে এগার মাইল পথ চ'লে রুদ্রপ্রয়াগে উপস্থিত হওয়া গেল। আমাদের দেশের লোক একটা প্রয়াগেরই নাম জানেন। তা ছাড়াও অনেক প্রয়াগ আছে। যাঁরা বদরিকাশ্রম কি কেদারনাথ দর্শন করতে গিয়েছেন, তাঁরা অবশ্য এ সকল দেখেছেন। কিন্তু এ সব কথা ছাপার কাগজে বড় একটা উঠে না, এ শুধু পুণ্যপ্রয়াসী তীর্থযাত্রীর মনে তীর্থের সুপবিত্র মহিমার সঙ্গে দীর্ঘ পথের স্মৃতি জড়িয়ে ভক্তির একটা অটল সিংহাসন প্রস্তুত ক'রে রাখে। সেই জন্যে সকল প্রয়াগের নাম সাধারণের জানার ততটা সম্ভাবনা নেই ; কিন্তু কেদারখণ্ড নামক গ্রন্থে পাঁচটি প্রয়াগের উল্লেখ আছে। এলাহাবাদে বটপ্রয়াগ, কারণ সেখানে অক্ষয়বট আজও সশরীরে বর্তমান, তবে ক্রমাগত তেল সিন্দুর ঘর্ষণে বটপ্রবর এমন চেহারা বের ক'রেছেন যে, তিনি উদ্ভিদ কি আর কিছু, তা সহজে ঠাহর করা যায় না। বোধ হয় প্রলয়কালে বিষ্ণু বিশ্রাম কামনায় পত্রের অনুসন্ধানে এসে গুঁড়ি পর্যন্ত চিনতে পারবেন না। বটপ্রয়াগের পর দেবপ্রয়াগ, সে কথা আগেই ব'লেছি ; ক্রমে রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ এবং নন্দপ্রয়াগ। ভারতবর্ষে সর্বসমেত এই পাঁচটি প্রয়াগই ছিল ; কিন্তু আরও একটি প্রয়াগের বৃদ্ধি হয়েছে, তার নাম বিষ্ণুপ্রয়াগ। ধীরে ধীরে সকলগুলির কথাই বলবার ইচ্ছা আছে। পুরাণাদি গ্রন্থে এই অঞ্চলের নাম উত্তরাখণ্ড। ঐ সকল গ্রন্থে উত্তরাখণ্ডের অনেক মহিমার কথা লিপিবদ্ধ আছে। উত্তরাখণ্ডে বাস ক'ল্লে মহাপুণ্য সঞ্চয় হয়।

রুদ্রপ্রয়াগে এসে আমরা বড়ই বিপদে পড়লাম। স্বামীজি জ্বরে পড়লেন ; তবে সৌভাগ্য এই যে, গবর্ণমেণ্ট নির্মিত ধর্মশালায় আমাদের মাথা রাখবার একটু জায়গা হ'লো। এই ধরমশালায় দু'টো ছোট কুটুরি আর একটা বারান্দা। এখানে অলকানন্দার পাড় অত্যন্ত উঁচু। জলের ধারে যাওয়া অসম্ভব। এখান হ'তে মন্দাকিনী ও অলকানন্দার সঙ্গম আতি সুন্দর দেখতে পাওয়া যায়। এখানে একটা ছোট বাজার আছে, কিন্তু তা পাহাড়ের এমন জায়গায় যে, যদি একদিন নদীতে ভাঙন ধরে ত সব এমন ভেঙে পড়বে যে, আর কাহারও কোন চিহ্নমাত্রও থাকবে না। আমার এ অনুমানটা হাতে হাতেই ফলে গিয়েছে। বদরিকাশ্রম হ'তে ফেরবার সময় দেখি, সত্যসত্যই এখানকার বাজার নদীগর্ভে নেমে গিয়েছে। শুধু বাজার নয়, বাজার হ'তে দু তিন মাইল বদরিনারায়ণের রাস্তা পর্যন্ত অদৃশ্য হ'য়েছে। সে কথা ফেরবার সময় ব'লবো। আমরা যে পারে ছিলুম, সঙ্গমস্থল তার অপর পারে। পার হবার জন্য দেবপ্রয়াগের মত এখানেও একটা টানা সাঁকো আছে ; সেই সাঁকো পার হ'য়ে সঙ্গমস্থলে আসতে হয়।

দেবপ্রয়াগে একটু সহরের গন্ধ আছে ; এখানে তা কিছুই নেই, এমন কি পাণ্ডার গোলযোগ পর্যন্তও নেই। গ্রামে তিন চার ঘর গৃহস্থ ; দোকানগুলি অতি যৎসামান্য ; অনেক চেষ্টা করেও একটু চিনি যোগাড় করতে পাল্লুম না।

স্বামীজির জ্বর ক্রমেই বাড়তে লাগলো। এই দূরদেশে তাঁর সঙ্গেই এসেছি। তাঁকে এ রকম অসুস্থ দেখে মনটা ভারি দমে গেল। তিনি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ; সব ত্যাগ ক'রেছেন, কিন্তু মায়া ত্যাগ করতে পারেন নি। কম্বল ছাড়া সম্বল নেই, অথচ তার মধ্যে

www.pathagar.com

মায়া। ইহা মোহের নামান্তর নয় ; ইহা আসক্তিশূন্য, উদার, সর্বত্র প্রসারিত প্রীতি। কিন্তু তার মাত্রাটা আমারই উপর একটু বেশী হ'য়ে উঠেছে। এ কয়দিন বোধ হয় তিনি তাঁর ধ্যান-ধারণা হ'তে খানিকটে সময় ক'রে নিয়ে, এই জঙ্গলে, পর্বতের মধ্যে আমার যতটুকু সুখ বা আরাম লাভ হ'তে পারে, তারি জন্যে তা নিযুক্ত ক'রেছেন। এদিকে জ্বরে কাঁপছেন, শীতে দাঁতে দাঁতে বেধে যাচ্ছে, অথচ তারি মধ্যে বলা হ'চ্চে, "দেখ দেখি দোকানে দু'টো চাল পাওয়া যায় কিনা? একটু দুধ যোগাড় ক'রে খাও।" এই পর্বতের মধ্যে রোগ-শয্যাশায়ী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর প্রাণের আগ্রহ দেখে হৃদয় বিগলিত হ'লো এবং বাল্যের পিতামাতার স্নেহ ও আদরের কথা মনে প'ড়লো। সমস্ত দিন স্বামীজির রোগশয্যার পাশে ব'সে থাকলাম। সন্ধ্যার খানিক আগে অস্তগামী সূর্যের স্বর্ণময় কিরণে যখন সঙ্গমস্থল অনুপম শোভা ধারণ ক'ল্লে, তখন এক একবার ইচ্ছে হ'তে লাগলো যে, ছুটে গিয়ে এই মুক্ত প্রকৃতির সুন্দর শোভার মধ্যে ডুবে গিয়ে এই চিন্তাক্লিষ্ট, বিষণ্ণ মনটাকে খানিক প্রফুল্ল ক'রে নিয়ে আসি। কিন্তু স্বামীজি অত্যন্ত কাতর, তাঁকে ছেড়ে কোথাও যেতে পাল্লুম না ; তবু যে তাঁর সেবা করতে পাল্লুম, এই একটা আনন্দের কারণ হ'লো। কোন রকমে সন্ধ্যাটা কেটে গেল কিন্তু রাত্রিতে বিপদের উপর বিপদ উপস্থিত, আমার অত্যন্ত জ্বর ও রক্তামাশয় হ'লো। রাত্রি যত শেষ হ'তে লাগলো, রোগও তত বাড়তে লাগল ; ক্রমে আমি উত্থানশক্তি রহিত হ'য়ে প'ড়লুম ; সমস্ত পথশ্রমের কষ্ট আমার বলহীন, নির্জীব দেহটা আক্রমণ ক'ল্লে, হাত পা নাড়বার ক্ষমতা রইল না! শরীরের অবস্থা এ রকম হ'লেও আমার চিন্তাশক্তি তখন বেশ তীব্র ছিল। আমার মনে হ'লো ঊষার আলোকে চরাচর সুরঞ্জিত হবার আগেই হয়তো হিমালয়ের এই নির্জন উপত্যাকায় আমার ইহজীবনের ভ্রমণ পর্যবসিত হ'চ্ছে। সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে মনে বড় অহঙ্কার হ'য়েছিল যে যখন মায়াজাল ছিন্ন করা এত সহজ, তখন লোকে তা পারে না কেন? এই ত আমি পেরেছি ; কিন্তু মৃত্যু যখন জীবনের পাশে এসে দাঁড়ালো, মৃত্যুর সেই উচ্চ অনাবৃত তটপ্রান্তে দাঁড়িয়ে যখন প্রতিমুহূর্তে সেই বিস্মৃতিপূর্ণ, গভীর অতলে আমার পদস্খলন হ'বার সম্ভাবনা দেখলুম, তখন সংসারের সমস্ত মায়ামোহ এসে আচ্ছন্ন ক'ল্লে। মনে হ'লো যাদের ফেলে এসেছি, সন্ন্যাসী ব'লেই যে তাদের ছেড়ে আসতে পেরেছি তা নয় ; তাদের একবার দেখার আশা আছে ব'লেই তাদের ফেলে আসতে পেরেছিলুম, বাঁধন ছিঁড়তে পারি নি। যখন এই সকল গভীর চিন্তা আমার মনে উদয় হ'য়েছিলো, তখন স্বামীজি তাঁর রোগশয্যা ছেড়ে বহুকষ্টে একবার উঠে আমার ম্লান মুখ ও ক্লান্ত চক্ষুর দিকে অত্যন্ত ব্যাকুল স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিলেন। সন্ন্যাসজীবন আরম্ভ ক'রে যে সব অনিয়ম ও অত্যাচার ক'রেছি, তাতে ক'রেই আজ এই বন্ধুহীন দেশে পর্বতের মধ্যে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছি ব'লে স্বামীজি অত্যন্ত কাতর হ'য়ে প'ড়লেন। তাঁর কাতরতা দেখে তাঁকে একবার ব'লতে ইচ্ছা হোলো "হে বৈরাগ্যাবলম্বী পুরুষপ্রবর, বৃথা তোমার বৈরাগ্য, এখনো তোমার মনে দুঃখ শোক স্থান পায়, এখনও তুমি বন্ধনের দাস!" কিন্তু তখনই মনে হ'লো, এ কাতরতা তাঁর নিজের জন্যে নয়, পরের জন্যে ; তাঁর এ অশ্রু—নিজের দুঃখে নয়, পরের কষ্টে। পৃথিবীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ ক'রেও যিনি সকলের প্রতি স্নেহপরায়ণ, তাঁরই যথার্থ বৈরাগ্য, নতুবা জনমানবের সাড়া-শব্দশূন্য জঙ্গলে ব'সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অলীক ব'লে নাসাগ্রে দৃষ্টিবদ্ধ ক'রে কাল কাটানতে বিশেষ

www.pathagar.com

কিছু যে মহত্ত্ব আছে, তাহা আমার বোধ হয় না। বৈদান্তিক ভায়ার অবস্থা দেখে আমার একটু হাসি এল। তিনি কম্বল মুড়ি দিয়ে কাত হ'য়ে ঘরের এক কোণে পড়েছিলেন এবং এক একবার উদাস দৃষ্টিতে আমার মুখপানে মিটমিট ক'রে চাচ্ছিলেন। সেই দীপালোকে তাঁর বিষণ্ণ মুখের দিকে চেয়ে কিছুতেই মনে হয় না যে, সেই বৈদান্তিক আমাদের এই বিপদকালে তাঁর Theoryর উপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত আছেন।

১৮ই মে, সোমবার।—রাত্রি প্রভাত হ'লো। সকালের আলো ও বাতাসে আমার শরীর অনেকটা ভাল হ'তে লাগলো ; পীড়ার বেগও অনেকটা কমে এল। স্বামীজির অবস্থাও অনেকটা ভাল। দুই প্রহরের সময় স্বামীজি আমাকে একটু জল খেতে দিলেন। আশ্চর্যের বিষয় স্বামীজির একটু-আধটু তন্ত্রমন্ত্র ছিল ; তাঁর মত লোকের ওসবের কি আবশ্যক, তা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ঠিক ক'রে উঠতে পারতাম না। কিন্তু আজ দেখলাম, তাঁর তন্ত্রমন্ত্রের মধ্যেও খানিকটে সত্য আছে। তিনি তাঁর কমণ্ডলু থেকে খানিক জল নিয়ে তার দিকে একদৃষ্টিতে একমনে চেয়ে থাকলেন, তার পর সেই জলের মধ্যে জোরে একটা ফুঁ দিয়ে আমাকে খেতে দিলেন। আমাদের দেশে শুনেছি সেকালে জলপড়া খেয়ে লোকের ব্যারাম সারতো ; মধ্যে ইয়ং বেঙ্গলদের আমলে কিছুদিন সারতো না, এখন সেই জলপড়া বিলাত হ'তে মেসমেরিজম নাম নিয়ে এদেশে এসেছে ; এখন আবার তাতে অসুখ সারছে! প্রাচীন যোগতত্ত্বের জায়গায় পাশ্চাত্ত্য সাইকিক ফোর্স বাসা বেঁধে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতীত ও ভবিষ্যতের খবর দিচ্ছে। শুনেছি এ সকল থিয়সফির কথা ; এসব তত্ত্ব জানিও নে, বুঝিও নে। তবে এইটুকু দেখলাম যে, স্বামীজির জল খেয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমার শরীর বিশেষ সুস্থ বোধ হ'লো। অসুখ একটু নরম পড়তেই আমার ভয়ানক ক্ষিদে পেলে। সে রকম ক্ষিদে বোধ হয় আমার জীবনে আর কখনো পায় নি। একটা অসুখ কতকটা সেরেছে বটে, কিন্তু জ্বর তখনও পূর্ণ মাত্রায়। ক্ষিদের জ্বালায় ছটফট ক'ল্লেও সে অবস্থায় কিছু খাওয়া উচিত নয় ; কিন্তু আমি আর থাকতে পাল্লুম না। সঙ্গে একজন লোক ছিল, সেই রান্নার যোগাড় ক'রে দিলে। তার কৃপায় ডাল-রুটি খাওয়া হ'লো। সে ডাল-রুটির যে কি চেহারা। তা যদি আমাদের ডাক্তার মহাশয়েরা দেখতেন,—বিশেষ, আমার একটি অতি-সতর্ক, বয়ঃকনিষ্ঠ কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধ ডাক্তার বন্ধু আছেন—আমার এইরূপ পথ্য তাঁর চোখে পড়লে তিনি নিঃসন্দেহে আমার মৃত্যু নিশ্চয় ব'লে স্থির করতেন। স্বামীজিও আমার পথ্যের পোষকতা করেন নি ; কিন্তু আহারের পর আমি অনেকটা বল পেলুম, জ্বরটা তখনও বেশ প্রবল। স্বামীজি বল্লেন, রাত্রে ঘুমালেই জ্বরটা ছেড়ে যাবে।

আজ বৈকালে বেড়াবার লোভ সংবরণ করা আমার পক্ষে একেবারে দুঃসাধ্য হয়ে উঠলো। সঙ্গমস্থলের কাছে গিয়ে সেখানকার শোভা দেখবার জন্যে মনে অত্যন্ত আগ্রহ হ'তে লাগলো। কিন্তু এই অসুখের উপর ঘুরে বেড়ানতে স্বামীজি যদি অসন্তুষ্ট হন, এই ভয়ে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকলাম ; পরে যেই দেখলাম, স্বামীজি ধর্মশালার ঘরে ঈষৎ তন্দ্রাভিভূত হয়েছেন, অমনি আমি বেরিয়ে পড়লাম। বাজারের ভিতর দিয়ে টানা সাঁকো পার হ'য়ে ঘুরতে ঘুরতে সঙ্গমস্থলে গিয়ে হাজির হওয়া গেল। এইটুকু পথশ্রমেই শরীর বড় কাতর ও অবসন্ন হয়ে পড়লো। জলের ধারে ব'সে আমি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে লাগলুম। চারিদিকে সরল সমুন্নত পর্বত ; সম্মুখে অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর খরপ্রবাহ

www.pathagar.com

পরস্পরে মিশে গিয়েছে ; সূর্যকিরণোদ্ভাসিত পর্বতের কনক কিরীট নদীজলে প্রতিফলিত হ'চ্ছে ; রক্তরঞ্জিত মেঘের ছায়া ধীরে ধীরে ভেসে যাচ্ছে। জলের ধারে কত রকমের সুন্দর পাথর প'ড়ে আছে, ব'লে শেষ করা যায় না। আমি ব'সে ব'সে সেই সমস্ত উপলখণ্ড সংগ্রহ করতে লাগলাম। দেবপ্রয়াগে কতকগুলি সুন্দর পাথরের নুড়ি সঞ্চয় ক'রেছিলাম, কিন্তু স্বামীজি তা ফেলে দিয়েছিলেন এবং ব'লেছিলেন যে, যদি ভাল পাথর দেখলেই কুড়িয়ে নিয়ে যেতে হয়, তা হ'লে আমাদের সঙ্গে দশবিশটে হাতী আনা উচিত ছিল। দেবপ্রয়াগে সেগুলি ফেলে দিয়েছিলাম, কিন্তু এখানকারগুলি সব ফেলতে পাল্লুম না ; এমন সুন্দর পাথর কি ফেলা যায়? কেমন উজ্জ্বল, মসৃণ, বহুবিধ বর্ণ এবং আকারবিশিষ্ট। কোনটা ঘোর লাল, কোনটা দুগ্ধফেনবৎ শ্বেত, কয়েকটা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ —আবলুসকাঠের মত, কতকগুলি নয়নস্নিগ্ধকর হরিৎ, দু'পাঁচটার বা কমলালেবুর রং। কতকগুলির এক দিক এক রকম বর্ণ, অন্য দিকে অন্য রকম ; উভয় বর্ণ পরস্পরের মধ্যে মিশে গিয়েছে, অথচ সেই মিশ্রণের মধ্যে এমন একটা সুন্দর রেখা আছে, যা চিত্রকরের তুলিতে কিছুতেই অঙ্কিত হ'তে পারে না, অথচ তা কত স্বাভাবিক দেখাচ্ছে ; যেন তার মধ্যে কিছুমাত্র অসাধারণত্ব নেই। আবার সেই সমস্ত প্রস্তরখণ্ড যে কত আকারের তার সংখ্যা করা যায় না। গোল, চেপ্টা, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ ; আকার যত রকম হ'তে পারে, বোধ হয়, তার সকল রকমেরই আছে। এই সকল প্রস্তরখণ্ড নদীর ধারে প্রচুর পরিমাণে বিক্ষিপ্ত। বোধ হ'তে লাগলো এ সব যেন সুরনদী মন্দাকিনীর সৈকতে প্রস্ফুটিত প্রবাহ-পুষ্প। আমি এক-একবার কতকগুলি সুন্দর নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে খানিকটে উপরে পাথরের উপর বসি ; ব'সে থেকে তার মধ্যে থেকে ভাল দু'তিনটে বেছে রেখে, বাকিগুলো জলে ছুঁড়ে ফেলে দিই ; আবার কতকগুলি নিয়ে আসি, এবং তা থেকে দু একটি বেছে নিই। এই রকম করতে করতে ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এলো, অথচ সে দিকে আমার খেয়াল নেই। হঠাৎ উপর হ'তে স্বামীজির কণ্ঠস্বর শুনে আমার চৈতন্য হ'লো। চেয়ে দেখি, তিনি ওপারের পাহাড় বেয়ে যেটুকু নীচে নামা যায়, ততটুকু এসে একখানা পাথরের উপর ব'সে আমায় ডাকছেন। আমি তাড়াতাড়ি উঠে রাস্তা ঘুরে ধরমশালায় যেতে বেশ অন্ধকার হ'য়ে এলো। স্বামীজি ততক্ষণ বাসায় পৌঁছেছিলেন।

আমি বাসায় প্রবেশ করবামাত্র তিনি আমার উপর স্নেহপূর্ণ তিরস্কার বর্ষণ করতে লাগলেন ; তার মর্ম এই যে, যদি আমি পথে-ঘাটে যেখানে সেখানে এ রকম নিবিষ্টচিত্ত হ'য়ে ব'সে থাকি তা আমাকে বাঘে ভাল্লুকে ফলাহার করতে পারে, কিংবা আমি পাথরচাপা পড়েও মরতে পারি। বিশেষতঃ আজ আমার রুগ্নদেহে এতটা ওঠা-নামা করা ভাল হয় নি। বৈদান্তিক আমায় বাসায় না দেখে, এখানে এসে প্রায় একঘণ্টা ধ'রে ঐ পাথরের উপর ব'সে আমার ছেলেখেলা দেখছিলেন। অচ্যুত বাবাজী আমাকে ডাকতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু স্বামীজি ডাকতে দেন নি। আমার রকম দেখে তাঁর মনে অন্য এক প্রকার ভাবের উদয় হ'য়েছিল ; তাই ভাবে গদগদ হ'য়ে বলেছিলেন, "প্রকৃতি মায়ের কোলে এমনি ক'রে সকলেই বালক হ'য়ে যায়।" রাত্রিটা আমরা এক রকমে কাটিয়ে দিলুম ; কিন্তু সঙ্গের লোকটার বড় জ্বর এলো।

১৯এ মে, মঙ্গলবার।—আমাদের শরীর যদিও অনেকটা দুর্বল ছিল, তবুও আজই এখান হ'তে রওনা হব, এ রকম সঙ্কল্প করেছিলুম; কিন্তু সঙ্গের লোকটার জ্বর হওয়ায়

www.pathagar.com

আজও এখানে থাকতে হ'লো। আরো মনে করা গেল, আজকের দিনটা বিশ্রাম ক'রে শরীর আর একটু সুস্থ ক'রেই নেওয়া যাক। বৈদান্তিকের আর এক দণ্ড এখানে থাকতে ইচ্ছে নেই, তিনি বেরিয়ে পড়লেই বাঁচেন। কিন্তু কি বোলে আমাদের ফেলে যান? কাজেই তাঁকেও চক্ষুলজ্জায় থাকতে হ'লো।

এখান হ'তে দু'টো রাস্তা বের হ'য়েছে। যে টানা সাঁকো পার হ'য়ে আমি সঙ্গমস্থলে গিয়েছিলুম, সেই সঙ্গমস্থলের উপর দিয়ে মন্দাকিনীর ধারে ধারে কেদারনাথ যাওয়া যায়। আর একটা রাস্তা—আমরা যে পারে আছি— সেই পার দিয়ে বরাবর অলকানন্দার ধারে ধারে বদরিকাশ্রম পর্যন্ত গিয়েছে। অনেকেই এখান হ'তে অপর পারের পথ ধ'রে, প্রথমে কেদারনাথ দর্শন ক'রে, পরে ঐ দিক দিয়েই যে রাস্তা আছে, সেই রাস্তায় এসে খানিক উপর দিয়ে বদরিকাশ্রমে যে রাস্তা গিয়েছে, সেই রাস্তায় উপস্থিত হন। আমরা প্রথমেই বদরিকাশ্রম যাব, এই রকম স্থির ছিল।

পূর্বেই বলেছি, আমরা যে পারে আছি, এই পার দিয়েই—অলকানন্দার ধারে ধারে বদরিকাশ্রমের রাস্তা ; কিন্তু রুদ্রপ্রয়াগ থেকে পিপলচটি পর্যন্ত রাস্তাটা বড়ই ভয়ানক এবং দুর্গম। এখান হ'তে পাহাড় একেবারে সোজা, তার গায়ে একটা সঙ্কীর্ণ দুর্গম পথ। পাহাড়ের যে অংশে রাস্তা, সে অংশটা মধ্যে ভেঙে পড়ে, সুতরাং খানিকটে ঘুরে আবার একটা রাস্তা পড়ে। একবার একদিন এই রাস্তায় কতকগুলি যাত্রী যাচ্ছিলো, তখন একটু একটু বৃষ্টিও হচ্ছিল, ঝড়ও ছিল। এই সময় তাদের মাথার উপর পাহাড়ের ধস নামে, তারপর একটি যাত্রীরও চিহ্নমাত্র দেখতে পাওয়া যায় নি। এই ঘটনার পর গবর্ণমেণ্ট টানা সাঁকোর ওপর দিয়ে পিপলচটি পর্যন্ত একটা রাস্তা তৈয়ারি ক'রে দিয়েছেন। আবার পিপলচটিতে একটা টানা সাঁকো তৈয়েরি ক'রে ঐ রাস্তাটাকে এ-পারের রাস্তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন।

রুদ্রপ্রয়াগ থেকে পিপলচটি পনের মাইল। ও-পারের নূতন রাস্তা ভাল বটে, কিন্তু এই পনের মাইলের মধ্যে কোন চটি নেই ; এক টানেই ওই পনের মাইল ; কিন্তু রাস্তা চলা কষ্টকর ব'লে সকলেই এ-পারের সঙ্কীর্ণ পথে চলে ; কারণ এখান হ'তে সাত মাইল তফাতে শিবানন্দী চটি। সরকারী লোকজন দু'পথেই চলে।

এই জায়গায় আজ তিন দিন ব'সে থেকে মনটা বড় ভাল নেই। বিকেলে স্বামীজি বল্লেন, এখন হ'তে রাস্তা ক্রমেই খারাপ হবে, শুধুপায়ে তার উপর দিয়ে চলতে গেলে পা দু'খানাকে কিছুতেই আস্ত রাখা যাবে না ; বিশেষতঃ এই দুর্গম রাস্তার মধ্যে এক জায়গায় যদি পা জখম হ'য়ে পড়ে ত চক্ষুস্থির! সুতরাং এখান হ'তে এক এক জোড়া পাহাড়ী জুতা কিনে নেওয়া যাক। আমিই বাজারে জুতো কিনতে গেলুম। দেখি জুতোর দোকান নেই, একজন মুচি একটা জায়গায় ব'সে জুতো মেরামত কচ্ছে, আর তার পাশে দেবকন্যার মত সুন্দরী একটি মেয়ে ব'সে আছে। এমন সুন্দর চেহারা সর্বদা আমাদের নজরে পড়ে না। তার যেমন রং, তেমনি সর্বাঙ্গপূর্ণ সৌষ্ঠব! মেয়েটির বয়স পনের ষোল বছর ; সতেজ, উন্নতদেহ, তার উপর যৌবনের লাবণ্য। সেই জায়গাটা যেন আলো ক'রে ব'সে আছে। আমি বিহ্বলনেত্রে তার দিকে চেয়ে রইলুম। এ রকম জায়গায় আমি এমন সুন্দরীকে দেখবার প্রত্যাশা করি নি ব'লেই বোধ করি আমার এত বিস্ময়। তার পর যখন শুনলুম, সে মুচির কন্যা, তখন আর আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। আমি ভাবলুম,

www.pathagar.com

মুচির মেয়ে যেখানে এমন, ভদ্রলোকের মেয়েরা সেখানে না জানি কত সুন্দরী!

যা হোক, এই মুচিকে জুতোর কথা জিজ্ঞাসা করায় সে ব'ল্লে জুতো তৈয়েরি নেই, তবে আমি যদি খানিক অপেক্ষা করি ত সে জুতো তৈয়েরি ক'রে দিতে পারে। খানিক ব'সে থাকলে তিন চার জোড়া জুতো তৈয়েরি হবে, শুনে আমি অবাক। একটা দোকানে ব'সে তার কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলুম। সে আর তার মেয়েতে মিলে জুতো তৈয়েরি ক'রতে লাগলো,—সেই সুন্দরীর ফুলের মত সুন্দর সুকোমল হাতে কঠিন চামড়া নাড়াচাড়া বড়ই অমানান দেখাচ্ছিল।

শীঘ্রই জুতো তৈয়েরি হ'য়ে গেল—জুতো তো ভারি, পায়ের এপাশ ওপাশ দিয়ে দিয়ে বাঁধবার জন্যে গোটাকত চামড়ার ফিতে। জুতো তৈয়েরি হোলো, মেয়েটি তা হাতে ক'রে আমার আগে আগে ধরমশালা পর্যন্ত পয়সা নিতে এলো ; মনে হ'লো যেন কোন বনদেবী ছল ক'রে এই নির্জন পার্বত্য-প্রদেশে আমার পথপ্রদর্শিকা হ'লেন।

আজ রাত্রিতে সঙ্গের লোকটার অবস্থা অনেক ভাল। প্রত্যূষে রুদ্রপ্রয়াগ ত্যাগ ক'রবো—এই রকম স্থির করা গেল।

www.pathagar.com

২০এ মে, বুধবার।—আজ খুব সকালে রুদ্রপ্রয়াগ ছেড়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে লাগলাম। আমরা যে কয়জন একসঙ্গে যাচ্ছি, এক বৈদান্তিক বাদে তাদের আর সকলেরই শরীর অসুস্থ ; স্বামীজি ও ভৃত্যটি অত্যন্ত কাতর ; আমার শরীরও বড় ভাল ছিল না ; কিন্তু সে সব ভাব গোপন ক'রে বিশেষ স্ফূর্তির সঙ্গে চ'লতে লাগলাম। আমার একটা অভ্যাস আছে, কোন স্থানে যেতে হ'লে গন্তব্য জায়গায় পৌঁছিবার পূর্বে আমি কিছুতেই পথের মধ্যে বিশ্রাম করি নে। একবার বিশ্রাম ক'রতে ব'সলে আমি বড় অবসন্ন হ'য়ে পড়ি, আর পথচলা হয় না ; এই জন্যে আমি সর্বদাই সঙ্গীদের আগে আগে চ'লতাম। কখনো কখনো আমার সঙ্গীগণ আমার অনেক পিছনে প'ড়ে থাকতেন। আজ শরীর খুব দুর্বল থাকলেও সকলের আগে আগে হেঁটে বেলা আটটার সময় সাত মাইল দূরে 'শিবানন্দী' চটিতে পৌঁছলুম। আজ পথ চ'লে এত সকালে এখানে এসে সমস্ত দিন এখানে অপেক্ষা করবার কিছুমাত্র ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু আট মাইলের মধ্যে আর কোন চটি নেই, আর এই পার্বত্য-পথ ভেঙে সাত মাইল আসতেও পরিশ্রম কিছু কম হয় নি ; বিশেষ আমার পীড়িত সঙ্গীগণ এখন পর্যন্ত এ চটিতে এসে পৌঁছতে পারে নি ; হয়ত তাঁদের আরো দু-তিন ঘণ্টা দেরী হবে মনে ক'রে শিবানন্দী চটিতেই আশ্রয় নিলুম। বেলা বেশী হয় নি ; কিন্তু রোদের তেজ খুব প্রখর। পর্বতের ধূসর দেহ উদ্ভাসিত ক'রে সূর্যদেব পূর্ব গগনের অনেক ঊর্ধ্বে উঠেছেন এবং তাঁর উজ্জ্বল প্রভায় সমুচ্চ বৃক্ষরাজি হ'তে পথপ্রান্তস্থ নিতান্ত ক্ষুদ্র গুল্ম পর্যন্ত যেন খুব একটা সজীবতা অনুভব ক'চ্ছে।

আমি পথের মধ্যে একটা গাছের ছায়ায় ব'সে চারিদিক চেয়ে দেখতে লাগলুম। আমি যেন এ রাজ্যে একটিমাত্র প্রাণী, আর কোথাও জীবজন্তুর সম্পর্ক নেই ; যেন এই নির্জন প্রদেশে দিনের পর দিনগুলি অলসভাবে নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন অবস্থায় কেটে যাচ্ছে। এখানে এসে মনে হয় এ জায়গাগুলি পৃথিবীর নিতান্তই বিজন নেপথ্য ; মনুষ্যজীবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, বিপুল চেষ্টার সঙ্গে এদের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নেই। ব্যর্থ-মনোরথ হ'য়ে কেউ যে এখানকার পথিপ্রান্তে আপনার অবসন্ন জীবনের শেষসীমায় পৌঁছিয়েছে, কি প্রবলবিক্রমে এই দুর্ভেদ্য শিলাতলে আপনার গৌরবপতাকা প্রোথিত ক'রেছে, এখানে ব'সে তা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। তবু শিবানন্দী চটিতে মানুষের ক্ষুদ্র হস্তের অনেক কাজ এখনও দৃষ্টিগোচর হয় ; আর এই জন্যেই বোধ হয়, সকল চটি অপেক্ষা শিবানন্দী চটি বেশী মনোরম বোধ হয়েছিল।

যে সময়ে প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী অহল্যাবাই হরিদ্বার হ'তে বদরিকাশ্রমের এই রাস্তা অনেক অর্থব্যয়ে তৈয়েরি ক'রে দেন, সেই সময় তিনি এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্যে মোহিত হয়ে এখানে এক শিব প্রতিষ্ঠা করেন এবং অনেকগুলি কোঠাঘর প্রস্তুত ক'রে এই দুর্গম স্থানটিকে পথশ্রান্ত পথিকের যথেষ্ট বাসোপযোগী ক'রে দেন। সেই হ'তে এখানকার নাম শিবানন্দী হ'য়েছে। এখনো অসংখ্য ধর্ম-পিপাসু যাত্রী এই পথে যেতে যেতে রাণী অহল্যাবাইয়ের পবিত্র নামে জয়ধ্বনি করে, তাঁর আত্মার মঙ্গললোদ্দেশে আশীর্বাদ করে। তিনি কত দিন স্বর্গে চ'লে গিয়েছেন ; এমন দিন নেই, যে দিন এখানে তাঁর নাম ভক্তিভরে উচ্চারিত না হয়।

www.pathagar.com

সে অনেক কালের কথা—যখন শিবানন্দী চটি প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। জনশূন্য পর্বতের একটি জনশূন্য সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় একটি পবিত্র তুষার-ধবল দেবমন্দির, আর আশেপাশে ভক্ত যাত্রীদের জন্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশ্রামকক্ষ। কত দীর্ঘকাল ধরে কত পর্যটক এই পান্থনিবাসে তাঁহাদের পথশ্রম অপনীত ক'রেছে ; তাদের সুখ-দুঃখময়, সন্দেহ ও ভক্তিমিশ্রিত ক্ষুদ্র জীবনের অতীত কাহিনী এই সমস্ত অট্টালিকার চতুর্দিকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। যে ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে তারা এই দুর্গম পর্বতে সুদূর তীর্থযাত্রায় অগ্রসর হ'য়েছিল, জানি না, তাতে তাদের মনে কতখানি শান্তি প্রদান ক'রেছিল।

সেই প্রাচীন শিবানন্দী চটি এখনো আছে, কিন্তু পূর্বের সেই গৌরব এবং শোভা-সমৃদ্ধি আর নেই! অট্টালিকার অনেকগুলিই ভেঙে গিয়েছে ; যেগুলি এখনো একটু ভাল আছে, তাও বাসোপযোগী নয় ; তবে নিরুপায় যাত্রীর দল কোন রকমে এখানে এক রাত্রি কি দুই রাত্রি বাস করে, এবং রান্নাবান্না ক'রে খায় ; কিন্তু চটি ত্যাগ করবার সময় আর তা পরিষ্কার ক'রে যাওয়া দরকার মনে করে না। এইজন্যে সঙ্কীর্ণ ঘরগুলি ক্রমেই বেশী অপরিষ্কার হ'চ্ছে। এই অপরিষ্কার ঘরে আর একদল যাত্রীর খাওয়ার আয়োজন করতে গেলে, তারা যে কতখানি বিরক্তি বোধ করে, তা বলাই বাহুল্য ; তারাও উপায়ান্তর না দেখে একটুখানি জায়গা পরিষ্কার ক'রে নেয় এবং খাওয়া-দাওয়ার পর তা পরিষ্কার না ক'রেই চ'লে যায় ; সুতরাং আবর্জনার উপর আবর্জনা স্তূপাকার হ'য়ে উঠে।

শিবানন্দী চটির সম্মুখে পাথরে বাঁধানো বটগাছের তলে বসে এই সকল কথা ভাবছি ; পায়ের কাছ দিয়ে অলকানন্দা ললিত-তরল-গতিতে কুলকুল ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে এবং নদীজলে উজ্জ্বল সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হ'য়ে পাষাণময় উচ্চ উপকূল মনোরম ক'রে তুলেছে। এমন সময় শিবানন্দীর শিবের পূজারী ঠাকুর আমার কাছে উপস্থিত হ'লেন। শিব এবং পূজারী উভয়ের দূরবস্থাই সমান। শিবের এখন প্রত্যহ দুই বেলা দূরের কথা, এক বেলা পূজা জোটে কি না সন্দেহ! আমাদের দেশের দুর্গোৎসবের সময় ব্রাহ্মণেরা যদি চণ্ডীপাঠ করতে করতে একেবারে দুই তিন পৃষ্ঠা উল্টাইতে পারেন তবে এ নির্জন প্রদেশে শিব যে সপ্তাহান্তে একবার পূজা পাবেন, তার আর আশ্চর্য কি? পূজারীর সঙ্গে আলাপ করে জানলুম, এখানে তিনি সপরিবারেই আছেন। অনেকগুলি ছেলে মেয়ে ; সংসার এক রকম অচল, তাই তাঁকে পৌরোহিত্য ছাড়াও নানা রকমে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করতে হয়। মন্দিরের কাছে যে অল্প জমি আছে, তাতে মোটেই কিছু জন্মায় না, অন্য যে একটু আধটু জমি আছে, তাতে অল্প কয়েক কাঠা গম হয় ; কিন্তু তাতে সংসার চালানো দুষ্কর হয়। তাই তিনি অনেকগুলি ব্যবসা অবলম্বন ক'রেছেন। শিবানন্দীতে দোকান খুলেছেন ; যে কয়মাস যাত্রী চলে, সে কয়মাস কিছু কিছু উপায় হয়। দূরবর্তী গ্রাম হ'তে গম এনে ময়দা ও আটা প্রস্তুত ক'রে, রুদ্রপ্রয়াগ কি কর্ণপ্রয়াগে বেচে আসেন ; তিনি ছাগল পোষেণ, তাও বিক্রি করেন ; কিন্তু কিছুতেই বেচারীর কুলিয়ে উঠে না। এতগুলি কাজ যার হাতে তাকে দিয়ে নিত্য নিয়মিত শিবপূজার আশা দুরাশা মাত্র। আমাদের দেশের অনেক ঠাকুরবাড়ির পূজারী রাঁধুনী বামুন, তারা তাড়াতাড়ি পূজা শেষ ক'রেই রাঁধতে যায়, সুতরাং পূজা করবার সময় পূজার মন্ত্রের কথা তাদের মনে হয়, কি তরকারীর কথা মনে হয়, তা অনুমানসাধ্য। সুতরাং পর্বতবাসী এই দরিদ্র পুরোহিত যদি পূজার্চনায় অবহেলা প্রকাশ করে ত সে অপরাধ মার্জনীয়।

www.pathagar.com

প্রায় দু'ঘণ্টা পরে সঙ্গীরা এসে জুটলেন। কোন্ ঘরে চাট্টি খাওয়া-দাওয়া করা এবং একটু মাথা রাখবার জায়গা হ'তে পারে, তাই অনুসন্ধান করতে লাগলাম। বহু অনুসন্ধানে ঠিক নদীর উপরে একটা দ্বিতল কোঠা আবিষ্কার করা গেল। অন্যান্য ঘরগুলি অপেক্ষা এইটি একটু প্রশস্ত এবং পরিষ্কার। আমরা সেখানেই আড্ডা ফেল্লুম। আজ সকালে সঙ্গী ভৃত্যটিকে বলেছিলাম যে, যদি তার শরীর অসুস্থ বোধ হয় ত আজও আমরা রুদ্রপ্রয়াগে থাকি ; কিন্তু সে বোধহয় আমাদের অসুবিধা ভেবে নিজের প্রকৃত অবস্থা গোপন ক'রে চলতে চেয়েছিল। এই সাত মাইল রাস্তা এসে সে একেবারে হাঁপিয়ে প'ড়লো,—না পারে উঠতে না পারে ব'সতে। রুদ্রপ্রয়াগে অনেক বিলম্ব হ'য়ে গেল, এখানে ভৃত্যটির এই রকম অবস্থা ; এখানেই বা আর কয়দিন বিলম্ব হবে ভেবে বৈদান্তিক ভায়া বড়ই বিরক্ত হ'লেন। হায় মায়াবাদী বৈদান্তিক! তোমার এই মায়াবাদ কি স্বার্থপরতার নামান্তর মাত্র! তুমি দুঃখ-দারিদ্র্য পদদলিত ক'রে তীর্থস্থানে যেতে চাও, দরিদ্র প্রজার সর্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে কাশীতে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করতে চাও ; ভগবানের অজস্র করুণা ও চিরন্তনের মঙ্গলেচ্ছাকে ত্যাগ ক'রে বৈরাগ্যের হৃদয়হীনতাকেই সার পদার্থ ব'লে মনে কর। সকলে তোমার মত হ'লে পৃথিবী এতদিন শ্মশান হতো। অথবা তোমারই বা দোষ কি, আমাদের দেশের অনেক সাধুপুরুষের বৈরাগ্যই তোমার মত। তোমরা পিতামাতার গভীর স্নেহ উপেক্ষা কর, পত্নীর ব্যাকুল প্রেম-বন্ধন ছিন্ন কর। সে অতি কঠিন কাজ সন্দেহ নেই ; কিন্তু তোমাদের এই ব্রত সার্থক হ'তো যদি তোমরা তোমাদের এই ক্ষুদ্র প্রেম প্রসারিত ক'রতে পারতে ; পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ছেড়ে যদি পৃথিবীর লোককে আপনার করতে পারতে। কিন্তু তাও পারলে না এবং যা অল্প প্রেম তোমাদের ঐ রুদ্ধ নয়ন আলো ক'রে ছিল, তা চিরদিনের জন্যে নিবিয়ে ফেল্লে।—আমার মনের কথা মনেই রাখলাম, বৈদান্তিককে বলা আর আবশ্যক বোধ করলাম না ; শুধু বললাম, বদরিনারায়ণ যাওয়া হ'ক আর নাই হ'ক এই রোগীর পাশে অনাহারে মরি, তাতেও আপত্তি নেই, কিন্তু এরকম হৃদয়হীনতা দেখিয়ে চ'লে যেতে পারবো না। স্বামীজিও অবশ্যই আমার মতে মত দিলেন।

বৈদান্তিক ভায়া অবশেষে বিরক্ত হ'য়ে আমাদের ছেড়ে যাবার উদ্যোগ কল্লেন। আমি তাঁকে পথ-খরচের জন্য চার পাঁচ টাকা দিতে চাইলাম কিন্তু তিনি তা নিলেন না। আমি তাঁকে অনেক বুঝালাম,—বললাম এ ভয়ানক পথে বিনা সম্বলে চলতে নেই, চারিদিকে দুর্ভিক্ষ। এদিকে আসতে প্রায় সকলেই সঙ্গে কিছু অর্থ নিয়ে আসে। যারা বিনা সম্বলে আসে তারা হরিদ্বারে হৃষীকেশে ব'সে থাকে। কোন ধনী শ্রেষ্ঠী বদরীনারায়ণ দর্শন করতে এলে তিনি এই রকম সম্বলহীন একশ দুইশ—এমন কি তিনশ পর্যন্ত সাধুকে নিজব্যয়ে নারায়ণ দর্শন করান। প্রতি বৎসরই পশ্চিম দেশ হ'তে পনের জন শ্রেষ্ঠী এই রকম তীর্থযাত্রা করেন।

বৈদান্তিক আমাদের উপর বিরক্ত হ'য়ে চ'লে গেলেন। যাওয়ার সময় সঙ্গে নিলেন একটা কল্‌কে, কিন্তু শুধু কল্‌কে ত আর কারো কাজে লাগে না ; কাজেই তাঁর কিছু তামাকের দরকার! তাঁর কাছে তামাক ছিল না, লজ্জায় আমাকেও সে কথা ব'লতে পাচ্ছিলেন না, কিন্তু আমি তাঁর বিপদ বুঝে একটা দোকান থেকে এক সের মাখা তামাক কিনে দিলুম। যাওয়ার সময় বোধ হয় আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন ব'লে তাঁর একটু লজ্জা হ'য়েছিল ; তাই বেশী কিছু বলতে পাল্লেন না। লোকটা নিতান্ত যখন চ'লে যাচ্ছে, আমার

www.pathagar.com

তার প্রতি একটু মায়া হ'লো—এতদিন একসঙ্গে থাকা গিয়েছিল।—আমি তাহার হাত ধরে বল্লুম, "কত সময় কত অন্যায় কথা ব'লেছি ; আমার জন্য কত কষ্ট সহ্য ক'রেছেন, সেজন্য কিছু মনে ক'রবেন না। আবার কতকালে দেখা হবে কি না, কে জানে?" তিনি চ'লে যাওয়াতে আমার বড়ই কষ্ট হ'তে লাগলো, কয়দিন একসঙ্গে দু'জনে বেশ ছিলাম। পথশ্রমের পর অনেকে হাত-পা ছড়িয়ে নিদ্রা দিয়ে সুখ ও আরাম পান, কিন্তু আমি এই বৈদান্তিকের সঙ্গে আজগুবী তর্ক ক'রে পথশ্রম দূর করতাম।

বৈদান্তিক চ'ল গেলে আমরা সেইখানেই থাকলাম। সন্ধ্যার সময় আমাদের চাকরটির জ্বর ছাড়লো এবং সে বেশ স্বচ্ছন্দভাবে উঠে বেড়াতে লাগলো। আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় বেশ বুঝতে পাল্লুম যে, পর্বতবাসীরা রোগে বিশেষ কাতর হয় না, তবে তাদের জ্বর যে রকম ভয়ানক হয়, তাতে তারা কাতর না হ'লেও আমরা কাতর হই। রাত্রে সে খুব আহার ক'রলে।

২১এ মে, বৃহস্পতিবার।—সকালে উঠে দেখি চাকর যাত্রার জন্যে তৈয়েরি হ'য়ে ব'সে আছে। আমি তাকে বল্লুম, তার অসুখ একটু ভাল ক'রে না সারলে পথশ্রমে সে মারা পড়বে, কিন্তু বোধ হয় তার মনে হ'য়েছিল, তারই জন্যে বৈদান্তিক আমাদের ছেড়ে গেলেন। তাই সে যাওয়ার জন্যে কৃতসঙ্কল্প হ'লো। রাস্তা অপেক্ষাকৃত ভাল, কিন্তু আট মাইলের মধ্যে আর চটি নেই, কাজেই আমরা তাড়াতাড়ি ক'রে চলতে লাগলাম এবং দুপুরের সময় পিপলচটিতে উপস্থিত হ'লাম। একটা বটগাছ আছে, তারই নাম অনুসারে চটির নাম "পিপলচটি"।

এখানে একটা গবর্ণমেণ্টের ধর্মশালা আছে; কিন্তু পিপলচটির মত কদর্য স্থান আর দেখি নাই। আমরা এখানে এসে দেখলাম, এখানে অনেক যাত্রী একত্র হয়েছে। আমরা কয়টি প্রাণীও তাদের সঙ্গে মিশে যাত্রীসংখ্যার বৃদ্ধি কোল্লুম।

একটা কথা বল্‌তে ভুল হ'য়ে গিয়েছে। আমরা যখন পিপলচটির কাছাকাছি এসেছি, সেই সময় দেখি বৈদান্তিক ভায়া শিবানন্দীর দিকে ফিরে যাচ্ছেন। তাঁকে দেখে আমার এমনি আনন্দ হ'লো আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধোল্লাম। তিনি বোল্লেন, "ভাই, তোমাদের ছেড়ে গিয়ে আমি কাজ ভাল করি নি—তোমাদের মনে ত কষ্ট দিয়েছি, তা ছাড়া নিজে যে কষ্ট ভোগ করেছি, তার আর কি ব'লবো ; শুনলে তোমাদের ছেড়ে যাওয়ার জন্যে আমার অপরাধ মাপ ক'রবে।" আমরা পিপলচটিতে উপস্থিত হ'য়ে তাঁর কথা শুনতে লাগলুম। তিনি বল্লেন যে, রাত্রে তাঁর কিছু খাওয়া হয় নি ; চার পাঁচ দল যাত্রী পিপলচটিতে রাত্রিবাস ক'রেছিল বটে, কিন্তু কেউ তাঁকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করেনি। সমস্ত রাত্রি অনাহার, তার পর রাত্রিতে মাছির উৎপাতে অনিদ্রা। রাত্রিতে নাকি দশ-বারো হাজার মাছি তাঁকে অস্থির ক'রে তুলেছিল। সকালে উঠে ক্ষুধার প্রকোপটা আরো খানিক বৃদ্ধি হয়েছিল, এবং উপায়ান্তর না দেখে তিনি দুই একজনের কাছে ভিক্ষাও চেয়েছিলেন। ; কিন্তু এ বড় কঠিন পথ ; সকলেই প্রায় ভিক্ষুক, তাঁকে কে ভিক্ষা দেবে? তখন অনন্যগতি হ'য়ে তাঁর সঙ্গে যে তামাক ছিল, তাই একটা দোকানে দিয়ে তার বদলে অল্প চানাভাজা ও একটা পাকা কাঁচকলা নিয়ে জঠরানল যৎকিঞ্চিৎ নিবৃত্তি ক'রেছিলেন। কিন্তু ক্রমে যতই বেলা বাড়তে লাগলো, ততই তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণায় অন্ধকার দেখতে লাগলেন ; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাছে ফিরে যাবার ইচ্ছে তাঁর প্রবল হ'য়ে উঠলো

www.pathagar.com

এবং আমরা হয়তো আজ শিবানন্দী চটিতেই থাকবো মনে ক'রে তিনি আমাদের কাছে ফিরে যাচ্ছিলেন ; পথে আমাদের সঙ্গে দেখা। তাঁর কষ্টের কথা শুনে আমার বড়ই দুঃখ হ'লো।

বৈদান্তিক বলেছিলেন, রাত্রে দশ-বারো হাজার মাছি তাঁকে অস্থির ক'রে তুলেছিল। পিপলচটিতে এসে মাছির আতিশয্য ও উৎপাত দেখে আমার এ কথাটা অসম্ভব ব'লে মনে হ'লো না। এত মাছি আর কোথাও দেখি নি। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অনেক জায়গায় মাছির বংশবৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এত বেশী নয়। এরা মানুষকে একেবারে পাগল ক'রে তোলে। মাছির জ্বালায় আমাদের ধর্মশালায় বাস অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। কোন রকমে এখানে দু'তিন ঘণ্টা কাটানো গেল।

রুদ্রপ্রয়াগ হ'তে অলকানন্দার অপর পার দিয়ে যে নূতন পথ বের হয়েছে, তা এখানে শেষ হ'লো। এখানে একটা টানা সাঁকো দিয়ে রাস্তাটাকে এ পারের রাস্তার সঙ্গে যোগ ক'রে দেওয়া হ'য়েছে।

বৃদ্ধ স্বামীজি খানিক বিশ্রাম করবার আশায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে প'ড়েছিলেন, কিন্তু তাতেও মাছির হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। কম্বলের যে এক-আধটু ফাঁক ছিল তারি মধ্য দিয়ে গিয়ে তারা তাঁকে আক্রমণ করতে লাগলো। এই দারুণ পথশ্রমের পর কোথায় একটু আরাম ক'রবো, না মাছির জ্বালায় অস্থির হ'য়ে পড়লুম। শেষে যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় বেলা তিনটে না বাজতেই পিপলচটি হ'তে বের হওয়া গেল।

কিছুদূর যেতে না যেতেই আকাশে অল্প অল্প মেঘ দেখা গেল ; আমরা প্রথমে সেদিকে বড় লক্ষ্য কল্লুম না, কিন্তু মেঘ ক্রমে সমস্ত আকাশ ঢেকে ফেল্লে ; চারিদিক খুব অন্ধকার হ'য়ে এলো, এবং একটু পরেই বেশ বাতাস উঠলো। ঝড়জলে রাস্তায় বিপদে পড়া অসম্ভব নয় ভেবে স্বামীজি নিকটস্থ একটা গহ্বরে আশ্রয় নিতে ব'ল্লেন, কিন্তু বৈদান্তিক ভায়ার সবই উল্টো। যা কিছু ভাল যুক্তি, তিনি তার মধ্যে নেই। তাঁর পন্থা সকল কাজেই স্বতন্ত্র, এমন কি বিপদের সময়ও। তিনি বল্লেন, যখন বাতাস উঠেছে, তখন মেঘ এখনি উড়ে যাবে। এমন সামান্য সামান্য কারণে পথচলা বন্ধ করা কোন কাজের কথা নয়।

কাজেই আমরা অগ্রসর হ'লাম। রাস্তায় জনমানবের সাড়া-শব্দ নেই। আকাশের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হ'তে লাগলো। কিন্তু নিকটে আর আশ্রয় মিলবার উপায় নেই। যে দুই একটা গুহায় আশ্রয় নেওয়া যেতে পারতো, তা পিছনে ফেলে এসেছি। বড় গাছও নেই। আমরা যে পাহাড়ের উপর দিয়ে যাচ্ছি, তার গাছগুলি ছোট ছোট, কোন দিকে একটাও বড় গাছ নজরে পড়ে না।

ক্রমেই বাতাস বেশী হ'তে লাগলো, শেষে রীতিমত ঝড় আরম্ভ হ'লো। প্রতি মুহূর্তেই মনে হ'তে লাগলো, পর্বতশৃঙ্গ বুঝি মাথার উপর ভেঙে পড়ে। আকাশ অন্ধকার, আর শন্ শন্ শব্দ ; আমরা চারিটি প্রাণী সেই প্রলয় কাণ্ডের ভিতর দিয়ে চলছি, পদস্খলন হ'য়ে নীচে পড়বার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। খানিক পরেই অল্প অল্প বৃষ্টি প'ড়তে লাগলো, আমরাও প্রাণের দায়ে যতদূর সাধ্য দ্রুতপদে আশ্রয়ের সন্ধানে চলতে লাগলাম। কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি বন্ধ হ'য়ে মুষলধারে শিলাপাত আরম্ভ হ'লো ; তখন আমরা হতাশ হ'য়ে পড়লুম। এই পার্বত্য দেশে যে রকম বড় বড় শিলাবর্ষণ হয়, আমাদের সমতল প্রদেশের লোকদের তা বুঝিয়ে উঠা যায় না। এক একটা শিলা এক একটা বেলের

www.pathagar.com

মত ; সুতরাং তা মাথায় পড়া দূরের কথা, শরীরে পড়লে শরীরের কি রকম দুর্দশা হ'তে পারে তা কল্পনায় উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন নয়। আমরা উপায়ান্তর না দেখে তাড়াতাড়ি পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিলাম, কিন্তু তাতে মাথা বাঁচানো কঠিন দেখে কম্বলখানায় কয়েক ভাঁজ দিয়ে মাথা ও মুখ ঢেকে রাখলাম। গায়ের উপর দুই একটা শিল প'ড়তে লাগলো, এবং তাতে আমাদের অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলল ; কিন্তু উপায়ান্তর নেই ; তবু আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, মাথাটা কোন রকমে রক্ষা হ'লো ; কিন্তু বোধ হতে লাগলো, শীতে বুঝি বুকের রক্ত জমে যায়।

শিলাবৃষ্টি ছেড়ে গেলে আমরা আবার উঠলাম। দেখতে দেখতে আকাশ বেশ পরিষ্কার হ'য়ে গেল, এমন কি শেষে রোদও উঠলো। সেই সান্ধ্যতপনের কনককিরণসিক্ত পার্বত্য প্রকৃতি এক আশ্চর্য শোভা ধারণ ক'রেছিল। ছোট ছোট গাছগুলি হ'তে টোপে টোপে বৃষ্টি প'ড়ছে ; পাহাড়ে গা বেয়ে নানা জায়গা হ'তে নালা বের হয়ে হু-হু শব্দে নীচের দিকে যাচ্ছে ; আর আকাশ পরিষ্কার দেখে পাখীর দল আনন্দের সঙ্গে কলরব কচ্ছে এবং ভিজে পাখা ঝেড়ে ফেলছে ;—এ দৃশ্য অতি সুন্দর। কিন্তু ভিজে কম্বল সর্বাঙ্গে জড়িয়ে এক-গা বেদনা নিয়ে পথ চ'লতে চ'লতে আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করবার অবসর হয় নি। পাহাড়ে চ'লতে চ'লতে আমরা এই পাহাড়ী প্রদেশের একটা বৈচিত্র্য বেশ লক্ষ্য করেছি। কোথাও কিছু নেই ; দেখতে দেখতে আকাশ মেঘে ঢেকে গেল, চারিদিক অন্ধকার ক'রে তুমুল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হ'লো ; তার পরেই দশ মিনিটের মধ্যেই সব পরিষ্কার! এই বৃষ্টি, এই রোদ। আমাদের দেশের প্রকৃতির এমনতর চাঞ্চল্য প্রায়ই দেখা যায় না।

পিপলচটি হ'তে কর্ণপ্রয়াগ পর্যন্ত রাস্তা সবে তিন মাইল মাত্র কিন্তু এই তিন মাইল আসতেই একেবারে আমাদের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ! একে ঝড়বৃষ্টি, শিলাপাত, তার উপর রাস্তা আগাগোড়া চড়াই ; সে চড়াইও এক এক জায়গায় ঠিক সোজা। একে ত সহজ অবস্থাতেই তা বেয়ে উপরে উঠা কঠিন, তার পর বৃষ্টি হ'য়ে পাথর ভিজে গিয়েছে ; অত্যন্ত সাবধানে ধীরে ধীরে পা ফেলে আমাদের চ'লতে হ'ল। বেলা প্রায় তিনটের সময় পিপলচটি হ'তে বের হয়ে এই তিন মাইল পথ অতিক্রম ক'রে শীতে কাঁপতে কাঁপতে যখন কর্ণপ্রয়াগে উপস্থিত হলাম তখন বোধ হয় বেলা ছয়টা। একটা মাটির কোঠার দ্বিতলে বাসা নেওয়া গেল।

www.pathagar.com

কর্ণপ্রয়াগ

২২এ মে, শুক্রবার।—কোন দুই নদীর সঙ্গম না হ'লে প্রয়াগ হয় না। কর্ণপ্রয়াগে দুই নদীর সঙ্গম হ'য়েছে ; একটি অলকানন্দা, অপরটি কর্ণগঙ্গা। কর্ণগঙ্গাকে ঠিক নদী বলা যায় না, এ একটি বড় রকমের বেগবতী ঝরণা মাত্র। এখানে নদীর মত স্রোত ব'য়ে জল আসে না। নদীর পরিসর দেড়শ' হাত, কি কিছু বেশী হবে ; কিন্তু তার অনেক জায়গাই শুকিয়ে গিয়েছে। যেখানে সাঁকো তৈয়েরি হ'য়েছে তার নীচে বড় বড় জলধারা। পাহাড়ে খুব বৃষ্টি হ'লে হু হু শব্দে জল নেমে সমস্ত ডুবে যায়। এই নদীর নাম কর্ণগঙ্গা কেন হ'লো, তার একটা সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ এখানকার পাণ্ডাদের মুখে শুনতে পাওয়া যায়। মহাবীর কর্ণ কিছুকাল এখানে তপস্যা করেন। মধ্যে একদিন তার অবগাহনেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হ'য়ে উঠে, এবং কিরূপে ইচ্ছা কার্যে পরিণত হয়, সেই চিন্তাতেই তিনি কিছু ব্যস্ত হয়ে পড়েন ; কিন্তু তপোবলে তিনি দেবতাদের এত বাধ্য ক'রে রেখেছিলেন যে, প্রয়াগে স্নান করবার জন্যে তাঁকে আর কোথাও যেতে হ'লো না। পতিতপাবনী গঙ্গা সেখানেই এসে অলকানন্দার সঙ্গে মিশলেন কর্ণের ক্ষুদ্র কুটীরদ্বারে প্রয়াগ হ'লো; কর্ণজী সেই সঙ্গমস্থলে স্নান ক'রে দেহ শীতল ও পবিত্র ক'ল্লেন। সেই থেকে এ নদীর নাম কর্ণগঙ্গা হ'য়েছে। পর্বতবাসী সরলচেতা বিশ্বস্তহৃদয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যখন এই পুরাণ-কাহিনী গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে আমার কাছে বিবৃত ক'ল্লে, তখন এমন একটা ভক্তি ও নির্ভরের ভাবে তার উদার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো যে তা দেখে আমার মনেও খুব আনন্দ হ'লো। শেষে গল্পের উপসংহারকালে যখন ব'ল্লে "বাবুজি এইসা কাম ভগবান ভকত কি ওয়াস্তে হর ওয়াক্ত করতে হেঁ"—এবং সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কল্লে, তখন বোধ হ'লো, ব্রাহ্মণ একালের অভক্তি ও বিশ্বাসহীনতা মনে ক'রেই খানিকটে হতাশ হ'য়ে প'ড়েছে। বাস্তবিকই "এইসা কাম ভগবান ভকতকা ওয়াস্তে হর ওয়াক্ত করতে হেঁ"--এটা তার প্রাণের কথা ; যুক্তি-তর্কের জঞ্জাল হ'তে অনেক দূরে থেকে, এই রকম একটা কথার উপর নির্ভর ক'রে এরা কত শান্তি ও সান্ত্বনা উপভোগ করে। আমাদের সরল বিশ্বাসটুকু অন্তর্হিত হ'য়েছে ; সঙ্গে সঙ্গে আমরা মনের শান্তিটুকুও হারিয়েছি!

আজ কর্ণপ্রয়াগে অবস্থান করা যাবে স্থির করা গেল। বাজারের মধ্যে একটা দোকানঘরের উপরতলায় আমরা বাসা নিলুম। বাজারে দোকান খুব বেশী নয় ; তবে মোটামুটি জিনিস এখানে প্রায় সবই পাওয়া যায়, এমন কি একখানা দোকানে ছানারমুড়কিও পাওয়া গেল। দোকানগুলি সমস্তই পাহাড়ের গায়ে। আমরা যে দোকানে বাসা নিয়েছিলুম, তার ভিতরের দিক থেকে ঊর্ধ্বে পাহাড়ের গায়ে একটা সুন্দর কোঠাবাড়ি দেখলাম, বাড়িটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমার প্রথমে মনে হ'য়েছিল এ বুঝি কোনও ইংরেজের বাসস্থান, কিন্তু পরে জানতে পাল্লুম এটি "দাতব্য চিকিৎসালয়"। এই দুর্গম পাহাড়ের মধ্যে রোগীর চিকিৎসা ও সেবার জন্য গবর্ণমেণ্ট এই ডাক্তারখানা তৈয়েরি ক'রে দিয়েছেন, এতে যে কত যাত্রীর উপকার হয় তার সংখ্যা নেই। ডাক্তারখানা বারোমাসই খোলা থাকে, কিন্তু বছরের সকল সময় এখানে রোগী দেখা যায় না। তীর্থভ্রমণোপলক্ষে এই সময়ই কিছু বেশী রোগীর আমদানী হয়। একবার ডাক্তারখানাটা দেখতে যাব ইচ্ছে ক'ল্লুম, কিন্তু সকালে আর ঘটে উঠলো না ; চাকরটাকে চিকিৎসার

www.pathagar.com

জন্যে পাঠিয়ে দিলুন, খানিক পরে সে কয়েকটা কুইনাইনের বড়ি নিয়ে ফিরে এলো।

আমাদের দেশ হ'তে বদরিকাশ্রমে যেতে হ'লে হরিদ্বারের পথে কেউ চলে না। বাঙ্গালা, বিহার, কি উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার লোক এখন অন্য একটা ভাল রাস্তা পেয়েছে। হাওড়া থেকে যে গাড়ী দিল্লী যায়, সেই গাড়ীতে চড়ে কাশীর যাত্রীদের আগে মোগলসরাই নামতে হ'তো। সেখান হতে গঙ্গা পার হ'লেই কাশী। এখন আর মোগলসরাই নেমে নৌকায় গঙ্গা পার হ'য়ে কাশী দর্শন করতে হয় না ; অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে মোগলসরাই থেকে বের হ'য়েছে, এবং কাশীর নীচেই প্রকাণ্ড পুল হ'য়েছে ; তাই পার হ'য়ে রাজঘাট স্টেশনে নেমে গাড়ী বা নৌকায় লোকে কাশী যায়। কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির সেখান হ'তে প্রায় এক মাইল হবে। তার পরেই "বেনারস সিটী স্টেশন"। অফিস আদালত সাহেবপাড়া সমস্তই সিকরোলের কাছে। এই সিকরোলের ভিতর দিয়ে অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড-রেলওয়ে বরাবর চ'লে গিয়েছে এবং অযোধ্যা পার হ'য়ে লক্ষ্ণৌ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে একেবারে সাহারাণপুরে গিয়ে উত্তর-পশ্চিম রেলওয়ের সঙ্গে মিশেছে। এই অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড রেলওয়েতে বেরেলীর একটা শাখা রেলওয়ে আছে। কাঠগুদাম পর্যন্ত সোজা উত্তরেও একটা শাখা রেলওয়ে আছে। কাঠগুদামে নেমে আলমোড়ার মধ্য দিয়ে হাঁটাপথ পাওয়া যায়। এ পথটাও মন্দ নয়। এই পথ দিয়ে চলে এসে কর্ণপ্রয়াগে বদরিনারায়ণের রাস্তায় প'ড়তে হয়। এখান হতে যারা পরিক্রমণ ক'রবে অর্থাৎ প্রথমে কেদারনাথ দর্শন ক'রে তার পর বদরিকাশ্রমে যাবে, তারা কর্ণপ্রয়াগ হ'তে নীচে নেমে রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত যায় ; এবং সেখান হ'তে কেদারের পথে চ'লে যায়, কেদার দর্শন ক'রে আর সে পথে ফেরে না। সেই জায়গা হ'তে আর একটা পথ এসে লালসাঙ্গা নামক একটা জায়গায় বদরিকাশ্রমের রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। যারা এ পথ ধ'রে যায়, তাদের শ্রীনগর কি দেবপ্রয়াগ দেখা হয় না।

আমরা কর্ণপ্রয়াগের সাঁকো পার হ'য়ে অপর পারে সঙ্গমস্থলে স্নান ক'ল্লুম। শীতের ভয়ে রাস্তায় আমি স্নানকে যতদূর সম্ভব পরিহার ক'রেছিলাম ; কিন্তু এখানে এসে যদি নিদেন একটা ডুবও না দিয়ে এ জায়গাটা ছেড়ে যাই, তা হ'লে কাজটা বড়ই খারাপ দেখাবে ; আর যাই হোক, যমের কাছে ন্যায়সঙ্গত কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারবো না। অতএব অনেক আয়োজনের পর স্নান করা গেল। জল দারুণ ঠাণ্ডা, তবু এখন জ্যৈষ্ঠমাস। শীতকালে কি অবস্থা হয়, তা কল্পনাতেও আনতে পারা যায় না।

সঙ্গমস্থলের উপরেই কর্ণবীরের এক প্রকাণ্ড জীর্ণ মন্দির। মহাবীর কর্ণ দ্বাপরের লোক, অন্ততঃ তাঁর ক্রিয়াকাণ্ড দ্বাপর ও কলির সন্ধিস্থলেই ঘটেছিল ; কিন্তু এ মন্দির দ্বাপরযুগের চেয়ে আধুনিক ব'লে বোধ হ'ল না। এ পর্যন্ত যে সকল পতচনান্মুখ জীর্ণ মন্দির দেখেছি, তাদের যে কেউ সংস্কার করাবে, সে আশা কিছুমাত্র নেই, সুতরাং সে সমস্ত মন্দিরের অধিকাংশই দু'পাঁচ বৎসরের মধ্যেই ভূমিসাৎ হবে, এমন সম্ভাবনা দেখা যায়। এই কর্ণের মন্দিরেরও সে সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। মন্দিরের পুরোহিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কিন্তু এর দায়িত্বের প্রতি অগাধ বিশ্বাস। তিনি বোল্লেন যে তাঁর বাল্যকাল হ'তে মন্দিরের এ অবস্থা তিনি দেখে আসছেন—যতটুকু ফাটা ছিল, এই দীর্ঘকালে তার আধইঞ্চি বেশীও বাড়ে নি। মন্দিরটি পাথরের, চৌকাঠও পাথরের, দ্বার লোহার। মন্দিরের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা ঘণ্টা ঝুলান আছে, সেই ঘণ্টাটি নেড়ে যাত্রীদের মন্দিরে প্রবেশ ক'রতে হয়। ঘণ্টা নাড়া যদি অবশ্য কর্তব্য হয়, তা হ'লে আমি আমার ম্যালেরিয়াগ্রস্ত যকৃৎ-প্লীহাধারী

www.pathagar.com

বঙ্গীয় ভ্রাতাদের সাবধান ক'রচি, তাঁরা যেন এই মন্দিরের প্রবেশ করবার দুঃসাহস প্রকাশ না করেন। যা হোক, আমি বহুকষ্টে মন্দিরে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছিলুম।

মন্দিরের মধ্যে মহাবীর কর্ণ ও তাঁর মহিষীর মূর্তি বর্তমান। মূর্তি প্রস্তরনির্মিত, খুব পুরানো ; তাতে কিন্তু শিল্পীর ভাস্কর-বিদ্যার যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। বহুমূল্য অলঙ্কারাদি কিছুই নেই ; শুনা গেল পূর্বে ছিল, নেপালযুদ্ধের সময় তা অপহৃত হ'য়েছে। বীরবরের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। যাত্রীদের কাছ থেকে যা কিছু পাওয়া যায়, তারই উপর তাঁকে ও তাঁর পুরোহিতকে নির্ভর ক'রতে হয়। যাত্রীরা অনেকে সঙ্গমস্থলে শ্রাদ্ধতর্পণাদি করে, তাতে পুরোহিত ঠাকুরের অল্পবিস্তর লাভ হয়।

কর্ণপ্রয়াগে অধিবাসীর সংখ্যা বেশী নয়। সকলেই বড় গরীব, অতি কষ্টে দিনপাত করে। আমাদের দেশের আউটপোস্টের মত এখানে একটা ছোট থানা আছে। থানায় হেডকনেস্টবল ও চার-পাঁচজন কনেস্টবল আছে, কনেস্টবলেরা রাত্রে চৌকি দেয়। আমাদের দেশের কনেস্টবল ও এখানকার কনেস্টবলে কিছুই তফাৎ দেখলাম না। আমাদের দেশের প্রভুদের মত এরাও শিষ্টের দমন ও দুষ্টের পালন ক'রে থাকেন, এবং দু'পয়সা লাভের আশায় একজন নিরীহ ব্যক্তির সর্বনাশ ক'রতে কিছুমাত্র আপত্তি বোধ করেন না। এখানকার কনেস্টবলদের যে রকম মেজাজ দেখা গেল, তাতে যে তাঁরা কষ্ট স্বীকার ক'রে প্রতি রাত্রিতে চৌকি দেয় এমন বোধ হ'লো না ; তবে আমরা এখানে যে দুরাত্রি ছিলুম, সে দু'রাত্রিতেই এদের হাঁক দু'তিনবার ক'রে শুনেছিলুম। পাঠক মহাশয় অনুগ্রহ ক'রে মনে করবেন না যে, তাঁরা আমাদের চোর বিবেচনা ক'রে এতখানি সতর্কতা অবলম্বন ক'রেছিলেন। তাঁরা যদি সেই সিদ্ধান্ত ক'রে এ রকম সতর্ক হ'তেন, তবে তাঁদের প্রশংসা করবার কারণ ছিল ; কিন্তু তাঁরা এতখানি সতর্ক হ'য়েছিলেন তার কারণ, সেদিন ঐ বিভাগের পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর পরিদর্শন উপলক্ষে এখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে একটু কার্যপটুতা দেখানো এঁরা অনাবশ্যক ব'লে মনে করেননি।

অপরাহ্ণে একাকীই ডাক্তারখানা দেখতে গেলুম। ডাক্তারবাবুটি নূতন লোক, সবে তিন দিন হ'লো এখানে এসেছেন। এই অশিক্ষিত লোকের মধ্যে নিঃসঙ্গ প্রবাসে তাঁর দিন যে কেমন ক'রে কাটছে, তা আমি ঠিক ক'রে উঠতে পাল্লুম না। এই তিন দিন একা থেকে বোধ হলো তিনি খানিকটা দমে গিয়েছেন। তাঁর কাছে যেতেই তিনি আমাকে মহাসমাদরে গ্রহণ ক'ল্লেন। দুই-একটা কথাতেই বুঝলুম, লোকটি বড় বিনয়ী। ডাক্তারবাবুর বয়স ত্রিশ বৎসরেরও কম ব'লে বোধ হ'লো। এঁর বাড়ি মুরাদাবাদের কাছে একটি গ্রামে, লাহোর মেডিকেল স্কুল থেকে ডাক্তারী পাশ ক'রেছেন ; আজ সাত বছর গবর্ণমেণ্টের চাকুরি ক'চ্ছেন। ইংরেজী ভাল না জানলেও কথাবার্তা চলনসই বলতে পারেন। আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ইংরাজীতেই আলাপ ক'ল্লেন ; শেষে যখন আমার মুখে শুনলেন যে, আমি অনেকদিন থেকে পশ্চিমাঞ্চলে আছি, তখন ইংরেজী ছেড়ে হিন্দুস্থানীতে কথা আরম্ভ ক'ল্লেন।

খানিক পরে তাঁর সঙ্গে হাসপাতাল দেখতে গেলুম। সেদিন সেখানে দশ-বারো জন রোগী ছিল, তার মধ্যে একজনও বাঙ্গালী দেখা গেল না। রোগীদের উপর ডাক্তারবাবুর বড় যত্ন। শুধু কর্তব্য ব'লে যে তাঁর যত্ন তা বোধ হলো না ; বাস্তবিক তাদের জন্য তাঁর প্রাণের আগ্রহ দেখা গেল।

www.pathagar.com

হাসপাতাল দেখা হ'লে পুনর্বার তাঁর বিশ্রামকক্ষে এসে বসলাম। তাঁর টেবিলের উপর তিন-চারখানা খবরের কাগজ দেখলুম, তার মধ্যে লাহোরের Tribune ও কলিকাতার অমৃতবাজার পত্রিকা ছিল। অনেকদিন পরে অমৃতবাজার হাতে পড়ায় মনে বড় আনন্দ হ'লো। এই দুর্গম পাহাড়ের মধ্যেও অমৃতবাজার আসে! আমাদের দেশের কাগজের এ রকম বিস্তৃতি লক্ষ্য ক'রে মনের মধ্যে একটু অহঙ্কারও জন্মালো। অমৃতবাজার সম্পাদক মহাশয়ের উপর ডাক্তারবাবুর গভীর ভক্তি ; তিনি তাঁকে এতদূর উচ্চ মনে করেন যে অনায়াসে আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "Is there any like him in Bengal?" আমি উত্তরে তাঁকে বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ সেনের নাম বল্লুম। সুরেন্দ্রবাবুর বক্তৃতা তিনি লাহোরে একবার শুনেছিলেন, তাঁকে "Prophet of India" ব'লে উল্লেখ ক'ল্লেন, আমি যে সুরেন্দ্রবাবুর নাম কল্লুম, তিনি সেই বক্তা সুরেন্দ্রবাবু কিনা। আমি উত্তর দিলে তিনি বল্লেন, সুরেন্দ্রবাবু যে সংবাদপত্রের সম্পাদক, তা তিনি ইতিপূর্বে জানতেন না। যাহোক আমার কাছ থেকে তিনি বেঙ্গলী ও মিররের ঠিকানা লিখে নিলেন এবং ব'ল্লেন তিনি শীঘ্রই স্থানান্তরে বদলী হবেন, সেখানে গিয়েই এই পত্রিকা দু'খানা নেবেন।

আমাদের কথাবার্তা হ'চ্চে, এমন সময় আর একটি ভদ্র যুবক সেখানে উপস্থিত হ'লেন। ডাক্তারবাবু তাঁকে সমাদর ক'রে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। ইনিই পূর্বকথিত পুলিশ ইনস্পেক্টর। এঁর বাড়ি আম্বালায়, লাহোর কলেজে বি.এ পর্যন্ত প'ড়েছিলেন। কথাবার্তায় যতদূর বুঝলুম, দেখলুম লোকটির বেশ পড়াশুনা আছে। আমার মত একজন ইংরাজী-জানা ইয়ংম্যান তীর্থভ্রমণে এসেছে শুনে তিনি খুব আশ্চর্য হ'য়ে গেলেন! "সন্ন্যাসী চোর নয় বোচকায় ঘটায়"—এ প্রবচনটা আমার পক্ষে বেশ খেটে গেল। তিনি পুলিশের লোক, সুতরাং যে কথাটার অর্থ ভাল হয়, তিনি তার কূটার্থ টেনে আনবেন এর আশ্চর্য কি?—তিনি সিদ্ধান্ত ক'ল্লেন যে, আমি নিশ্চয়ই কোন "পলিটিক্যাল অবজেক্ট" নিয়ে বের হ'য়েছি ; এমন কি আমার "অবজেক্টটা" কি, তা জানবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা ক'ল্লেন ; কিন্তু বলা বাহুল্য কৃতকার্য হ'তে পাল্লেন না ; তবে সে আমার দোষ কি তাঁর দোষ তা নিশ্চয় বলা যায় না। আমি কিন্তু তাঁকে যৎপরোনাস্তি আয়াসের সঙ্গে বুঝাতে চেষ্টা কল্লুম যে, সেই জনহীন পাহাড়ের মধ্যে আমার মত একজন বাঙ্গালীর কোন "পলিটিক্যাল অবজেক্টই" সিদ্ধ হ'তে পারে না। অবশেষে তিনি ব'ল্লেন, "I can not bring myself to believe that a man of culture like you has been taking so much trouble to go to see a shrine." আমি কি শুধু ভাঙা মন্দিরে কতকগুলি বহু পুরাতন দেবমূর্তি দেখবার জন্যে অনাহারে অনিদ্রায় কঠোর পরিশ্রম ক'রে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি?—এরা কি আমার কঙ্কালসার হৃদয়ের গভীর বেদনা নিবারণ করতে পারে? পার্বত্য-নগ্ন-সৌন্দর্য, প্রকৃতির বিচিত্র দৃশ্য, খরতোয়া বঙ্কিম গিরিনদীর রজতপ্রবাহ ও সুশীতল সমীরণের অবারিত হিল্লোল, এরাই যে আমার জীবনের উপাস্য দেবতা, ইনস্পেক্টর তা বুঝতে পাল্লেন না।

যাহোক ইনস্পেক্টর বাবুর সঙ্গে অন্যান্য বিষয়েও অনেক কথা হ'লো। ক্রমে বৃটিশ পার্লিয়ামেন্ট, আইরিশ হোমরুল ও জাতীয় মহাসমিতি হ'তে আরম্ভ ক'রে আমাদের প্লীহাবৃদ্ধি ও তার সঙ্গে সাহেবদের ঘুঁষির নৈকট্য প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই আলোচনা করে

www.pathagar.com

গেল। ইন্‌স্পেক্টর বাবু সেই দিনই চ'লে যাবেন। তিনি তাঁর ঠিকানা আমাকে দিয়ে গেলেন এবং ব'ল্লেন, যদি রাস্তায় কোন অসুবিধা হয় এবং কোনখানে থানাওয়ালা কোনও যাত্রীর উপর অত্যাচার করে তা হ'লে আমি যেন অবিলম্বে তাঁকে সে কথা জানাই। তাঁকে এ সমস্ত কথা জানালে তিনি অত্যন্ত বাধিত হবেন এবং প্রতিকারের যথেষ্ট চেষ্টা ক'রবেন। ইন্‌স্পেক্টর বাবুর ভদ্রতায় আমি খুব আনন্দ লাভ কল্লুম।

ইন্‌স্পেক্টর বাবু চ'লে গেলে আমি উঠবার যোগাড় ক'ল্লুম, কিন্তু ডাক্তারবাবু আমার জন্যে প্রচুর জলযোগের আয়োজন ক'রেছিলেন; সুতরাং তাঁকে একটু বাধিত করা দরকার হ'লো। তাঁর কাছে বিদায় নেবার সময় তিনি আমার সঙ্গে কতকগুলি কুইনাইনের বড়ি, আমাশয়ের বড়ি প্রভৃতি তিন চার রকম দরকারী ঔষধ দিলেন। আমার নিজের কিছুই দরকার ছিল না, সে কথা তাঁকে বল্লে তিনি উত্তর দিলেন যে, সেগুলি সঙ্গে থাকলে অন্ততঃ রাস্তাতেও কোন পীড়িত বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করা চলবে। এর পর আর কোন কথা নেই। আমি তাঁকে হৃদয়ের সঙ্গে ধন্যবাদ ক'রে ঔষধগুলি নিয়ে বাসায় ফিরে এলুম। এখন অপরাহ্ণ পাঁচটা।

বাসায় এসে দেখি, সকলেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছেন। আমাদের নন্দপ্রয়াগের দিকে খানিকটে অগ্রসর হ'য়ে থাকা দরকার; কারণ আগামী কাল চন্দ্রগ্রহণ। গ্রহণের ন্যায় শুভদিনে রাস্তায় কোন চটিতে না প'ড়ে থেকে একেবারে নন্দপ্রয়াগে পৌঁছুতে সকলেরই আগ্রহ। সঙ্গীদ্বয় যদি এ অভিপ্রায় কিছুক্ষণ আগে ব্যক্ত করতেন, তা হ'লে অনায়াসে আরো দু'ঘণ্টা আগে বের হওয়া যেত। যাহোক সেই অপরাহ্ণেই কর্ণপ্রয়াগ ছেড়ে চ'লতে আরম্ভ ক'ল্লুম। বৈকালে বেশী পথ চলা যায় না, তার উপর পথ খারাপ, পর পর শুধু চড়াই আর উৎরাই। কাজেই সন্ধ্যা লাগতে লাগতে কর্ণপ্রয়াগ থেকে তিন মাইলের বেশী যেতে পারিনি। যেখানে এসে সন্ধ্যা লাগলো সে জায়গাটার নাম 'কাল্কা চটি'।

আমরা কাল্কা চটিতেই রাত্রি কাটানো স্থির কল্লুম। এই চটিতে একখানি মাত্র ঘর; তবে ঘরখানা একটু বড়—এই যা কথা। ঘর পাতা দিয়ে ছাওয়া, কোন দিকে বেড়া নেই। চটিওয়ালা বড় ভাল মানুষ, দোকানদার হলেও তার ব্যবহার বড় ভদ্র। এ দেশের চটিওয়ালারা ঘরভাড়া নেয় না, অধিকন্তু যাত্রীদের থালা, ঘটি, কড়াই প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করে। প্রত্যেক চটিওয়ালার দোকানেই এ রকম সাত আট প্রস্থ জিনিস থাকে। রাস্তা যে রকম দুর্গম, তাতে নিজের শরীরকেই সময় সময় ব'য়ে নিয়ে যাওয়া কঠিন; তার উপর যদি ঘটি, বাটি প্রভৃতি সংসারের জিনিস ব'য়ে নিয়ে যেতে হয়, তা হ'লে শুধু আমাদের মত দুর্বল বাঙ্গালী কেন, অনেক কষ্টসহিষ্ণু হিন্দুস্থানীকেও এই পথে যাওয়ার অভিপ্রায় পরিত্যাগ ক'রতে হয়। তবু হিন্দুস্থানীরা কখনো কখনো দুই একটা অবশ্য-ব্যবহার্য জিনিস সঙ্গে নিয়ে আসে। চটিওয়ালাদের একটা নিয়ম আছে, তাদের দোকান থেকে যদি আবশ্যক খাদ্যদ্রব্যাদি না কিনে সঙ্গে নিয়ে আসা যায়, তা হ'লে চটিওয়ালা থালি বর্তন (থালা, বাটি ইত্যাদি বাসন) দেওয়া ত দূরের কথা, সে যাত্রীকে তাদের ঘরেই ব'সতে দেবে না; কারণ নারায়ণযাত্রীদের কাছ থেকে আশ্রয়স্থানের ভাড়া নেওয়া তাদের মতে মহাপাপ, অথচ নারায়ণযাত্রী যে তাদের আশ্রয় অভাবে গাছের তলায় প'ড়ে শীতে মারা যাবে, তাতে তাদের অপরাধ হবে না! চটিওয়ালারা বলে যে, তাদের দোকান থেকে

www.pathagar.com

জিনিস কিনলে যে লাভ হয়, তাতেই তাদের দোকানের ভাড়া ইত্যাদি পুষিয়ে যায়; তারা ত আর ঘরের পয়সা ব্যয় ক'রে সদাব্রত খোলেনি। এ কথার কোন বৈষয়িক উত্তর দেওয়া শক্ত। চটিতে কোনও বিছানা পাবার যো নেই; নিজের কম্বলই একমাত্র সম্বল।

তবু আমরা এখানে বেশ সুখে ছিলাম। চটিওয়ালা সকাল সকাল আমাদের খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় ক'রে দিলে, এবং পুদিনা ও তেঁতুল দিয়ে সে নিজে এমন সুস্বাদু চাটনি তৈয়েরি ক'রলে, যার কথা বহুদিন আমাদের মনে থাকবে।

আমরা পথশ্রমে কাতর হ'য়েছিলুম, আহারাদির পর শয়ন করা গেল। কিন্তু আর সকল গুণ থাকলেও চটিওয়ালার এক মহৎ দোষ ছিল, সে কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় ধর্মালাপী যে আমাদের পাশে ব'সে ধর্মালাপ আরম্ভ ক'রলে, এবং হনুমানজীর লেজের দৈর্ঘ্য, ভরতের বাঁটুলের গুরুত্ব ও ভীমসেনের আহারের পরিমাণ প্রভৃতি অসাধারণ বিষয়ে প্রশ্ন ক'রতে লাগলো। বলা বাহুল্য, আমাদের দ্বারা তার কৌতূহল নিবৃত্তির বড় সুবিধে হয় নি। বিশেষতঃ কানের গোড়ায় সে বকবক করাতে বৈদান্তিক ভায়া যেরকম অশান্তভাবে উঃ! আঃ! ক'রতে লাগলেন, তাতে আমার ভয় হলো, হয়ত বা নিদ্রাকাতর অসহিষ্ণু বৈদান্তিক কিছু গোলযোগ বাধাবেন। যা হোক, ক্রমে আমাদের সকলকে নিদ্রামগ্ন দেখে চটিওয়ালা বোধ করি ভগ্নোৎসাহে শুতে গিয়েছিল। শেষরাত্রে জেগে দেখি, আকাশ ভয়ানক অন্ধকার, মেঘে চতুর্দিক আচ্ছন্ন, অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়ছে। মেঘের গতিক দেখে সঙ্গীগণ বের হবেন কিনা, তাই ইতস্ততঃ ক'রতে লাগলেন। আমি কথাবার্তা না ব'লে কম্বল মুড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়বার উদ্যোগ ক'রতে লাগলুম।

www.pathagar.com

২৩শে মে, শনিবার। কয়েক দিন আগে বৈদান্তিক ভায়া শিলাবর্ষণের সুখ মর্মে মর্মে অনুভব ক'রেছিলেন, আজ আকাশে এই রকম ঘোর ঘনঘটা দেখে চটি ত্যাগ করা সম্বন্ধে তাঁকে কিঞ্চিৎ উদাসীন দেখা গেল, এবং তিনি তাঁর ধূলিলাঞ্ছিত কম্বলখানিতে সর্বশরীর ভাল ক'রে ঢেকে এই গুরুগম্ভীর মেঘগর্জন ও ঝুপ-ঝাপ বৃষ্টিপতনের মধ্যে আর একবার দীর্ঘনিদ্রার আয়োজন ক'রতে লাগলেন। আজ তাঁকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া আমি বাহুল্য বোধ কল্লুম না। টানাটানিতে তাঁর কম্বলখানির "নূতনত্ব" আরও একটু বাড়িয়ে তাঁকে আমাদের সঙ্গে যাত্রা করতে বাধ্য কল্লুম এবং বৃষ্টির মধ্যেই চলতে আরম্ভ করা গেল, কিন্তু মেঘের অবস্থা দেখে কারো বুঝতে বাকী রইল না যে আজ গ্রহণ দেখা অসম্ভব! তবু যতটা পথ এগিয়ে থাকা যায়, সেই ভাল মনে ক'রেই আমরা দুর্যোগের মধ্যেও চলতে লাগলুম; বৈদান্তিক আমার পশ্চাতে পশ্চাতে নীরবে পথ অতিক্রম ক'রতে লাগলেন। আমার মস্তকে আশু বজ্রপাতের প্রার্থনা ছাড়া সে সময় যে তিনি অন্য কোনও চিন্তায় মনোনিবেশ ক'রেছিলেন, এমন মনে হয় না।

রাস্তায় খানিকদূর এসে আমরা একটা পরিত্যক্ত দোতলা বাড়ি ও বাগান দেখতে পেলুম। বাড়িটা একে পরিত্যক্ত, তার উপর বহু প্রাচীন। তার পূর্বেকার শোভা ও সম্পদ এখন সম্পূর্ণ অপসৃত হয়েছে, কিন্তু এই নির্জন পার্বত্য প্রদেশে বৃক্ষরাজি-সমাচ্ছন্ন এই ভগ্ন অট্টালিকা আমার ন্যায় কল্পনাজীবীর পক্ষে এক নূতন কল্পনার রাজ্য খুলে দিলে। সেই বহুপূর্বে যখন এই অট্টালিকা সমৃদ্ধ ও জনপূর্ণ ছিল, সেই সময়ের একটা প্রশান্ত ও পবিত্র দৃশ্য আমার সম্মুখে বিকশিত হ'লো! যেন কোন তেজঃপুঞ্জ যোগীবর ঐ সম্মুখের বাঁধানো বটমূলে ব'সে প্রভাত-সূর্যের দিকে চেয়ে হৃদয়ের অন্তস্তল হ'তে বিশ্বপিতার স্তুতিগান কচ্চেন এবং সেই গভীর মহান সঙ্গীতের প্রতি বর্ণ প্রভাতরাগরঞ্জিত স্তব্ধ বনস্থলীতে প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে। সাধুর অগণ্য শিষ্যবৃন্দ চারিদিকে নানা কার্যে ব্যস্ত। কেহ কেহ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে মৃগচর্মে ব'সে ঊর্ধ্বমুখে সামগান ক'চ্চেন, কেহ অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক যুবক সাধুকে তত্ত্বোপদেশ দিচ্ছেন, কেহ বা স্নানান্তে সর্বশরীরে বিভূতি মেখে সুদীর্ঘ জটাপাশ রৌদ্রে ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছেন। বশিষ্ঠের আশ্রম, বিশ্বামিত্রের তপোবন, শান্তরসাস্পদ সকল জায়গার কথা ধীরে ধীরে আমার হৃদয় অধিকার ক'রলে। অতীত গৌরবের জীর্ণ সমাধি বুকের মধ্যে নিয়ে এই বিস্তীর্ণ অট্টালিকার বিদীর্ণপ্রায় পঞ্জরগুলি কতকাল থেকে এই নির্জন প্রদেশে একটা বিমল শান্তির উৎস খুলে দিয়েছে! কিন্তু তীর্থযাত্রীর মধ্যে কয়জন লোক এই পুণ্যাশ্রমের ভগ্নাবশেষ দেখে মুগ্ধ হয়? যেসব যাত্রী এই রাস্তায় চলে, তাদের মধ্যে বোধ করি অতি অল্প লোকই এই অট্টালিকায় প্রবেশ ক'রে আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট ক'রেছে! আমাদের আগে আগেও দুই একদল যাত্রী যাচ্ছিল; এই অট্টালিকার কাছে এসে উদাসীন ভাবে তারা একবার এর দিকে চাইলে, তারপর "মালুম হোতা কি হিঁয়া এক স্বামীজিকা আশ্রম থা!" এই পর্যন্ত বলেই সে স্থানত্যাগ ক'ল্লে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই আশ্রমের প্রত্যেক বৃক্ষলতার সঙ্গে শান্তি, আনন্দ ও প্রেমের এমন একটা মাধুর্য বিজড়িত রয়েছে, এই ভগ্ন অট্টালিকার প্রত্যেক প্রাচীর এবং কক্ষগুলিতে এমন একটি নীরব ইতিহাস অঙ্কিত আছে, যা দৃষ্টিপথে

www.pathagar.com

না প'ড়েই থাকতে পারে না।

বেলা তখন প্রায় নয়টা। বৃষ্টি একটু একটু থেমে গিয়েছে, রৌদ্রও উঠেছে। আমি সেই বাঁধা বটতলায় ব'সে নানা কথা ভাবচি ; মাথার উপর টুপ্‌টাপ্‌ ক'রে বৃক্ষপল্লবচ্যুত জলবিন্দু পড়াতে একটা পুরাতন গান মনে পড়ে গেল,—

"আবার বল্‌ রে তরু প্রভাতকালে,
ধরা ভেসে যায় তোর নয়নজলে,
না জেনে লোকে বলে শিশিরপড়া জল রে!"

বাস্তবিক এ জায়গাটাতে এমন এক স্নিগ্ধ সৌম্য ভাব মনের মধ্যে জাগিয়ে দেয় যে ভগবানের করুণা ও প্রকৃতির বিশ্বব্যাপী সুশোভনত্ব স্বতঃই হৃদয় অধিকার করে।

আমার সঙ্গীরা আমার পিছনে পিছনে আসছিলেন। আমার অস্বাভাবিক গতি-বৃদ্ধি বশতঃই হোক, কি তাঁদের স্বাভাবিক ধীরতা বশতঃই হোক, তাঁরা অনেক পিছিয়ে পড়েছেন। তাঁদের পথ চেয়ে আমি এতক্ষণ এই ভগ্ন অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করি নি; ভাবছিলুম সকলে একসঙ্গেই যাব ; কিন্তু এক ঘণ্টা অপেক্ষা ক'রেও যখন তাঁদের দেখতে পেলুম না, তখন একাই সেই নির্জন অট্টালিকায় প্রবেশ কল্লুম! দেখলুম অট্টালিকা জঙ্গলে পরিপূর্ণ হ'য়ে গিয়েছে ; কিন্তু এখনো দেওয়ালে ধূমরাশি লেগে আছে। কত দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত ধূম এই দেওয়ালে কোনও ব্রহ্মপরায়ণ সাধুর অনুষ্ঠিত পবিত্র হোমাগ্নির চিহ্ন অঙ্কিত ক'রে রেখেছে! এই যজ্ঞধূমের সুগন্ধ এখনো যেন চারিপাশের বায়ুস্তর আমোদিত ক'রছে। প্রত্যেক ঘরেরই মাঝখানে এক একটা অগ্নিকুণ্ড ; ধর্মানুষ্ঠানের জন্যেই ইহা তৈয়ারি হ'য়েছিল বলে মনে হ'লো। নীচের পাঁচটা ঘরে কিছু নেই। উপরে উঠবার জন্যে সিঁড়ির সন্ধান করতে লাগলুম। বহু অনুসন্ধানে প্রায় গলদঘর্ম হ'য়ে অনেকক্ষণ পরে একটা সিঁড়ি আবিষ্কার করা গেল। ধাপগুলি কতক বা ভেঙে গিয়েছে, আর কতকের উপর বড় বড় গাছ জন্মেছে। যা হোক বিশেষ সতর্ক হ'য়ে উপরে উঠলুম। সম্মুখেই দেখি একটা প্রকাণ্ড হল, ও তার যে পাশে নদী, সেইদিকে দু'টি ঘর ; প্রত্যেক ঘরে নদীর দিকে চার-পাঁচটা জানালা। জানালায় শুধু ফুকোর বর্তমান, কপাট-চৌকাঠ অনেক পূর্বেই অন্তর্হিত হ'য়েচে।

উপরের হলটি আজও বেশ পরিষ্কার আছে। দেওয়ালে নানারকম ছবি আঁকা ; দুই একটা ছবি মুছে গিয়েছে, কোন কোনটার রঙ ময়লা। কিন্তু অনেক ছবির রঙই বেশ উজ্জ্বল আছে। সকল ছবিই হিন্দুস্থানী ধরনের এবং যে সকল রঙে আঁকা হ'য়েছে, সেগুলি অতি উৎকৃষ্ট। চিত্রকরও যে সুনিপুণ, তা ছবিগুলি একটু লক্ষ্য ক'রে দেখলেই বুঝতে পারা যায়।

আমি ছবি দেখতে লাগলুম। প্রথমেই দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন নজরে প'ড়ল। নাগরাজ শেষকে মন্থনরজ্জু ক'রে দেব ও দানবে মহোৎসাহে সমুদ্রমন্থন আরম্ভ ক'রেছে : কোন্‌ দিকে দেবতার দল আর কোন্‌ দিকে দানবের দল, তা চিনে নেওয়া একটু শক্ত। তবে দেব-দানবের চেহারার মধ্যে এইটুকু পার্থক্য দেখা গেল যে, দেবতাদের চেহারা নিতান্ত ভালমানুষের মত, তাঁরা প্রায় সকলেই মুকুটধারী ; আর দানবের চেহারা অনেকটা ডাকাতের মত ; গাঁট্টাগোট্টা শরীর, মোটা-মোটা চোখ, এবং ঝাঁকড়া চুল ; যেন তাদের শরীরের প্রত্যেক মাংসপেশী হ'তে একটা জাগ্রত উৎসাহ ও কার্যতৎপরতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে; মুখে যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞার চিহ্ন সুস্পষ্ট অঙ্কিত। কিন্তু সব চেয়ে প্রধান বিশেষত্ব

www.pathagar.com

আমার বোধ হ'লো, তাদের আকৃতির ও পরিচ্ছদের ;—দুই-ই হিন্দুস্থানী ধরনের। আমাদের সেই সমতল বঙ্গভূমির ইন্দ্রের চেহারা কেমন বরের মত ; কিন্তু এ পার্বত্য প্রদেশে এই বাড়ির দেওয়ালে ইন্দ্র যে মূর্তিতে বিরাজ ক'চ্চেন, তাতে আমরা দূরের কথা, ইন্দ্রাণী স্বয়ং বাঙ্গলা মুলুক হ'তে এখানে এসে দেবরাজকে খুঁজে নিতে পারেন, নিতান্ত চাক্ষুষ প্রমাণ ছাড়া এ কথা বিশ্বাস ক'রতে পারি নে।

সমুদ্রমন্থনের পরবর্তী চিত্র সীতার বিবাহ। নবজলধরকান্তি সৌম্যমূর্তি রামচন্দ্র হরধনু ভেঙে বরের বেশে সভাতলে দাঁড়িয়ে আছেন। নতমুখ ; কিন্তু বিনয় এবং সমাগত রাজা, ঋষি ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি এক সুগভীর সম্মানের ভরে সেই সুন্দর মুখ এক আশ্চর্য শোভাধারণ ক'রেছে ; সীতাদেবী পুষ্প মালা হস্তে সেই বিবাহসভায় অগ্রসর হ'চ্ছেন ; সঙ্গে সুহাসিনী সুন্দরী সখীর দল। এই আনন্দপূর্ণ দিনে, বিপুল উৎসাহের মধ্যে তাদের অসীম আনন্দ যেন তাদের হৃদয়মধ্যে আর বেঁধে রাখতে পারছে না। বর্ষাকালে নদীর জল যেমন নদীর পরিসর পরিপূর্ণ ক'রে দুই কূল প্লাবিত করে, এদের হৃদয় পূর্ণ করে তেমনি সর্বশরীরে একটা দুর্দমনীয় চাঞ্চল্য উপস্থিত ক'রেছে, এবং সেইজন্যে তাদের আরো সুন্দর লাগছে। লজ্জায় সীতাদেবীর মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে, এবং শত শত সভাসদ্‌বর্গের কৌতূহলপূর্ণ স্থির দৃষ্টি সেই লজ্জামণ্ডিত কোমল মুখখানির উপর যুগপৎ বর্ষিত হ'য়ে তাঁকে আরো বিপন্ন ক'রে তুলেছে ; কিন্তু তবু যেন হৃদয়ের প্রসন্নতা মুখে প্রতিফলিত হ'চ্ছে। বিবাহ-সভার একধারে লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন উপবিষ্ট। উচ্চ গৃহচূড়া থেকে ঊর্মিলা, মাণ্ডবী এবং শ্রুতকীর্তি অলক্ষিত ভাবে তাঁদের দেখে অতিকষ্টে প্রবল হাস্যবেগ সংবরণ কচ্ছেন। এঁদের তিন ভাইয়ের আকারপ্রকার ও বেশভূষায় আমি এমন কিছু দেখ্‌লুম না, যাতে ক'রে হঠাৎ এই রকম অপর্যাপ্ত হাসির আমদানী হ'তে পারে ; তবে কথা এই যে, তরুণীদের হাস্যের সর্বদা সন্তোষজনক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা নেই, এবং আশা করি যাঁদের সম্বন্ধে আমি হঠাৎ একটা মন্তব্য প্রকাশ ক'রে ফেলেছি, তাঁদের সদয় হৃদয় আমাকে ক্ষমা ক'রতে কুণ্ঠিত হবে না।

সীতার বিবাহের পরই শিবের বিবাহের ছবি। স্ত্রী-আচার হ'চ্ছে ; এয়োরা বরকে চারিদিকে ঘিরে হুলাহুলি ক'রচে ; বর কিন্তু প্রশান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, এ আনন্দস্রোতে তাঁকে কিছুমাত্র চঞ্চল ক'রতে পারে নি। বরের বিবাহ-সাজ কিছুই দেখ্‌লুম না ; কারণ তিনি বিয়ে ক'রতে এসেও "ইউনিফর্ম" ছাড়েন নি। এখনো পরনে সেই বাঘছাল, গায়ে বিভূতি ও মস্তকে পিঙ্গলবর্ণ জটার উপর উদ্যতফণা সর্প! বর দেখে কোন কোন পুরনারী ভারি নিরাশ হ'য়ে স্থানান্তরে দাঁড়িয়ে দুঃখ ক'চ্ছেন। এই বিবাহের ঘটক নারদ। বৃদ্ধের বড়ই সাধ, তিনি একটু অন্তরালে থেকে স্ত্রী-আচারটি এক নজর দেখে নেন, কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্য তিনি রমণীদের সর্বত্রগামী দৃষ্টি এড়াতে পারেন নি। তিনটি কুমারী ছুটে এসে একজন তাঁর কাপড়, একজন উত্তরীয়, এবং আর একজন তাঁর আবক্ষবিলম্বিত শুভ্রদাড়িটি চেপে ধ'রেছে। বুড়োর সখও মন্দ নয়, বীণাযন্ত্রটি পর্যন্ত হাতে ক'রে এসেছেন! নিজেকে নিতান্ত নিঃসহায়ভাবে কুমারীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে, বীণাযন্ত্রটি যাতে এ-যাত্রা রক্ষা পায়, সেই জন্য যন্ত্রসমেত দক্ষিণ হস্তখানি ঊর্ধ্বে তুলেছেন, এবং অন্য দুটি কুমারী বীণাযন্ত্রটি কেড়ে নেবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কচ্ছে। নারদ বেচারীর ব্যতিব্যস্ত ভাব দেখে আমার বড়ই হাসি এল!

www.pathagar.com

তার পরই দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের ছবি দেখ্‌তে পেলুম। অর্জুন লক্ষ্য ভেদ ক'রেছেন ; দৌপদী তাঁকে বরমাল্য দিতে যাচ্ছেন। মধ্যপথে যেতে না যেতেই সমাগত ক্ষত্রিয় রাজগণ একযোগ হ'য়ে যে যার অস্ত্র নিয়ে অর্জুনের দিকে ছুটে চ'লেছেন, যেন তাঁদের প্রজ্বলিত ক্রোধ-বহ্নি তৃণের ন্যায় এখনি অর্জুনকে দগ্ধ ক'রবে। অর্জুনের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, তিনি শান্তমুখে ধীরভাবে যুধিষ্ঠিরের আদেশ প্রতীক্ষা কচ্ছেন। সুদীর্ঘ হস্তে বিশাল ধনু ও সুতীক্ষ্ণ বাণ, যেন অগ্রজের সামান্য অঙ্গুলিসঙ্কেতমাত্র এই অগণ্য শত্রুসমষ্টি নিপাতে প্রবৃত্ত হ'তে পারেন। ধন্য সেই চিত্রকর যে তুলিকার সামান্য চালনায় এই ছবি এঁকেছেন। একদিকে অচঞ্চল বীর্য ও গাম্ভীর্য, অন্যদিকে ভ্রাতার প্রতি অসাধারণ নির্ভর। সম্মুখে মৃত্যুস্রোত গম্ভীর গর্জনে অগ্রসর হ'চ্ছে, সে দিকে লক্ষ্য নেই ; শুধু জ্যেষ্ঠভ্রাতা কি অনুমতি করেন, তাই জানবার জন্যে তাঁর দিকে বদ্ধদৃষ্টি।

দ্রৌপদী যেন এই আকস্মিক বিপদে কিঞ্চিৎ ভীত হ'য়েছেন ; কিন্তু তিনি বীরের কন্যা, বীরকে পতিত্বে বরণ করবার জন্য অগ্রসর হ'চ্ছেন, ভয় তাঁর সাজে না ; তাই তাঁর মুখে ভয় অপেক্ষা কৌতুকের আবেশই বেশী পরিমাণে অঙ্কিত হয়েছে। তিনি বিস্ফারিত নেত্রে সেই ক্রুদ্ধ রাজন্যবর্গের দিকে চেয়ে র'য়েছেন। এই বিপ্লব-বহ্নির মধ্যে তাঁকে একাকী দেখে পাঞ্চাল-কুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন ত্রস্তপদে ভগিনীর দিকে অগ্রসর হ'চ্ছেন, যেন তাঁর বীর-হৃদয়ের দুর্বেদ্য বর্মে ছোট বোনটির নবীন সুকোমল দেহখানি ঘোর বিপদের মধ্যে রক্ষা করেন।

আর একদিকে মল্লবেশে বীর বৃকোদর। প্রচণ্ড সমরোল্লাস যেন তাঁর বিরাট দেহকে অধীর ক'রে তুলেছে। তিনি একা প্রকাণ্ড গাছ উপ্‌ড়ে নিয়ে, তার আগার দিকটা ধ'রে শত্রুমণ্ডলীর উপর নিক্ষেপ করবার উপক্রম ক'চ্ছেন। ভয়ে রাজগণ ইতস্ততঃ পলায়নপর। সকলের পশ্চাতেএক প্রকাণ্ড হস্তী ; মাহুত তাকে ভীমের সম্মুখীন করবার জন্যে যথাসাধ্য বলে তার মাথায় ডাঙস মারছে ; কিন্তু গজরাজ বোধ করি বৃকোদরের হাতের সেই তরুবরের এক-আধটা গুরুগম্ভীর প্রহার আস্বাদন ক'রে থাকবে, সুতরাং হস্তিপকের অঙ্কুশ-তাড়না তার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ ভেবেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। এক পাশে একখানি রথ এই বৃক্ষের আঘাতেই চূর্ণমান। রথী ও সারথি বিপদ বুঝে পূর্বেই চম্পট দিয়েছিলেন, কিন্তু কিয়দ্দূরে যেতে না যেতে পস্পরের ধাক্কায় ভূতলে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। রথীর শিরস্থানের উপর সারথির নাগরাজুতা শোভা পাচ্ছে। পলায়ন ক'রেও সম্পূর্ণ নিরাপদ হবার সম্ভাবনা নেই দেখে দু'জন ব্রাহ্মণ গলার পৈতা হাতে ক'রে ধ'রে ভীমসেনকে দেখাচ্ছে ; তাদের ভয়চকিত মুখ ও কম্পমান দেহ, দেখলেই মনে হয় যেন তারা ব'লছে, "মেরো না বাবা, এই দেখ আমরা ব্রাহ্মণ, আশীর্বাদ কচ্চি, তোমার ভাল হবে।"—শেষের দৃশ্যটা দেখে না হেসে থাকা যায় না।

আরো কতকগুলো পৌরাণিক ছবি আছে। তার সমস্ত বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় না। যেগুলি মুছে গিয়েছে, অনেক কষ্টেও তাদের অর্থবোধ হ'লো না। সেই হলঘরের পাশের নদীর দিকের কুঠুরীর দেওয়ালে আমি যে একখানি পট দেখলুম, সেখানা কিন্তু আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছিল। হলের যে ছবিগুলির কথা উপরে বলেছি, তাতে নানারকম রঙের যোগাড় করতে হয়েছিল এবং তুলিকার দরকার হয়েছিল ; কিন্তু আমি এখন যে ছবিখানার কথা ব'লছি, তাতে সে সবের কিছুরই দরকার হয়নি। সন্ন্যাসীর আশ্রম, এখানে

www.pathagar.com

কয়লার অভাব ছিল না। একখানি কয়লা দিয়ে দেওয়ালে কে মহাদেবের মূর্তি এঁকে রেখেছে। মহাদেব ঘাড় হেঁট ক'রে কোলে উঠতে উদ্যত-বাহু গণেশকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধ'রেছেন, আর পাশে দাঁড়িয়ে পার্বতী প্রসন্নমুখে পিতাপুত্রের এই স্নেহ-সম্মিলন দেখছেন। কয়লা দিয়ে আঁকা বটে, কিন্তু তার প্রত্যেক টানে কতখানি মাধুরী, স্নেহ ও প্রেম ফুটে উঠেছে, তা হৃদয় দিয়ে অনুভব করা ছাড়া কালি-কলমে লেখা যায় না। কোন সন্ন্যাসীরই অবশ্য এ ছবি আঁকা। হলের চিত্রের সঙ্গে এ ছবির যখন কোন সম্বন্ধই নেই, তখন আর কোন্ গৃহী ব্যক্তি এই সুদূর তীর্থে এসে ছবি আঁকতে ব'সবে? কিন্তু সে যে একজন সুদক্ষ চিত্রকর ও সহৃদয় ব্যক্তি, তার আর সন্দেহ নেই। এই ছবি আঁকবার সময় হয়ত তার স্নেহভালবাসাপূর্ণ সংসারের কথা মনে পড়েছিল ; সে হয়ত প্রিয়তমার প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি ছেড়ে এসেছে ; হয়ত প্রাণাধিক পুত্রের স্নেহবন্ধন-পাশ কাটিয়ে এসেছে ; তাই তার ব্যথিত হৃদয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই দেওয়ালে অঙ্কিত ক'রেছে এবং সন্ন্যাসী-জীবনের দীর্ঘসঞ্চিত স্নেহ ও প্রেমের উন্মুক্ত স্মৃতি এই ছবির প্রত্যেক টানে বিন্দু বিন্দু ক'রে ঢেলে দিয়ে তাকে সুশোভিত ক'রে তুলেছে। হয়ত শুধু মহাদেব আঁকতেই তার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তার হৃদয় অজ্ঞাতসারে তার জীবনের ছবি এঁকে ফেলেছে ; নতুবা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর সাধনভবনে এ পূর্ণ সংসারীর আলেখ্য কেন? আবার মনে হলো সন্ন্যাসী হয়ত এই মন্ত্রেরই উপাসক! মহাদেবের ন্যায় নির্লিপ্ত সংসারী হবার জন্যে তার যোগ-সাধন ; কিন্তু এ নির্জন স্থান তার উপযোগী নয় ; এখানে পার্বতী-হস্ত-চিহ্ন কিছুই দেখা গেল না। যে বাড়িতে একদিন রমণীর পদার্পণ হয়েছে, সে বাড়িতে গৃহলক্ষ্মীদের কোন না কোন চিহ্ন থাকেই। অবিবাহিতদের গৃহকক্ষে যদি কোন দিন রমণী প্রবেশ করেন, তবে তাঁর সুকোমল কর সেই গৃহের বহুকালের যত্নে রক্ষিত বিশৃঙ্খলা বিদূরিত করে ; কিন্তু এই পার্বত্যগৃহে কখনো যে কোন গৃহলক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হয়েছে, তা আমার বোধ হ'লো না। এই কয়লার আঁকা সেই ছবির সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমার কত অতীত কথা মনে এল ; একটি ক্ষুদ্র বালিকার কোমল স্মৃতি বুকের মধ্যে একটা কথা জাগিয়ে তুললে। হায়, সে যদি আজ এ পৃথিবীতে থাকতো!

আমি এখানে দাঁড়িয়ে নিবিষ্টচিত্তে এই সকল কথা ভাবচি, হঠাৎ বৈদান্তিকের উচ্চ কণ্ঠস্বর আমার কানে প্রবেশ কল্লে। এমন একটা জায়গায় আমি আড্ডা নিয়েছি ঠিক করে, বৈদান্তিক বাহির থেকে আমাকে ডাকাডাকি ক'চ্ছিলেন, তাড়াতাড়ি নীচে নেমে দেখি ভায়া গাছতলায় ব'সে র'য়েছেন। আমাকে দেখে বল্লেন, সকালে তাড়াতাড়ি বেধেছিল, এই দারুণ শীতে দস্তুরমত ভিজোলে তবে ছাড়লে। এখন যে যাবার কথাও নেই! অভিপ্রায়টা কি?—আমি বল্লুম, আমার আর অভিপ্রায় কি থাকবে? আপনারা যেরকম গজগমনে আসছেন তা তীর্থভ্রমণের উপযোগী নয় ; আমি ত আর আপনাদের ফেলে যেতে পারি নে, তাই এখানে এই বাড়িটির ভিতরে একটু অপেক্ষা ক'চ্ছিলুম। আসুন চলতে আরম্ভ করি। চলতে আরম্ভ করবো কি, স্বামীজির দেখা নেই। একটু অপেক্ষা ক'রে তাঁর খোঁজে বাহির হওয়া গেল। কোথাও তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না। শেষে দেখি তিনি খানিকদূরে একটি পঞ্চবটীবেষ্টিত লতামণ্ডপ আবিষ্কার ক'রে তার মধ্যে থেকে ভিজে পাতাগুলি সরিয়ে ভিজে মাটিতেই শুয়ে রাজার মত আরাম উপভোগ কচ্ছেন! তিনি বল্লেন, এমন সুন্দর স্থান অল্পই দেখা যায়। তাঁর এই কথার প্রতিবাদ করবার কিছু

www.pathagar.com

ছিল না, কিন্তু এখানে শুয়ে তাঁর আরামভোগের রকমটা আমার বড়ই হাস্যজনক ব'লে বোধ হয়েছিল।

কাল্‌কাচটি থেকে নন্দপ্রয়াগ সাত মাইল। এ সাত মাইল রাস্তা বেশ ভাল, এর মধ্যে বেশী চড়াই উৎরাই নেই। আমরা চলতে আরম্ভ ক'রে খানিক দূরে একটা আশ্রম দেখলাম। আশ্রমটি রাস্তার উপরে। কয়েকখানা কুটীর; তাতে অনেকগুলি সন্ন্যাসী। কিছুদিন আগে আমার বাসার চোর চাকরটা সন্ন্যাসী সেজে খুব আড়ম্বরের সঙ্গে "বম বম" ক'চ্ছিল, সেকথা পাঠকেরা জানেন; এ সন্ন্যাসীগুলোও সেই দলের। তারা সেখানে বসে কেউ কেউ জটলা ক'চ্ছে, কেউ নিজেকে খুব উঁচু গলায় কোন বিখ্যাত সাধুর চেয়ে বড় প্রতিপন্ন ক'রে বিলক্ষণ আত্মপ্রসাদ অনুভব ক'চ্ছে; কেউ বা সমস্তই বৃথা ভেবে যৎপরোনাস্তি উৎসাহের সঙ্গে গঞ্জিকাদেবীর সেবা ক'চ্ছে। বলা বাহুল্য, আমরা সেখানে দাঁড়ালুম না।; তারা আমাদের সাধু দেখে অভ্যর্থনার ত্রুটি ক'ল্লে না; দু-তিনটে গাঁজার কলকে আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে গঞ্জিকাপানে "জবাকুসুমসঙ্কাশং"-লোহিত চক্ষু কপালে তুলে বল্লে, "থোড়া তামাক পি জে?" আমরা ত "পিজের" মধ্যেই নেই; এক বৈদান্তিক তামাকখোর; কিন্তু গাঁজার গন্ধে তিনি দশ হাত তফাতে স'রে দাঁড়ালেন; সুতরাং আমাদের কারো দ্বারা এই সন্ন্যাসীদের খাতির রইল না। সাধু হ'য়ে আমরা এ রকম ক'রে গাঁজার কলকের অপমান করতে সাহস কল্লুম দেখে বেচারীদের বিস্ময় ও বিরক্তির সীমা রইল না। চলতে চলতে ফিরে তাকিয়ে দেখলুম, তারা একবার আমাদের দিকে কটাক্ষপাত ক'চ্ছে আর কি যেন ব'লছে; অনুমান হ'লো আমরা যে "ভণ্ড সাধু", এই কথা নিয়ে তাদের মধ্যে একটা আলোচনা চলছে।

বেলা এগারটার সময় আমরা নন্দপ্রয়াগে পৌঁছলুম। এখানে নন্দার সঙ্গে অলকানন্দার সঙ্গম হ'য়েছে। কারো কারো মতে অলকানন্দার সঙ্গে গঙ্গার সঙ্গম হ'য়েই এখান হ'তে অলকানন্দা নাম হ'য়েছে। এ সব নন্দা যে সশরীরে এই পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে, আমাদের সে জ্ঞান ছিল না। ছেলেবেলায় ভূগোল পড়বার সময় এ সকল নামের সঙ্গে পরিচয় না হওয়ায় এগুলিকে স্বর্গরাজ্যের সামিল ধ'রে রেখেছিলুম, এখন দেখছি সেগুলি স্বর্গের নয়, এই মর্ত্যেরই জলধারা। বাস্তবিকই আমাদের দেশ যদি পৃথিবী হয়, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অনুর্বর ক্ষেত্র যদি পৃথিবী হয়, মাড়োয়ারের দগ্ধ মৃত্তিকা যদি পৃথিবী হয়, তা হ'লে যাঁরা এ স্থানকে স্বর্গ বলে উল্লেখ ক'রে গেছেন তাঁরা অন্যায় করেন নি। মানুষের কর্মফল যদি মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবার কারণ হয়, তা হ'লে আমার পক্ষে তার বড় একটা সম্ভাবনা দেখছি নে। তবে আমার সান্ত্বনা এই, আমি মনে করি আমার এ জীবনেই স্বর্গবাস হ'য়ে গিয়েছে। এসব দেশে যা আছে, স্বর্গে তার চেয়ে আর বেশী কি থাকবে? কিন্তু আমি ঢেঁকী, স্বর্গেও ধান ভেনেছিলুম; আর সেই জন্যেই বুঝি স্বর্গভ্রষ্ট হ'য়ে এখানে এসেও আবার ধান ভান্‌তে আরম্ভ ক'রেছি। জীবনটা ধান ভান্‌তেই গেল। তবে যে মধ্যে মধ্যে 'শিবের গীত' গাই সে কেবল দশজনের অনুরোধে; কিন্তু দুঃখ, তাও ভাল ক'রে গাওয়া হয় না।

নন্দায় তখনো জল ছিল, কিন্তু বেশী নয়, তবে তাতে নদীর মধ্যেকার পাথরগুলি ডুবিয়ে রাখ্‌তে পারে। আমরা যেখানে পার হ'য়ে নন্দপ্রয়াগ বাজারে পৌঁছলুম, সেখানে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড আছে, তারই পাশ দিয়ে জলের ধারা কলকল শব্দে অতি বেগে ব'য়ে

www.pathagar.com

চ'লেছে। যেখানে বড় পাথর নেই, সেখানে জলধারা বেশ দেখা যাচ্ছে। যেখানে জলধারা পাথরের আড়ালে প'ড়ে দেখা যাচ্ছে না, সেখান হ'তেই অবিশ্রান্ত কলকল শব্দ উত্থিত হ'চ্ছে। আমরা এখান থেকে আর একটা পাথরে অতি সাবধানে পা ফেলে, জলে পা না ঠেকিয়েই, নন্দা পার হ'য়ে বাজারে উপস্থিত হ'লুম। বর্ষাকালে কিন্তু এ রকম ক'রে নন্দা পার হওয়া যায় না। অল্পদূরে যে একটা সাঁকো আছে, তখন তারই উপর দিঁয়ে নদী পার হ'য়ে বাজারে ও সঙ্গমস্থলে আস্‌তে হয়।

বাজারে একটা দোতলা ঘরে বাসা করা গেল। নীচে দোকান, উপরে আমাদের বাসা। আগাগোড়া কাঠের ঘর, কেবল মাথার উপরে স্লেট্ পাথর দিয়ে ছাওয়া। আমরা যে ঘরটায় ছিলুম, তার একটা বারান্দা বাজারের রাস্তার দিকে ; আমরা সেই বারান্দা দখল ক'রে বসলুম। দুপুরে আমরা কিছু খাওয়া-দাওয়া কল্লুম না। বৈকালে বাজার দেখ্‌তে বাহির হওয়া গেল। অনেকগুলি দোকান, আর তাতে অনেক জিনিসপত্র বিক্রী হ'চ্ছে। ব'লতে গেলে শ্রীনগরের পর আর এমন বাজার এ পথের মধ্যে দেখি নি। বাজারে প্রায় সকল জিনিসই পাওয়া যায়। আমরা রাত্রের জন্য খাওয়া-দাওয়ার একটু বিশেষ বন্দোবস্ত ক'ল্লুম।

খানিক পরে আবার বাহির হ'য়ে পড়া গেল। স্বামীজি ও বৈদান্তিক বাসায় থাক্‌লেন। বাজারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, দেখি দু'জন বাঙ্গালী পুরুষ এবং তিন-চারজন স্ত্রীলোক একটা দোকানে ব'সে আছেন। তাঁদের দেখেই আমার মনে এমন একটা আনন্দ উথ্‌লে উঠ্‌লো তা যাঁরা দূরপ্রবাসে দীর্ঘকাল পরে একজন আত্মীয়কে দেখেছেন, তাঁরাই শুধু বুঝতে পারবেন। আমি তাঁদের কাছে যেতেই তাঁরা পরম আগ্রহে আমাকে সেখানে ব'সতে ব'ল্লেন। তাঁদের মুখে শুন্‌লুম, তাঁরা আগের বৎসর নারায়ণ দর্শন করবার জন্যে এসেছিলেন ; রাস্তায় অনেকে নিষেধ করেছিল, কিন্তু তাঁরা কারো কথা না শুনে এতখানি রাস্তা এসেছিলেন। শুন্‌লুম, তাঁরা কাটগুদামের পথে এসেছিলেন। এখানে এসে আর অগ্রসর হ'তে পারেন নি, কারণ শীতও অসম্ভব, আর তাঁদের বিশ্বাস জন্মেছিল যে সেবার নারায়ণের দ্বার খোলা হয় নি। দুর্ভিক্ষের জন্য যাত্রী আসা বন্ধ ক'রে দেওয়াতেই বোধ হয় তাঁদের এ রকম ধারণা হ'য়েছিল। তাঁরা নারায়ণ দর্শন করতে এসেছেন ; এত অর্থব্যয়, কষ্ট সহ্য কোরে এতটা পথ এসে প'ড়েছেন, সম্মুখে আর আট নয় দিনের রাস্তা বাকি ; এ রকম অবস্থায় যদি তাঁরা ফিরে যান,তা হ'লে হয়তো জীবনে আর নারায়ণ দর্শন নাও ঘট্‌তে পারে। এই সমস্ত কথা ভেবে এই এক বৎসর এখানে অপেক্ষা ক'চ্ছিলেন, এবং সংবাদ লিখে বাড়ি হ'তে ডাকে খরচপত্র আনিয়ে এই দোকানঘরে বাস ক'চ্ছিলেন ; অভিপ্রায় একটিবার মাত্র নারায়ণ দর্শন কর্‌বেন। কি ভক্তি! স্বীকার করি, তাঁদের ভক্তি স্বার্থপরতামিশ্রিত, হয়ত পরকালে অক্ষয় স্বর্গলাভের প্রলোভনেই তাঁরা এই কষ্টকর অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন ; কিন্তু বাঞ্ছিতের প্রতি এমন অসাধারণ একনিষ্ঠা, এ শুধু প্রশংসনীয় নয়, অনুকরণীয়।

এবার যখন পাণ্ডারা সর্বপ্রথমে নারায়ণের দ্বার খুলতে যান, তখন এই কয়েকজন লোকও তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। নারায়ণ-দর্শন ক'রে কাল তাঁরা এখানে ফিরে এসেছেন, আজ এখানে বিশ্রাম ক'রে আগামী কাল দেশে ফিরে যাবেন। তাঁরা ব'ল্লেন যে, তাঁদের যাবার সময় সমস্ত বদরিকাশ্রম বরফে ঢেকে ছিল, এমন কি নারায়ণের প্রকাণ্ড মন্দিরের চূড়া অতি অল্পই দেখা যাচ্ছিল। এইজন্যে দিনকতক তাঁদের খানিকটা দূরে

www.pathagar.com

অপেক্ষা করতে হ'য়েছিল। বরফ গলতে আরম্ভ হ'লে দু-চার দিন পরে তাঁরা অগ্রসর হ'য়েছিলেন। কিন্তু তবুও পাণ্ডাদের ও তাঁদের মন্দির পর্যন্ত যেতে জায়গায় জায়গায় বরফ কেটে রাস্তা ক'রতে হ'য়েছিল।

তাঁরা আগামীকাল বাঙ্গালাদেশে যাবেন শুনে আপনা হ'তেই প্রাণের মধ্যে কেমন ক'রে উঠলো। সেই বাঙ্গালাদেশে—যেখানে আমার ঘরবাড়ি আছে, এবং আজন্মের বন্ধু-বান্ধবেরা যেখানে বিচরণ ক'চ্ছেন! তখন মনে প'ড়লো— কত কি ছেড়ে এসেছি! মায়ার বন্ধন কি কঠিন!

এই স্বদেশীয়দের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধ'রে কথাবার্তা কহার পর সেখান থেকে উঠ্‌লুম। তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। আমাদের বাসার সম্মুখে রাস্তার পরপারেই এক প্রকাণ্ড মহাদেবের মন্দির। সন্ধ্যার সময় সেখানে কাঁসরঘণ্টা বেজে উঠলো ; অনবরত দামামা বাজতে লাগলো, মধ্যে মধ্যে সুস্বর বাঁশী বাজতে লাগলো এবং মন্দিরমধ্যে ও প্রাঙ্গণে বাজারের সব লোক একত্রিত হলো। স্ত্রী-পুরুষ দেবতার সম্মুখে নিঃসঙ্কোচে গায়-গায় এসে দাঁড়ালো। আমি অপরিচিত পথিক, এক পাশে দাঁড়িয়ে এই পবিত্র দৃশ্য দেখতে লাগলুম। কি তাদের সুন্দর মুখশ্রী, কি তাদের প্রবল নিষ্ঠা ; এক সুগভীর ধর্মভাব যেন তাদের সরল হৃদয়কে পরিপূর্ণ ক'রে ফেলেছে। যখন সন্ধ্যার আরতি শেষ হলো, শঙ্খঘণ্টার রব ধীরে ধীরে সেই নৈশ আকাশে বিলীন হ'য়ে গেল এবং "ব্যোম কেদার" ব'লে সকলে ভক্তিভাবে প্রণাম ক'ল্লে, তখন এক অতি অনির্বচনীয় ভাবে হৃদয় পূর্ণ ক'রে আমি ধীরে ধীরে বাসায় ফিরে এলুম! আসতে আসতে একটা কবিতা আমার মনে প'ড়ে গেল—

"যোগী নই, পাই নাই পরমার্থ জ্ঞান,
বেদান্তের প্রতিপাদ্য চিনি না চিন্ময়ে,
আস্তিকের নাস্তিকের শুনিনি বিধান,
জানি না কি লেখে তন্ত্র পুরাণ নিচয়ে।
জানি এই যোগী যারে ধেয়ায় হৃদয়ে,
সরলা বালিকা পূজে পুষ্প-অর্ঘ্য দিয়া,
সেই বিশ্বপতি দেবে সায়াহ্নে সময়ে,
সুখী হই, ভক্তিভাবে হৃদে আরাধিয়া।।"

সন্ধ্যার পর বাজারের মধ্যে আর একটু ঘুরে দেখা গেল। বাজারের অধিকাংশ দোকানের সঙ্গেই যাত্রীদের বাসের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঘর আছে ; কেহ বা দোকানঘরের মধ্যে ও দ্বিতলে যাত্রীবাসের জন্য ঘর রেখেছে ; দেখলুম সমস্ত বাজারে তিন-চার-শতের বেশী যাত্রী থাকতে পারে না।

সন্ধ্যা পর্যন্ত আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল ; সন্ধ্যার পর একটু একটু ক'রে চারিদিকে মেঘ জমা হ'তে লাগলো। যারা গ্রহণ দেখবার আশায় ব'সেছিল, তাদের অদৃষ্টে আর গ্রহণ দেখা হ'ল না। খানিক পরে খুব মেঘ ক'রে বৃষ্টি এল। অনেকদিন পরে একটু ভাল রকম আহার হ'লো, বৈদান্তিক ভায়া এই কয় দিনের অর্ধাশন পরিপূর্ণ মাত্রায় পুষিয়ে নিলেন। আহারাদির পর সেই ঝুপঝাপ বৃষ্টির মধ্যে যখন কম্বলখানা গায়ে জড়িয়ে শয়ন করা গেল, তখন বোধ হ'লো এমন আরাম বহুদিন উপভোগ করা হয় নি।

www.pathagar.com

২৪ মে রবিবার। অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ আমাদের উঠতে একটু বেশী দেরী হ'য়েছে। তখন সূর্য উঠেছে, কিন্তু তখনো চারিদিকে মেঘ বেশ ঘন হ'য়ে ছিল ; আর সেই মেঘের মধ্য দিয়ে অল্প অল্প সূর্যকিরণ জলসিক্ত পার্বত্য-প্রকৃতির উপর এক একবার প্রতিফলিত হ'চ্ছিল ; সে এমন সুন্দর যে, সহজেই একটা কিছুর সঙ্গে তার উপমা দেবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু যার সঙ্গে উপমা দেওয়া যেতে পারে এমন কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। আমার মনে হ'লো কোন সুন্দরীর বড় বড় জলভরা চোখের উপর মুখে যদি একটুখানি হাসি ফুটে উঠে ত সে অনেকটা এই রকম দেখায়। প্রভাত-সূর্যের এই সতেজ, প্রদীপ্ত রশ্মির চেয়ে এই মেঘাবৃত প্রভাত কেমন মধুর ও সরস! বাজারের উপর সেই খোলা বারান্দায় ব'সে গিরিপ্রাচীরবেষ্টিত এই সুন্দর ক্ষুদ্র নগরটির প্রাভাতিক শোভা দেখে আমার চক্ষু জুড়িয়ে গেল ; কিন্তু বেশীক্ষণ এ শোভা উপভোগ করবার অবসর পেলুম না। স্বামীজি ও বৈদান্তিক সুসজ্জিত হ'য়ে আমার পাশে এসে দর্শন দিলেন ; সুতরাং বাঙ্‌নিষ্পত্তি না ক'রে নেমে পড়া গেল, দোকানদারের প্রাপ্য চুকিয়ে দিতে আর বেশী বিলম্ব হ'ল না।

রাস্তায় বেরিয়ে দেখি চারিদিক থেকে কলকল ক'রে ঝরণা ছুটছে, সুতরাং অনুমান করা কঠিন হ'ল না যে রাত্রিতে অসম্ভব রকম বৃষ্টি হ'য়ে গিয়েছে এবং সেই সঙ্গে বুঝলুম গতরাত্রে আমরা কুম্ভকর্ণের একটিনী ক'রেছিলুম। একটু অগ্রসর হয়েই দেখি সেই বাঙ্গালী যাত্রীদের দল নন্দপ্রয়াগের বাজারে তাঁদের এক বৎসরের ঘর-দুয়োর ছেরে রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন। তাঁদের বিদায় দেবার জন্যে বাজারের অনেক লোক সেখানে জমা হ'য়েছেন। দশদিন যেখানে বাস করা যায় সেখানকার লোকজন, এমন কি গাছপালার উপরও একটা স্নেহ জন্মায় ; আর এই পাঁচটি বাঙ্গালী স্ত্রী-পুরুষ একবৎসরকাল এই পর্বতে ক্ষুদ্র একটা বাজারের মধ্যে বাস ক'রে সকলেরই পরিচিত এবং অনেকের আত্মীয় হ'য়ে উঠবেন এ আর আশ্চর্য কি? আমি সেই দোকানের সম্মুখ থেকে সহজে চলে যেতে পাল্লুম না, আমার মনে নানা ভাবের উদয় হ'লো। স্ত্রীলোক তিনটির মধ্যে কেউ কোন পাহাড়ীর ধুলোমাটিমাখা মেয়েকে কোলে নিয়ে মুখচুম্বন ক'চ্ছেন ; মেয়েটা এতখানি আদরের কোন কারণই খুঁজে না পেয়ে অবাক্ হ'য়ে রয়েছে, কারণ সে বুঝতে পাচ্ছে না, এক বৎসর কাল ধ'রে সে তাঁদের কাছে আদর পেয়েছে, আজ এই তাঁদের শেষ আদর ; আর তাঁরা এ জীবনে তাকে দেখতে আসবেন না। একজন বাঙ্গালী রমণী একটি যুবতীর গলা ধরে চক্ষের জল ফেলছেন ; তাঁর এই এক বৎসরের সঞ্চিত স্নেহমমতা যেন চোখের জলে উথলে উঠচে। যুবতীও তার দেশগত কাঠিন্য ভুলে স্নেহশীলা বালিকার মত রোদন ক'চ্ছে। কোথায় সেই সুদূর পূর্বের শস্যশ্যামল সমতল বঙ্গের অন্তঃপুরচারিকা, আর কোথায় এই হিমালয়ের ক্রোড়স্থ পাষাণ-প্রাচীরবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র নগরের হিন্দুস্থানী যুবতী! পরস্পরের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ, কিন্তু ভালবাসা এমন দু'টি বিসদৃশ প্রাণীকে এই এক বৎসরের মধ্যেই কি দৃঢ়রূপে একসঙ্গে বেঁধে ফেলেছে! তাই আজ তারা দেশকাল ভুলে পরস্পরের জন্যে অশ্রু বিসর্জন ক'চ্ছে, আমি এই দৃশ্যে একবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম ; এই দৃশ্য আমার কতকাল মনে থাকবে। আমরা তিনজন একটু তফাতে দাঁড়িয়ে দেখছি, ছেলের দল আমাদের

www.pathagar.com

সম্মুখে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে ; বাঙ্গালীর জন্যে, আমাদেরই যারা ভাইবোনের মত তাদের জন্যে, এই পাহাড়ীদের এত স্নেহ এত আগ্রহ ; কে জানে পাহাড়ের অনুর্বর কঠিন প্রদেশে আমাদের জন্যও হয়ত করুণার কোমল উৎস শতমুখে প্রবাহিত হ'তে পারে?

পাহাড়ীদের কাছে বিদায় নেওয়া শেষ হ'লে তাঁরা আমাদের কাছে বিদায় নিতে এলেন। তাঁরা ছেড়ে যাবেন, আমার প্রাণের মধ্যে কেমন ক'রে উঠলো। জানিনে বিদেশে দেশের লোকের সঙ্গে দেখা হ'লে তাদের প্রতি এমন টান হয় কেন? বোধ হয় দেশের একটা লুপ্তস্মৃতি মনের মধ্যে হঠাৎ জেগে প্রীতিপ্রবাহে হৃদয় ভাসিয়ে দেয় ; তাই তখন আমরা আত্মপর ভুলে যাই ; শুধু মনে হয়, এরা যে দেশের আমিও সেই দেশের ; এরা আমার স্বদেশবাসী, আমার আত্মীয়। তাই সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই প্রিয়তম জন্মভূমির কথা মনে হ'ল। কোথায় আমরা কোন্ অজানিত বিষাদপূর্ণ বরফের রাজ্যে যাচ্ছি, আর এঁরা চিরবাঞ্ছিত জন্মভূমিতে আত্মীয়-বন্ধুগণের মধ্যে ফিরে যাচ্ছেন। এ-যাত্রা শেষ ক'রে যে এ জীবনে ফিরে আসবো, সে কথা কে ব'লবে? মনে পড়লো, সেই বহুদিন আগে যখন কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করতুম, সে সময় মধ্যে মধ্যে বন্ধুবান্ধদের গাড়ীতে তুলে দিতে শিয়ালদহ স্টেশনে যেতুম। তাঁরা যখন গাড়ী চড়ে বসতেন, গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে, সে সময় দেশে যাবার জন্যে প্রাণে কেমন একটা ব্যাকুলতা উপস্থিত হ'ত। সেদিন সমস্ত দিন আর কোন কাজেই মন লাগতো না, শুধু বাড়ির স্নেহকোমল স্মৃতি নিরাশপূর্ণ চপল চিত্তকে অধীর ক'রে তুলতো। আজ অনেক বৎসরের পরে, বহু দূরে এই পর্বতের মধ্যে কয়জন বাঙালী স্ত্রী-পুরুষকে দেশে যেতে দেখে মনে সেই ভাব জেগে উঠলো। এখন ঘরে মা নেই, বাপ নেই, স্ত্রী নেই, পুত্র নেই ; গৃহ অরণ্যের ন্যায় বিজন ; তবু সেই প্রাচীন স্মৃতির সমাধিমন্দিরে ফিরে যেতে মন অস্থির হ'য়ে উঠলো। অনাহারে ফলমূল মাত্র আহার ক'রে কত দীর্ঘদিন কাটিয়ে দিয়েছি, সঙ্গে কম্বল ভিন্ন সম্বল নেই, তারই উপর কত বিনিদ্র রাত্রি অতিবাহিত হ'য়েছে। পরিশ্রমেও কাতর নই ; কিন্তু হায়, কোথায় সন্ন্যাসীর সংযম, কোথায় মনের দৃঢ়তা। মনুষ্যহৃদয় যৎপরোনাস্তি দুর্বল ও অত্যন্ত অসার।

কাতর হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণচক্ষে এক রাত্রির পরিচিত বাঙ্গালী যাত্রীদের বহুদিনের পরিচিত আত্মীয়ের ন্যায় বিদায় দিলুম এবং যতক্ষণ তাঁদের দেখা যায় ততক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম। সঙ্গীদ্বয়ের মনে যে কোন রকম ভাবান্তর উপস্থিত হ'য়েছিল, তা বোধ হ'ল না। কারণ তাঁরা আজ খুব তেজে চলতে লাগলেন। আমার মনই আজ উৎসাহশূন্য ; আমি সকলের পিছনে পড়ে রইলুম।

ছ'মাইল এসে একটা টানা সাঁকো পার হ'য়ে লালসাঙ্গায় পৌঁছানো গেল। যারা রুদ্রপ্রয়াগ হ'তে কেদারনাথ দর্শন ক'রতে যায়, তারা এখানে এসে বদরিনারায়ণের পথে মেশে। রুদ্রপ্রয়াগ হ'তে আমরা অলকানন্দার ধারে ধারে এসেছি ; কেদারযাত্রীগণ রুদ্রপ্রয়াগে অলকানন্দা পার হ'য়ে মন্দাকিনীর ধারে ধারে কেদারের দিকে যায়। কেদার দর্শন ক'রে আবার চারদিনের রাস্তা নেমে এসে ডাইনের রাস্তা ধরে এই লালসাঙ্গায় বদরিকাশ্রমের রাস্তায় পড়ে। লালসাঙ্গায় দোকানের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। গঙ্গা অনেক নীচে, সেখানে নামা উঠা করা বড় কঠিন ব্যাপার, এবং সকলে এই কষ্টসাধ্য কাজে প্রবৃত্ত হয় না, কারণ পাহাড়ের গায়ে যে তিনটি উৎকৃষ্ট জলের ঝরণা আছে, তাতেই সকলের কাজ চ'লে যায়।

www.pathagar.com

লালসাঙ্গায় এসে আমরা একটা ছোট দোকানঘরে বাসা নিলুম। জায়গাটা তেমন নির্জন নয়। কেদারনাথ এবং বদরিকাশ্রম উভয় পথের যাত্রীই এখানে সমবেত হয়, সুতরাং প্রায় সর্বদাই এ স্থানটা সরগরম থাকে। এখানেও একটা থানা ও একটা দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এই দুইটি বেশ বড় রকমের। প্রথমে থানা দেখে পরে চিকিৎসালয়টি দেখতে যাব, এ রকমের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এখানে পৌঁছিয়ে যে এক ব্যাপারের গল্প শুনা গেল, তাতে আর কোথাও যেতে প্রবৃত্তি হলো না। ব্যাপারটা আবার আমাদেরই নিয়ে ; আমাদের অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের। পাঠক হয়ত গল্পটি শুনবার জন্যে একটু উদ্‌গ্রীব হয়েছেন, সুতরাং সাধু-সন্ন্যাসীদের পক্ষে গৌরবজনক না হলে আমাকে এখানে ব্যাপারটি খুলে ব'লতে হচ্ছে। ব্যাপার আর কিছু নয়, এক স্বামীজি—অবশ্য অনেক তীর্থভ্রমণ এবং প্রচুর ডাল-রুটির সর্বনাশ ক'রেছেন—সেইদিন সকালে চোর ব'লে ধৃত হয়েছেন। চুরির জিনিসও বড় বেশী নয়। এক দোকানদারের একজোড়া ছেঁড়া নাগরা-জুতা! স্বামীজির স্কন্ধবিলম্বিত ঝোলার মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদগীতার পাশে শততালিবিশিষ্ট ধূলিধূসরিত সেই অনিন্দ্য-সুন্দর নাগরা জুতা শোভা পাচ্ছিল। বেচারা রাত্রিতে এক দোকানে ছিল ; অনেকরাত্রি পর্যন্ত গীতাদি পাঠ হ'য়েছে, দোকানদার সাধু-সংস্কারের ত্রুটি করে নি। কিন্তু সাধুর নিতান্তই গ্রহের ফের ; সকালে চলে যাবার সময় সে দোকানদারের নাগরা জোড়াটা ভুলে ঝোলার মধ্যে তুলে নিয়ে "যঃ পুলায়তি স জীবতি" ক'চ্ছিল। এদিকে দোকানদারেরও সকালে উঠে কোথায় যাবার আবশ্যক হয়। সে দেখে জুতো নেই! ঐ সন্ন্যাসী ছাড়া তার দোকানে আর কেউ ছিল না, কিন্তু এই ঘোর কলিকালে জুতো যে সন্ন্যাসীর অনুগ্রহে একরাত্রে হঠাৎ জ্যান্ত গরু হ'য়ে মাঠে চরতে যাবে, নিতান্ত ছাতুখোর হ'লেও দোকানদারের মনে এমন সম্ভাবনাটা কিছুতেই স্থান পায় নি। সুতরাং সেই সন্ন্যাসীকে ধরে লালসাঙ্গার থানায় উপস্থিত ক'রলে। শুনলুম, অনেক লোক সেখানে একত্র হ'য়ে স্বামীজির যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা ক'চ্ছে এবং সন্ন্যাসীজাতির উপরও অনেক ভদ্রতাবিরুদ্ধ অপরাধ আরোপিত হ'চ্ছে। অতএব এ অবস্থায় সেখানে গিয়ে দু'চারটে মিষ্ট সম্ভাষণে পরিতৃপ্ত হওয়ার চেয়ে দোকানদারের মুখে সবিশেষ শুনাই কর্তব্য মনে কল্লুম। আরও এক কারণে সেখানে যাওয়া হয় নি ; শুনলুম চোর সন্ন্যাসী "পূরবীয়া" অর্থাৎ পূর্বদেশবাসী ; পূর্বদেশবাসীকে —কাশী, অযোধ্যা, বিহার, বাঙ্গলা এই সকল দেশের অধিবাসীকে এ দেশের লোক পূরবীয়া বলে, সুতরাং এ চোর সন্ন্যাসীর বাড়ি এই সকল দেশের কোথাও হ'লে সে আমার এক দেশবাসী, কারণ আমরা দু'জনেই পূরবীরা ; অকারণ কে এমন 'চোরের জাতভাই' হওয়ার অপবাদ ঘাড়ে ক'রতে যায়? বিশেষ আমরা যখন দোকানে বসে চোরের গল্প শুনছিলুম সেই সময় দুতিনজন লোক—দেখে বোধ হল পাঞ্জাবী, আমাদের দোকানের সুমুখ দিয়ে চোরের কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল। আমাদের দেখেই হোক, কি কথাপ্রসঙ্গেই হোক, একজন বল্লে, "তামাম পূরবীয়া আদমী চোট্টা হ্যায়!" কথাটা অম্লান বদনে হজম করা গেল। একে বিদেশ, তাতে রাস্তার লোকের কথা, এ কথার আর কে প্রতিবাদ করবে? কিন্তু দেখলাম, হুজুগে এরাও আমাদের চেয়ে কিছু কম নয়। দুপুরবেলা যতক্ষণ ছিলুম, সকলের মুখেই সেই চোর সন্ন্যাসীর কথা! বোধ হ'লো এরা এই পাহাড়ের মধ্যে একভাবেই জীবন কাটিয়ে কিছু নূতনত্বের অভাবে দারুণ বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল। আজ এই এক 'নূতন' হুজুগ জোটায় এই ভয়ানক শীতে এরা দিনকতক একটু বেশ সজীবতা অনুভব ক'রবে।

www.pathagar.com

বেলা থাকতে থাকতেই সেখান হ'তে বের হ'য়ে তিন মাইল দূরে 'ধওলা' চটিতে উপস্থিত হওয়া গেল। তখন সন্ধ্যা গাঢ় হ'য়ে আসছিল ; আকাশ পরিষ্কার ; দূরে দূরে দু'পাঁচটা বড় বড় নক্ষত্র ; পশ্চিম আকাশে অস্তমিত তপনের লোহিতরাগ অতি সামান্য প্রকাশ পাচ্ছিল এবং আমাদের আগে পাছে চারিদিকে ধূসর পর্বতশ্রেণী বিরাট পাষাণপ্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে ছিল। সেই গগনস্পর্শী স্তূপাকার অন্ধকাররাশির দিকে তাকিয়ে ভয়ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে যায়। জগতের কোন গভীর রহস্যে পাষাণবক্ষ পূর্ণ ক'রে কত যুগযুগান্তর হ'তে এরা এমনি ভাবে এখানে দাঁড়িয়ে আছে, কে বলতে পারে? আমার মত সংসারতাপক্লিষ্ট পথিক কতদিন হয়ত এমনি সময়ে এখানে দাঁড়িয়ে এই গভীর দৃশ্য দেখে এই কথাই চিন্তা ক'রেছে।

চটিতে বিশ্রাম করবার জন্যে অল্প জায়গা পাওয়া গেল, কিন্তু রাত্রে আর কিছু আহার জুটলো না। শয়ন করা গেল বটে, কিন্তু রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে শীতে হৃৎকম্প বৃদ্ধি হ'তে লাগলো। কি ভয়ানক শীত। আমরা একদিনও এমন শীতের হাতে পড়িনি। কম্বলের সাধ্য কি এ শীতকে দমন করে! স্বামীজি ও বৈদান্তিক একটু গরম হবার অভিপ্রায়ে আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিলে। আমার আবার সে অভ্যাস নেই, নিতান্তপক্ষে যদি নাক বের না ক'রে রাখি ত দম আটকে মারা যাবার উপক্রম ঘটে। কিন্তু নাক খুলে রাখতে বোধ হ'তে লাগলো রাজ্যের জমাট শীত আর কোনখান দিয়ে সুবিধা না পেয়ে সেই পথেই বুকের মধ্যে প্রবেশ ক'চ্ছে। চটিওয়ালা আবার এর উপর জানিয়ে দিলে যে, আজ শীতের আরম্ভ মাত্র! এই যদি আরম্ভ হয়, তবে শেষ না জানি কি রকম ; আমার কল্পনাশক্তি সে কথা ভাবতে দেহখানির মতই আড়ষ্ট হয়ে পড়লো। অত্যন্ত কষ্টে রাত্রি কেটে গেল। এই প্রবল শীতে আমার ভাল রকম ঘুম হয় নি, কিন্তু বৈদান্তিক ভায়ার নাসিকাগর্জন সমস্ত রাত্রিই অপ্রতিহত ভাবে চলেছিল।

২৫ মে, সোমবার—খুব সকালে উঠে রওনা হওয়া গেল। কনকনে শীত, দুইপাশে উঁচু অসমান পাহাড়, পাহাড়ের গা দিয়ে আঁকাবাঁকা অপ্রশস্ত রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে আমরা চলতে লাগলুম। এদিকে ক্রমেই গাছপালা সমস্ত কমে আসচে ; আমরা আজ যে রাস্তায় চলচি, তাতে গাছপালা নেই বল্লেই হয় ; খালি নীরস কঠিন ধূসর পর্বতশ্রেণী অভ্রভেদী হয়ে পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে। দুই একটা জায়গায় বরফ জমাট বেঁধে রয়েছে। অন্যান্য দিন কদাচ বরফ দেখতে পাওয়া যেত, কিন্তু আজ অনেক জায়গাতেই শ্বেত বরফের স্তূপ দেখা যাচ্ছে। সেই নিষ্কলঙ্ক শুভ্র বরফের স্তূপের দিকে চাইলে মনে হয়, এমন পবিত্র দৃশ্য বুঝি জগতে আর কিছু নেই।

বেলা প্রায় নয়টার সময় আমরা যে পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম, সেটা ছেড়ে একটা পরিষ্কার পথে এসে পড়লুম। এতক্ষণ দেখতে পাই নি, কারণ সম্মুখের পাহাড়ে আমাদের দৃষ্টিরোধ হয়েছিল, কিন্তু এখানে উপস্থিত হওয়ামাত্র কি অপূর্বসুন্দর মহান ও গম্ভীর দৃশ্য আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হলো! বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দেখলুম, আমরা এক সুবিশাল বরফের পাহাড়ের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছি ; তার চারিটি সুদীর্ঘ শৃঙ্গ আগাগোড়া আচ্ছন্ন। তখন সূর্য আকাশের অনেক উচ্চে উঠেছে ; তার উজ্জ্বল কিরণ এসে সেই সমুন্নত শুভ্র পর্বতশৃঙ্গগুলির উপর প'ড়েছে ; প্রাতঃসূর্যকিরণ সেই তুষার-ধবল আর্দ্র পর্বতশৃঙ্গে হিল্লোলিত হওয়াতে বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশে প্রতিক্ষণে কি যে অপূর্ব সৌন্দর্য প্রতিফলিত

www.pathagar.com

হচ্ছিল, বর্ণনা করে তা বুঝিয়ে দেওয়া যায় না ; পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম চিত্রকরের তুলিকাতে সেই অপূর্ব দৃশ্যের অতি সামান্য প্রতিকৃতিও অঙ্কিত হ'তে পারে না। মানুষের দু'খানি হাত আশ্চর্য কাজ করতে পারে ; প্রকৃতিকে লজ্জা দেবার চেষ্টাতেই বুঝি মানুষের ক্ষুদ্র দু'খানি হাতে আগ্রার জগদ্বিখ্যাত সৌধ নির্মিত হ'য়ে পথিকের নয়নমন মুগ্ধ করেছে। তাজমহল আমি অনেকবার দেখেছি ;—সে সৌন্দর্য, সে ভাস্করনৈপুণ্য নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মার্বেল প্রস্তরের সেই বিচিত্র হর্ম্য প্রকৃতির স্বহস্তের কোন রচনা অপেক্ষা হীন বলে বোধ হয় না ; কিন্তু আজ আমার সম্মুখে সহসা যে দৃশ্য উন্মুক্ত হ'য়েছে, এ অলৌকিক! মানুষের ক্ষমতা ও ক্ষমতার গর্ব এই বিরাট বিশাল নগ্ন সৌন্দর্যের পাদদেশে এসে স্তম্ভিত হ'য়ে যায় ; প্রতি মুহূর্তে নূতন বর্ণে সুরঞ্জিত অভ্রভেদী শৃঙ্গের দিকে তাকালে আমাদের ক্ষুদ্রতা ও দুর্বলতা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারি ; সৃষ্টি দেখে আমরা স্রষ্টার মহান্ ভাব কতক পরিমাণে হৃদয়ে ধারণা করবার অবসর পাই।

খানিক দূর আর অন্য দৃশ্য নেই। বামে দক্ষিণে সম্মুখে পশ্চাতে সকল দিকেই শুভ্রকায় তুষারাচ্ছন্ন পর্বতশ্রেণী। এ সকল দৃশ্য দেখবার আগে জায়গায় জায়গায় বরফের স্তূপ দেখেই মনে কি আনন্দ হ'চ্ছিল, কিন্তু এখন এই বরফের রাজ্যের মধ্যে এসে পড়াতে সেই গভীর আনন্দ অব্যক্ত বিস্ময়ে পরিণত হ'য়েছে। এক একবার আমার মনে হ'তে লাগলো সেই শস্যশ্যামল, সমতল, ধনধান্যপূর্ণ প্রদেশ, আর এই চিরহিমানীবেষ্টিত, বৃক্ষলতাশূন্য নির্জন উপত্যকা, এ কি একই পৃথিবীর অন্তর্গত?

প্রায় পাঁচ মাইল যাওয়ার পর আবার যেন একটু লোকালয়ের আভাস পাওয়া গেল। আমরা আর একটা পর্বতের উপর এসে পড়লুম। এটায় তত বরফ দেখা গেল না, স্থানে স্থানে বরফ আছে মাত্র ; এ ছাড়া এদিকে ওদিকে দু'পাঁচটা গাছপালা দেখা গেল। এ পাহাড়টা সেই বরফের পাহাড়ের একটি ক্ষুদ্র-মস্তক দরিদ্র প্রতিবেশী। আরো খানিক দূর যাওয়ার পর শুনলুম, নিকটেই একটা বাজার আছে, বাজারের নাম "পিপলকুঠি"। এই পাহাড়ের মাথায় খানিকটে জায়গা সমভূমি, সেখানেই বাজার অবস্থিত। আমরা রাস্তা ছেড়ে খানিক উপরে উঠে তবে বাজারে পৌঁছলুম। বাজার নিতান্ত মন্দ নয় ; আট-দশখানা দোকান আছে, খাদ্যদ্রব্যও মোটামুটি সকল রকমই পাওয়া যায়। বাজারের অবস্থিতি-স্থানই কিন্তু আমার সব চেয়ে মনোহর বোধ হ'ল। চারিদিক অত্যন্ত নীচু, কেবল মাঝখানে পাহাড়ের মাথার উপর বাজার। নীচের দৃশ্য বড়ই সুন্দর। আমরা একটা দোকানে আড্ডা নিলুম। আমাদের সেই দোকান বাজারের একপ্রান্তে। দোকান হতে নেমে দাঁড়িয়ে একবার নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, মাথা ঘুরে উঠলো।

'পিপলকুঠি'তেই এ-বেলা বাস করতে হবে শুনে আমাদের আত্মাপুরুষ উড়ে গেল। পাঠকদের বোধ করি স্মরণ আছে, রাস্তায় একদিন 'পিপলচটিতে' মাছির উৎপাতে বিব্রত হ'য়ে দুপুরের রৌদ্র মাথায় ক'রেই আমাদের চটি ত্যাগ করতে হয়। বাঙ্গালায় একটা প্রবাদ আছে—"ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়"—আমাদের সেই দশা। 'পিপলকুঠি' নাম শুনেই "পিপলচটির" কথা মনে প'ড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই অগণ্য মক্ষিকাকুলের সাদর সম্ভাষণের সম্ভাবনায় প্রাণে দারুণ আশঙ্কা উপস্থিত হ'লো। সঙ্গী স্বামীজি অচ্যুত ভায়াকে ডেকে ব'ল্লেন, অচ্যুত! দেখ কি আজ মহাসংগ্রামে। চটিতে যদি হাজার সৈন্য থাকে, তবে কুটিতে যে লক্ষাধিক সৈন্য থাকবে, তার আর সন্দেহ

www.pathagar.com

নেই।" যা হোক, খানিক পরেই বুঝলুম, আমাদের ভয় অমূলক ; এখানে মাছির কোন উপদ্রব নেই, কিন্তু মাছির বদলে আমাদের আর এক উপদ্রব সহ্য ক'রতে হ'লো। আমাদের দোকানদারের বাড়ি আর দোকান একই ঘরে। সেই ঘরের যে অংশে আমাদের থাকবার জায়গা হ'লো তারই আর এক অংশে দোকানদারের পরিবারগণ বাস করে। তার পরিবারের মধ্যে তার স্ত্রী, একটি ষোল সতের বছরের ছেলে, আর চারটি ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে দেখতে পেলুম। বড় ছেলেটি দোকানের কাজে বাপের সাহায্য করে, আর ছোট ছেলেমেয়েগুলি বাপ-মায়ের দোকান আর গৃহস্থালীর এলোমেলো বাড়িয়ে দেয়। আজ তাদের দোকানে এই নূতন যাত্রী কয়টি দেখে তাদের আনন্দ দেখে কে? আমাদের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপনের জন্য তারা বড়ই উৎসুক হ'য়ে উঠলো। অচ্যুত ভায়ার গম্ভীর মুখভঙ্গী ও বিজ্ঞের ন্যায় আকার ইঙ্গিত দেখে তার কাছে বড় ঘেঁষতে সাহস করলে না ; কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই স্বামীজি ও আমার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ক'রে নিলে। তিন চার বৎসরের একটি মেয়ে আমার ডাইরীখানা নিয়ে গম্ভীর মুখে তার পাতা উল্টেপাল্টে প'ড়তে আরম্ভ ক'ল্লে ; শেষে পড়া হ'লে আমার পেন্সিলটি দখল ক'রে ডাইরীর একখানা সাদা পৃষ্ঠায় দেব-অক্ষরে নানা কথা লিখতে লাগলো। আমাদের মত লোকের সাধ্য কি সে সব হরফের অর্থ আবিষ্কার করি। আজ কতদিন চ'লে গিয়েছে, সেই বালিকার কথা ভুলে গিয়েছিলুম ; বালিকাটিও এতদিন না জানি কত বড় হ'য়ে উঠেছে ; হয়তো সে তার সেই শৈশবচাপল্য এতদিনে ভুলে গিয়েছে ; কিন্তু আজ এই বাঙ্গালা দেশের এক প্রান্তে এক ক্ষুদ্রগৃহে ব'সে যখন ডাইরী খুলে এই সব লিখছি, তখন তাহার এক পৃষ্ঠায় বালিকা-হস্তের হিজিবিজি দেখে, সেই সুদূর পর্বতশিখরের দোকানীর সেই ছোট মেয়েটির কথা মনে হ'লো। পেন্সিলের দাগ, আমার মনের মধ্যে তার সেই সুন্দর মুখখানি, দুটি মোটা মোটা চোখ, কোঁকড়া কোঁকড়া বিশৃঙ্খল চুলের রাশের কথা জাগিয়ে দিলে। আমার প্রবাসের অন্যান্য স্মরণচিহ্নগুলির মধ্যে সাদা কাগজে বালিকাহস্তের পেন্সিলের লেখা একটি, কিন্তু এর মধুরত্ব আর কেউ বুঝতে পারবে না, শুধু আমার স্মৃতিতেই এর ক্ষুদ্র ইতিহাস সন্নিবদ্ধ। পেন্সিলের দাগগুলি ক্রমেই মুছে যাচ্ছে, আমিও হয়ত একদিন সেই ছোট মেয়েটির কথাও ভুলে যাব।

মেয়েটি যখন আমার ডাইরীতে এই রকম পাণ্ডিত্য প্রকাশ ক'চ্ছিল, সেই সময় তার একটি বড় ভাই, বয়স প্রায় ছয় বৎসর হবে, আমার পর্বতভ্রমণের সুদীর্ঘ যষ্টিখানা Evolution theory জোরে অশ্বরূপে পরিণত করে তাতেই সোয়ার হয়ে চাবুক লাগাচ্ছিল। এই রকম আদরের ক্ষুদ্র সঙ্গীগুলির সঙ্গে যে কত অনর্থক বাক্যব্যয় ক'রতে হ'য়েছিল, তার সংখ্যা নেই। তাদের যে সমস্ত প্রশ্ন, তার সদুত্তর দেওয়া আমাদের কাজ নয়। কিন্তু যা হয় একটা উত্তর পেয়েও তাদের সন্তোষের লাঘব হয়নি! তবে একটি ছেলের একটি প্রশ্ন আমার বহুকাল মনে থাকবে। তার বয়স বছর আষ্টেক। সে আমাদের তীর্থভ্রমণ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে ক'রতে অবশেষে ব'ল্লে "বাপ্‌জী নে বোলা কি স্বামী লোগোকি সাথ নারায়ণজী বাতচিজ করতা হ্যায়, তুমহারা সাথ নারায়ণজীকো কেয়া বাৎ হুয়া?"—প্রশ্ন শুনে আমার চক্ষু স্থির। ভেবেচিন্তে বল্লুম, "হামারা সাথ আবিতক নারায়ণকা মুলাকাত নেই হুয়া।" আমার কথা শুনে বালক কিছু বিরক্ত হ'য়ে ব'ল্লে, "আরে, তব কাহে ঘর ছোড়কে সাধু হুয়া?" কথাটা বালকের বটে, কিন্তু তার মধ্যে কি গভীর ভাবই

www.pathagar.com

লুকানো ছিল! ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, কিন্তু ধার্মিক সাধু বটে অনেক। আমি ধার্মিকও নই, সাধুও নই। কেবল সাধুর দলে পড়ে এই সব নিগ্রহ ভোগ করছি। আগে জ্ঞান ছিল, কেবল অসাধুর সঙ্গে বেড়ালেই কৈফিয়তের তলে পড়তে হয়, এখন দেখছি সাধুর সহচর হলেও সকল সময় কৈফিয়ৎ এড়ানো যায় না।

আজ বৈকালে আর বের হবার ইচ্ছা ছিল না। একে ত বেলা বেশী নেই, তারপর এমন কনকনে শীত, বেলা থাকতে কম্বলের ভিতর থেকে হাত পা বের করা শক্ত। আমরা রওনা হতে একটু ইতস্ততঃ করাতে সকলেই ব'ল্লেন, এখন থেকে এই বরফ ভেঙে চলা সহজ নয়। আমাদের গতিশক্তি ক্রমে কমে আসচে, আবার এ সময় যদি আমরা দু'বেলার বদলে একবেলা চলতে আরম্ভ করি তা হ'লে বদরিকাশ্রমে পৌঁছুতে আমাদের আরো বিলম্ব হ'য়ে যাবে। সুতরাং আমরা চলতে আরম্ভ ক'ল্লুম। দুমাইল দূরে 'গড়ুইগঙ্গা' চটি পর্যন্ত আসতে আসতেই সন্ধ্যা হ'য়ে গেল, কাজেই সেখানে রাত্রিবাস করতে হ'ল।

২৬ মে, মঙ্গলবার।—খুব সকালে চলতে আরম্ভ ক'ল্লুম। আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে তিনটি প্রাণী চ'লছি। জ্যৈষ্ঠমাসের প্রবল রৌদ্রে বোধহয় এখন আমাদের বঙ্গভূমি মরুভূমিতে পরিণত হবার উপক্রম হ'য়েছে। বাঙ্গলা ও উত্তর-পশ্চিমের সর্বত্র লোকজন গলদ্‌ঘর্ম হয়ে শুধু "জল জল" ব'লে চীৎকার ক'চ্চে আর আমরা বরফস্তূপের ভিতর দিয়ে চলছি, যেন চিত্রহিমানীমণ্ডিত মেরুপ্রদেশ! মেরু-প্রবাসী, কঠিনব্রত পৃথিবীর গুপ্ত সত্যানুসন্ধিৎসু সন্ন্যাসীবর্গের কথা মনে জেগে উঠলো। কি তাঁদের যত্ন, উৎসাহ ও একাগ্রতা! এর চেয়ে প্রচণ্ড শীতেও বহুদূরবর্তী, অজ্ঞাত, বিপদসঙ্কুল প্রদেশে মৃত্যুভয় তুচ্ছজ্ঞান ক'রে তাঁরা দিনের পর দিন কি অসাধারণ পরিশ্রমই না করেন। আর আমরা কি করি? হৃদয়ে অনেকখানি অবিনয় ও মাথায় অহঙ্কারের দুর্বহ বোঝা নিয়ে প্রকাণ্ড সাধু সেজে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াই। হৃদয়ে ভগবানের প্রতি ভক্তি ও নির্ভর, মানুষের প্রতি স্বতঃউৎসারিত প্রেমপ্রবাহের একান্ত অভাব, কিন্তু তবুও আমরা ইহকালে মানুষের ভক্তি ও পরকালে অনন্ত স্বর্গের দাবী করি ; কারণ আমরা সাধু, এবং আমরা তীর্থ পর্যটন ক'রে থাকি! এই সমস্ত কথা ভাবতে ভাবতে "গড়ুইগঙ্গা" থেকে ছ'মাইল দূরে 'কুমারচটিতে' উপস্থিত হলুম, তখন বেলা প্রায় বারোটা। এখানে নামমাত্র খাওয়া-দাওয়া করে অল্প বিশ্রামের পর আবার রওনা হওয়া গেল। তিন মাইল চ'লে সন্ধ্যাবেলা একটা পাহাড়ের গায়ে ডাকহরকরাদের আড্ডার মত নির্জন কুটির দেখতে পেলুম। সেই পত্রকুটিরে রাত্রিবাস স্থির করা গেল। অন্ধকার রাত্রি, কোন দিকে জনমানবের সাড়াশব্দ নেই, নিকটে কোন লোকালয় আছে, বলেও বোধ হলো না। এই বহুদূরবিস্তৃত, গগনস্পর্শী পর্বতশ্রেণীর মধ্যে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আমরা তিনটি পথশ্রান্ত, শীতক্লিষ্ট পথিক কোন রকমে রাত্রি কাটিয়ে দিলুম।

২৭ মে, বুধবার।— আমরা যোশীমঠের খুব নিকটে এসে প'ড়েছি। সকালে উঠে খুব উৎসাহের সঙ্গে হাঁটতে লাগলুম। রাস্তায় তখনো অনেক জায়গা বরফে ঢাকা। দিনকতক আগে সে পথ প্রায় বরফাবৃত ছিল, তা বেশ বুঝতে পারা গেল। তখন খুব বরফ গলছে। এ পথে "চড়াই উৎরাই" তত বেশী না থাকলেও এই বরফের উৎপাতে আমাদের চ'লতে বড় অসুবিধা হচ্ছে। আমাদের পাঁচ মাইল পথ আসতে বেলা দুপুর হ'য়ে গেল। পাঁচ মাইল এসে যোশীমঠে (জ্যোতির্মঠে) উপস্থিত হ'লুম।

www.pathagar.com

যোশীমঠ

জ্যোতির্মঠ

২৭ মে, বুধবার।—আগের দিন রাত্রে আমরা যে চটিতে ছিলুম, সেখান হ'তে যোশীমঠ মোট পাঁচমাইল মাত্র, কিন্তু এই পাঁচমাইল আসতেই আমাদের কত সময় লেগেছিল, তা পূর্বেই ব'লেছি। যোশীমঠ যখন আর প্রায় এক মাইল দূরে আছে, সেই স্থানে এসে দেখলুম, পাহাড়ের গা বেয়ে একটা রাস্তা নীচের দিকে চ'লে গিয়েছে, আরো দেখলুম যে সকল যাত্রী আসছিল, দুই একজন বাদে সকলেই সেই পথে নেমে গেল। তারা কোথায় যায় জানবার জন্যে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হওয়ায় একজন সহযাত্রীকে সে কথা জিজ্ঞাসা কল্লুম। তিনি উত্তর দিলেন, আমরা যে পথে যাচ্ছি, এইটি যোশীমঠের পথ। যাত্রীরা সাধারণতঃ এ পথ দিয়ে নারায়ণ দর্শন করতে যায় না, তারা ঐ নীচের পথ দিয়ে বরাবর বিষ্ণুপ্রয়াগে চ'লে যায়, তারপর নারায়ণ দেখে ফেরবার সময় যোশীমঠ দিয়ে আসে। সেও যে সকলে আসে তা নয়। আমাদের এই রাস্তা থেকে একটা প্রকাণ্ড উৎরাই (দেড়মাইলের বেশী) নামলেই বিষ্ণুপ্রয়াগ।

নারায়ণ-দর্শনে অনেক যাত্রীই যায়, কিন্তু তারা যোশীমঠে না গিয়ে কেন যে আশপাশ দিয়ে যাওয়া-আসা করে, তা আমি বুঝতে পারি নে। হিন্দুর কাছে ত যোশীমঠ অত্যন্ত আদরের সামগ্রী ; তবু এখানে লোকের গতিবিধির অভাবের কারণ এই ব'লে মনে হয় যে, এ পথে যারা আসে সত্যের প্রতি তাদের ততটা আদর নেই। এবং প্রকৃত জ্ঞানলাভের চেষ্টা অপেক্ষা তীর্থদর্শনের দ্বারা পাপক্ষয় ও পুণ্যার্জনকেই তারা তীর্থভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ব'লে মনে করে ; সুতরাং তাদের কাছে যোশীমঠের তেমন সম্মান দেখা যায় না। আমি এখন পর্যন্ত বদরিকাশ্রম দেখি নি, কিন্তু এখানে এসে আমার মনে হলো, যত কষ্ট ক'রেই বদরিকাশ্রমে যাওয়া যাক, যোশীমঠে আসবার জন্যে তার চেয়ে শতগুণে বেশী কষ্ট স্বীকার করাও সার্থক। যদি ইয়ুরোপ, কি আমেরিকায় যোশীমঠের মত স্থান থাকতো, তা হ'লে কত পণ্ডিত, ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান কত শিক্ষিত যুবক, প্রতি বৎসর সেখানে সমবেত হ'য়ে কত গুপ্ত সত্য আবিষ্কার ক'রে ফেলতেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, এ দেশে সে সম্ভাবনা কোথায়?

উপরেই ব'লেছি, যোশীমঠ হিন্দুর কাছে একটা মহাতীর্থ। কিন্তু এটি যে শুধু হিন্দুরই তীর্থস্থান তা নয়। যেখানে নারায়ণের বা মহাদেবের কিংবা অন্য কোন দেবদেবীর প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই স্থানই হিন্দুর পবিত্রতীর্থ, কিন্তু যেখানে দেবোপম মানব আপনার শান্ত পবিত্র চরিত্রে চারিদিক মধুর, স্নিগ্ধ ক'রে রাখেন, এবং মানবের ক্ষুদ্রতা অপূর্ণতার অনেক ঊর্ধ্বে দেবমহিমায় বিরাজ করেন, সে স্থান শুধু হিন্দুর তীর্থ নয়, সে স্থান বিশাল মানবজাতির সাধারণ তীর্থক্ষেত্র। দেবতার উদ্দেশে উপহার প্রদানের জন্য সেখানে কেহ ফলপুষ্পাদি নিয়ে যায় না বটে, কিন্তু নিখিল মানবহৃদয়নিঃসৃত ভক্তি ও প্রীতির পুণ্যসৌরভে সেই দেব-মানবের অমরকীর্তি মন্দির পরিব্যাপ্ত হ'য়ে থাকে।

এই যোশীমঠ একজন প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার কীর্তিমন্দির। শঙ্করাচার্য ইহার প্রতিষ্ঠাতা, এবং এইখানেই তাঁর জীবনের অনেকদিন অতিবাহিত হ'য়েছিল। অতএব বলা বাহুল্য যে যোশীমঠ শুধু ভক্ত হিন্দুর কাছে নয়, ঐতিহাসিকের কাছেও বিশেষ আদরের

www.pathagar.com

সামগ্রী। শঙ্করাচার্য কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন, সে তত্ত্ব নিরূপণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; সে জন্য কোন রকম চেষ্টাও করিনি; চেষ্টা ক'ল্লে হয়ত একটু ফললাভ হ'তো। কিন্তু বাঙ্গালী-জন্ম গ্রহণ করে সেরূপ করা যে এক মহা দোষের কথা! আমরা প্রত্নতত্ত্ব লিখি, কিন্তু তাতে কতটুকু নিজস্ব থাকে? কেবল তর্জমা করি এবং একজন বৈদেশিক কঠোর পরিশ্রম ও আজীবন সাধনা দ্বারা যে সত্যটুকু আবিষ্কার ক'রে গেছেন, তারই উপর টিকাটিপ্পনী, ভাষ্য ক'রে দোষগুণের অতি সূক্ষ্ম আলোচনা দ্বারা আমাদের পাণ্ডিত্য স্তূপাকারে ফাঁপিয়ে তুলি। এই ত আমাদের ক্ষমতা! আজকাল শঙ্করাচার্যের জন্মকাল নিয়ে বঙ্গ-সাহিত্যে বেশ একটু আলোচনা চ'লচে; আমাদের মনে হয় সে আলোচনা আন্তরিক নয় এবং তা ইতিহাসের জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিতদের সময়ক্ষেপণের উদ্দেশ্যহীন উপায় মাত্র। কিন্তু বাস্তবিকই যদি এ সম্বন্ধে একটা সত্য আবিষ্কারের জন্য প্রাণে গভীর আগ্রহ জেগে উঠতো, তা হ'লে কি আমরা স্থির থাকতে পারতুম? কখনো না। শঙ্করাচার্য সম্বন্ধীয় যে সকল রচনা, প্রাচীন গ্রন্থ, অনুশাসন ও নিদর্শনাদি যোশীমঠে আছে শুনা গেল, তাতে বুঝলুম একটু চেষ্টা ক'ল্লেই তাঁর সম্বন্ধে সমস্ত কথা সহজে জানতে পারা যায়। কিন্তু আমি মূর্খ, জ্ঞানলালসা-বিরত দ্বিপদ মাত্র, কাজেই সেদিকে আমার মন যায় নি। কিন্তু যাঁরা ভারতের লুপ্তপ্রায় ইতিহাসের পঙ্কোদ্ধারে বাস্তবিক বদ্ধপরিকর, তাঁদের এই সমস্ত দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে এসে সত্যের সন্ধানে লিপ্ত হওয়াই উচিত। যা হ'ক, অন্যান্য দেশে হ'লে এ রকম আশা করা অন্যায় হ'ত না, কারণ সে সকল দেশের লোক জীবনটা অসার মায়াময় ব'লে কোনরকমে কাটিয়ে দিতে রাজী নয়; যার উপর সমাজের ও দেশের মঙ্গল, পরিশেষে সমগ্র মানবজাতির মঙ্গল নির্ভর করে, এমন কাজে তারা প্রাণপণে নিযুক্ত থাকে এবং মৃত্যুর উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ যখন একদলকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তখন আর এক দল অকম্পিত হৃদয়ে সেই উদ্দাম স্রোতের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু আমাদের কাছে জীবন স্বপ্ন, জগৎ মায়াময়, সংসার মরুভূমিতুল্য। কোনরকমে চোখ মুখ বুজে যদি চল্লিশটা বছর পার হ'তে পারি, তা হ'লে আমাদের আর পায় কে? ইহজীবনের কাজে ইস্তফা দিয়ে শৈশবের সুখস্মৃতির রোমন্থনে মগ্ন হই, না হয় পৌত্রাদি পরিবেষ্টিত হ'য়ে তাদের সঙ্গে নানারকম প্রীতিকর সম্বন্ধ পাতিয়ে পুরানো মরচেপড়া রসিকতার প্রবৃত্তিকে কিছু উজ্জ্বল ক'রে তুলি। আমাদের দিয়ে দেশের আবার উপকার হবে! যোশীমঠে উপস্থিত হ'য়ে শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে নানা রকম কথা শুনতে শুনতে নিজের সম্বন্ধে আমার মনে এই প্রকার ভাবেরই উদয় হ'চ্ছিল। দুঃখ বেশী হ'লে মনের মধ্যে নিজের দুর্বলতার কথাই বেশী বাজে। এ কথার উপর কোনও যুক্তি তর্ক নেই এবং কোনও দার্শনিক যদি এই মত খণ্ডন করবার জন্য প্রস্তুত হন, তা হ'লে আমি সে ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক মনে করি না।

যা হ'ক যোশীমঠে এসে শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে যে সকল কথা জনতে পেরেছিলুম, তারই এখানে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করি। এসমস্ত কথার সঙ্গে ইতিহাসের কতটা মিল আছে তা আমি বলতে পারিনে, ঐতিহাসিকেরা তা বুঝতে পারবেন; তবে এইটুকু বলা যেতে পারে যে পথেঘাটে সাধু-সন্ন্যাসীর দ্বারা যে সমস্ত তত্ত্ব সংগৃহীত হয়, তার মধ্যে অনেক গলদ থাকাই সম্ভব।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য হিন্দুর চারিটি মহাতীর্থে চারিটি মঠ স্থাপন করেন। তাঁর

www.pathagar.com

আবির্ভাবকালে ভারতে হিন্দুধর্ম নিতান্ত নিষ্প্রভ জড়তাসম্পন্ন হ'য়ে পড়ে, এবং বৌদ্ধধর্মের প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে প্রাচীন ধর্ম ও ক্রিয়াকর্ম সমস্ত প্লাবিত হ'য়ে যায়। হিন্দুধর্মের এই অধোগতির পর বৌদ্ধধর্মের প্লাবন ভেদ ক'রে তার যে পুনরুত্থান হয়, তা মহাভারতীয় যুগের সেই তেজময় মহাপ্রতাপসম্পন্ন কর্মশীল জীবনের একটা বিরাট কম্পনে হিন্দু-সমাজের সর্বাঙ্গ পূর্ণ করতে পারেনি সত্য, কিন্তু তা হিন্দু-সমাজে এক নব প্রাণের প্রতিষ্ঠা ; এবং তাঁহার স্থাপিত এই মঠ চতুষ্টয়ই তাঁহার প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র। দ্বারকায় তিনি যে মঠ স্থাপন করেন, সেই মঠের নাম "শারদা মঠ", সেতুবন্ধ-রামেশ্বরে স্থাপিত মঠের নাম "সিঙ্গিরী মঠ", পুরুষোত্তমে "গোবর্ধন মঠ", এবং হিমাচলের এই দুর্গমপ্রান্তে "যোশীমঠ" যুগাতীত কাল হ'তে বিস্তীর্ণ ভারতে তাঁর অমরকীর্তি ঘোষণা কচ্চে। স্থানমাহাত্মের অনুসরণ ক'ল্লে এই মঠ বদরিকাশ্রমেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু বদরিকাশ্রম বৎসরের মধ্যে আটমাস বরফে ঢাকা থাকে, সুতরাং সেখানে বাস করা অসম্ভব বুঝে সে স্থানের পরিবর্তে এখানেই মঠ স্থাপিত হ'য়েছে। এই মঠ অতি পুরানো বলেই মনে হয়।

বর্তমান সময়ে পণ্ডিতেরা শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব-কালের যে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ ক'রেছেন, তাতে কারো মতে তিনি ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে এবং কারও মতে আরও দুইশ বৎসর পরে অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন। বদরিকাশ্রমে যাওয়ার পর যোশীমঠের মঠাধ্যক্ষের সঙ্গে আমার সেখানে দেখা হয়েছিল। কথাপ্রসঙ্গে শঙ্করাচার্যের কথা উঠলে তিনি বল্লেন, স্বামীজি (শঙ্করাচার্যজি) অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগেই প্রাদুর্ভূত হন। তিনি আরো বল্লেন যে, তার সঙ্গে আমাদের যোশীমঠে দেখা হ'লে এ সম্বন্ধে অল্পবিস্তর প্রমাণও তিনি দেখাতে পারতেন। যোশীমঠে অনেক পুরানো পুঁথি ছিল ; তার কতক কতক নানারকম বিপ্লবে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে ; কিন্তু সেই হস্তলিখিত কীটদষ্ট জীর্ণ প্রাচীন গ্রন্থের কতকগুলি এই মঠে বর্তমান আছে এবং আমরা যদি পুনর্বার যোশীমঠে যাই, তা হ'লে মঠাধ্যক্ষ মহাশয় আমাদের আহ্লাদের সঙ্গে তা দেখাবেন। সেই সমস্ত জীর্ণ গ্রন্থে শুধু যে শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব কালেরই নিরূপণ হবে তা নয়, তাতে সে সময়ের সামাজিক অবস্থা, তৎকালিক রাজনীতি, হিন্দুধর্ম ও ধর্মাদির উন্নতি বিস্তৃতি ও অবনতি, সাধারণ লোকের ধর্মে আস্থা এবং ধর্ম সম্বন্ধে মতামত প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয় বিবৃত আছে। এ সকল পুঁথির সাহায্যে প্রাচীন গুপ্ত সত্য আবিষ্কার দ্বারা দেশের যে অনেক উপকারসাধন করা যেতে পারে তার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু কে এতখানি কষ্ট স্বীকার ক'রে এই দুর্গম দুরারোহ পর্বতে এসে এই কঠিন কাজে হস্তক্ষেপ ক'রবে? আমাদের দেশে এখনো সে সময় আসে নি ; এবং আমরা এখনও এরূপ কঠিন ব্রত গ্রহণ করবার উপযুক্ত হই নি। সত্যের জন্যে প্রাণ দেবার কথা বহু পূর্বে শুনা যেত বটে, কিন্তু এখন নকল-নবিশেরই প্রাধান্য।

মনে ক'রেছিলুম বদরিকাশ্রম হ'তে ফিরবার সময় যোশীমঠ সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যাব, কিন্তু নানা রকম বাধা-বিঘ্ন ঘটায় আর সে বিষয়ে হাত দিতে পারি নি। কখনো যে সে আশা পূর্ণ হবে, তারও কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। যদি আমাদের উৎসাহশীল ইতিহাসপ্রিয় কোন পাঠক এই দেশহিতকর কাজে হস্তক্ষেপ ক'রতে চান, যদি লুপ্তপ্রায় গুপ্ত সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া উপযুক্ত মনে করেন,

www.pathagar.com

তা হ'লে যোশীমঠ ছাড়া এমন আরো দুচারটি স্থানের নাম করতে পারি, যেখানে সন্ধান ক'ল্লে অনেক প্রাচীন তত্ত্ব আবিষ্কার হ'তে পারে।

আমরা যে পথে যোশীমঠে গেলুম, সে পথটি পাহাড়ের গায়ে আঁকাবাঁকা, পথের দু'ধারে শ্রেণীবদ্ধ দোকান। দোকানগুলি নিতান্ত সামান্য, তার প্রায় অধিকাংশই দোতলা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষগুলি যেন পর্বতের গায়ে মিশে রয়েছে। কলিকাতার বড় বড় অট্টালিকাগুলিতে যাঁরা চিরদিন বাস ক'রে আসছেন, তাঁরা এই ছোট ছোট ঘরগুলি দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস ক'রতে পরবেন না যে এইটুকু ঘরে সাড়ে তিন হাত দীর্ঘ মানুষ কিরূপে বসবাস করে! এই কথা বৈদান্তিক ভায়াকে বলাতে তিনি একটা পৌরাণিক গল্পের অবতারণা ক'ল্লেন। বিস্তৃত হ'লেও তার একটা সংক্ষিপ্তসার পাঠক মহাশয়কে উপহার দেওয়া যেতে পারে। বৈদান্তিকের মুখে শুনলুম, পূর্বকালে এক ঋষি ছিলেন ; (নামটা বেশ জাঁকাল রকম, কিন্তু স্মরণ হচ্ছে না) সেই ঋষি অনেক বৎসর যাবৎ তপস্যা করার পর তাঁর কেমন সখ হ'লো যে একটুখানি ঘর তৈয়েরি ক'রে তার নীচে মাথা রেখে দিনকতক আরামে থাকবেন। কিন্তু মানুষের পরমায়ুর কথা ত আর বলা যায় না, যদি শীঘ্রই পরমায়ু শেষ হয়, তবে অকারণ একখানি ঘর তোলা কেন? তাই একবার ধ্যান ক'রে পরমায়ুর শেষ মুড়োর অনুসন্ধান করা হলো ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দেখলেন তাঁর পরমায়ুর আর মোটে পাঁচ হাজার বছর বাকি। অতএব এই সামান্য দিনের জন্যে ঘর তুলে অকারণ ঝঞ্ঝাটের আবশ্যক কি? এই সিদ্ধান্ত ক'রে তিনি এক গাছতলায় ব'সেই সেই সামান্য কয়েকটি বছর কাটিয়েদিলেন। ইতিমধ্যে একদিন একটি বড় গোছের দেবতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। অন্যান্য কথাবার্তার পর দেবতাটি ব'ল্লেন, "আপনার একখানি কুটির হ'লে ভাল হয়, গাছতলাটি বাসের পক্ষে খুব নিরাপদ স্থান নয়।"— আমাদের অল্পায়ু ঋষি ঠাকুরটি উত্তর দিলেন যে, "মোটে পাঁচহাজার বছর বাঁচবো, তার জন্যে আবার ঘর!"—অর্থাৎ দু'পাঁচ লাখ বৎসর বাঁচবার সম্ভাবনা থাকতো, তা হ'লে একদিন একটা কুঁড়ে-টুড়ে তৈয়েরি ক'ল্লেও করা যেত। বৈদান্তিক এই দৃষ্টান্তের সঙ্গে উপদেশ জুড়তেও ছাড়লেন না ; তিনি বল্লেন, এই ঘটনা থেকে বুঝা যাচ্ছে, ইহলোককে আমরা কত তুচ্ছ জ্ঞান করি, পরলোক আমাদের স্থায়ী বাসস্থান। দিনকতকের জন্যে এই ইহলোকের প্রবাসে এসে তিন চার তলা বাড়ি তুলে স্থায়ী রকমে বাসের বন্দোবস্ত, সে কেবল ইউরোপীয়গণের বিলাস-রসসিক্ত দুর্বল অন্তঃকরণের পক্ষেই শোভা পায়, এবং তাঁদের অনুকরণপ্রিয় দেশীয়গণ সম্বন্ধেও এ কথা খাটতে পারে। এই কথায় বৈদান্তিকের সঙ্গে দারুণ তর্ক বেধে গেল। আমি বল্লুম, হুঁ, ইউরোপীয়গণের এ একটি ভয়ানক ত্রুটি বলে অবশ্য স্বীকার করতে হবে ; কারণ তাঁরা যে কয়টা বছর বাঁচেন, তাতে তাঁদের মহাপ্রাণী একটু সুখস্বচ্ছন্দতা, একটু আরাম ও তৃপ্তি অনুভব করবার অবসর পায়। আর তাঁরা যে কিছু কাজ করেন, তাতেও তাঁদের নামগুলিকে কিছু দীর্ঘকাল ইহলোকে স্থায়ী করবার কিঞ্চিৎ বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু আমাদের ঠিক উলটো ব্যবস্থা ; জীবনটি পরিপূর্ণমাত্রায় অপব্যয় করাই আমাদের বৈরাগ্যের প্রধান লক্ষণ। যা হোক সুখের বিষয় স্বামীজির বিশেষ যত্নে আমাদের এই আন্দোলন অতঃপর নিবৃত্তি হ'য়ে গেল। আমরা চলতে চলতে বাজার দেখতে লাগলুম ; দেখলুম বাজারে সকল রকম জিনিসই পাওয়া যায়, এমন কি সোনা-রূপার কারিগর এবং টাকাকটি লেনদেনের মহাজন পর্যন্ত এখানে

www.pathagar.com

আছে। এসকল এখানে থাকবার কারণ যোশীমঠ বদরিনারায়ণের মোহান্তের "হেড কোয়ার্টার" ; তিনি এখানে সশিষ্যে বাস করেন। এতদ্ভিন্ন যে সমস্ত পাহাড়ী ভুটিয়া ও নেপালীগণ বদরিকাশ্রমে বাস করে, তারা শীতকালে সেখানে থাকতে না পেরে এখানে এসে কয়েকমাস কাটিয়ে গ্রীষ্মকালে আবার দেশে ফিরে যায়।

যোশীমঠের দু'মাইল নীচে পাহড়ের পাদদেশে বিষ্ণুপ্রয়াগ। বিষ্ণুপ্রয়াগেও অনেক লোক বাস করে, কিন্তু তা ছেড়ে আর খানিক আগে গেলে আর লোকালয় দেখা যায় না। বলতে গেলে বদরিকাশ্রমের রাস্তায় বারোমাসের লোকালয়ের এখানেই শেষ ; তবে এর পরে দু'একটি জায়গা আছে, সেখানে কোন কোন বছর শীতের প্রাবল্য কিছু কম হ'লে দু-একঘর লোক বাস ক'রে থাকে। কিন্তু যোশীমঠের মতন এমন আড্ডা আর নেই।

এই সকল কারণেই যোশীমঠ সহরের মত ; কিন্তু যে সকল প্রাচীন গৌরবের চিহ্ন আজও যোশীমঠে বর্তমান আছে, তা দেখবার কি বুঝবার লোক বড় একটা দেখা যায় না। আমরা বাজারের মধ্য দিয়া ঘুরতে ঘুরতে দাতব্য চিকিৎসালয়ের পাশে একটা দোকানে আশ্রয় নিলুম।

পূর্বেই ব'লেছি, যোশীমঠের রাস্তা পাহাড়ের গায়ে। যোশীমঠের পাহাড়টা একটু বাঁকা, এই বাঁকের অল্প নীচেই খানিক সমতল স্থান। এই স্থানটুকু এক কাঠার কিছু বেশী হবে ; তারই উপর পর্বতের কোলের মধ্যে হিন্দুর গৌরবস্তম্ভ শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত যোশীমঠ বিরাজিত। মন্দিরটি বেশী বড় নয়। আমরা যে দোকানে বাসা নিয়েছিলুম, মন্দিরের চূড়া ততদূর উঁচু নয়।

আমরা দোকানে আর বিশ্রাম কল্লুম না। লাঠি আর কম্বল দোকানঘরে ফেলে তখনই মঠ-দর্শনে বের হওয়া গেল। যোশীমঠের রাস্তা দিয়ে নীচে নামতে নামতে রাস্তার পাশে আর একটা মন্দির দেখতে পেলুম। এই মন্দিরে প্রবেশ করি কি না ভাবচি এমন সময় একজন পথি-প্রদর্শক জুটে গেল। তার সঙ্গেই আমরা মন্দিরে প্রবেশ কল্লুম। দেখলুম, মন্দিরটা বহুকালের পুরাতন। কত শতাব্দীর বিপ্লব পরিবর্তনের নীরব ইতিহাস যে এই প্রাচীন মন্দিরের পাষাণ-প্রাচীরে বন্দী আছে, তা নির্ধারণ করা যায় না! কিন্তু এ মন্দির এত দৃঢ় যে, একটা জমাট পাহাড়র স্তূপ বল্লেও অত্যুক্তি হয় না, এবং মনে হ'লো সৃষ্টির শেষদিনেও তা থেকে একখণ্ড পাথরও বিচ্যুত হ'য়ে পড়বে না। আমাদের পথিপ্রদর্শক ব'ল্লে, এ মন্দিরটি শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের অনেক পূর্বে নির্মিত।

আমরা যখন মন্দিরে প্রবেশ করি নি তখন মনে হ'য়েছিল, অন্যান্য মন্দিরেও যা দেখি, এখানেও হয়ত তাই দেখবো—সেই অনাদি শিবলিঙ্গ না হয় অনন্ত শালগ্রামশিলা ; খুব বেশী হয়ত সুন্দর সুবেশ এক নারায়ণ-মূর্তি! কিন্তু সে সব কিছুই আমার দৃষ্টিগোচর হ'ল না, শুধু মন্দিরের মাঝখানে তিন হাত কি সাড়ে তিন হাত লম্বা ও এক হাত চওড়া একখানি সিন্দূরমাখানো কিছু ;—তা' কাঠও হ'তে পারে, পাথরও হ'তে পারে ; আবার লোহা কি ইস্পাত হওয়াও আশ্চর্য নয়, কারণ তেল সিন্দূর ছাড়া তার কোন স্বরূপ অবধারণ করতে পাল্লুম না। প্রথমে মনে কল্লুম হয়ত বা লোকে এই আসনখানাই পূজা করে। কিন্তু আমাদের পথি-প্রদর্শক যে এক লোমহর্ষণ কাহিনী ব'ল্লে, তা শুনে আতঙ্কে আমার সর্বশরীর শিউরে উঠলো। তার মুখে শুনলুম যে, এইখানে এক দেবীমূর্তি বহুকাল

www.pathagar.com

হ'তে প্রতিষ্ঠিত ছিল। নররক্ত ভিন্ন অন্য প্রাণীর রক্তে তাঁর পিপাসা দূর হ'তো না বলে তাঁর সম্মুখে প্রতিদিন নিয়মমত নরবলি দেওয়া হ'তো। এতদ্ভিন্ন উৎসব উপলক্ষে কোন কোন দিন এত মনুষ্যমুণ্ড দেহচ্যুত হ'তো যে তাদের উচ্ছ্বসিত শোণিতপ্লাবনে মন্দিরের সমস্ত প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হ'য়ে যেতো। সে বল্লে যে, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক এই জায়গায় আমার পায়ের নীচেই শত শত নিরপরাধ ব্যক্তি এই ভয়ানক অনুষ্ঠানের অনুরোধে নিহত হ'য়েছে। বোধ করি, তাদের অবরুদ্ধ মর্মোচ্ছ্বাস ও নিরাশ ক্রন্দন পাষাণ-প্রাচীর ভেদ করবার পূর্বেই তাদের জীবনের উপর চির অন্ধকারের যবনিকা পতিত হ'য়েছে। আমি সভয়ে সম্মুখে চেয়ে দেখলুম ; বোধ হ'তে লাগলো, শত শত রক্তাপ্লুত ছিন্নমস্তক যেন শোণিতস্রোতে তীরবেগে ভেসে আসছে, আর ঘাতকের পৈশাচিক নৃত্য ও অট্টহাস্যে চতুর্দিক প্রকম্পিত হ'চ্ছে। হায় দেবী, কতকাল থেকে তুমি মাতার সুপবিত্র স্নেহ-কোমল ও নিতান্ত নির্ভরতাপূর্ণ অধিকার হরণ ক'রে সন্তানের উষ্ণ রুধিরে আপনার লোলজিহ্বা তৃপ্ত ক'রেছ! কিন্তু তোমারই বা দোষ কি, তোমার নামে মানুষ প্রতিদিন অসঙ্কোচে কত কুকার্যই না করে!

কিন্তু কতদিন দেবী স্থানচ্যুত হ'য়েছেন, তা ঠিক জানতে পাল্লুম না। কেহ কেহ বলেন, শঙ্করাচার্য যখন যোশীমঠের প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময় তিনি এই ভয়ানক কাণ্ড নিবারণ করেন। সেই সময় হ'তে দেবমূর্তি বিমুখ অবস্থায় মন্দির মধ্যে প্রোথিত হয়েছেন ; এখন শুধু তাঁর শূন্য আসনখানিই দেখা যায় এবং তারই পূজা হ'য়ে থাকে। কিন্তু কারো কারো মতে এই বিপ্লব শঙ্করাচার্যের দ্বারা সাধিত হয় নি। এ সম্বন্ধে তাদের প্রধান যুক্তি এই যে, শঙ্করাচার্য হিন্দুধর্মের একজন অবতার বিশেষ, এমন কি অনেকে তাঁর উপরে শিবত্ব পর্যন্ত আরোপ করে থাকেন। সেই শঙ্করাচার্য যে এমন একটা ম্লেচ্ছভাবাপন্ন কাজ ক'রে ফেলবেন, এ কথা তাঁরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজি নন। কিন্তু এঁরা বোঝেন না, ধর্মের সংস্কার ও বিনাশ এক কথা নয়, সুতরাং ধর্মের সংস্কারের জন্য যে কাজ শঙ্করাচার্যের পক্ষে নিতান্ত সহজ, এঁরা তা ধর্মবিনাশ মনে ক'রে তখনই ধারণা ক'রতে পারেন না, যে এমন অধর্ম শঙ্করাচার্য দ্বারা কিরূপে সাধিত হ'তে পারে? যা হ'ক, এ সম্বন্ধে এঁদের মতও উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে না। কারণ এঁরা বলেন, বৌদ্ধেরা যখন এখানে আসেন, তখন তাঁরাই এই ঘৃণিত প্রথা বন্ধ ক'রেছিলেন। এই দুই মতের কোন্ মত সত্য, তা অনুমান করা কঠিন। এই বিষম অপ্রীতিকর জায়গায় আমি আর বেশীক্ষণ থাকতে পাল্লুম না। দ্রুতপদে মন্দির ত্যাগ কল্লুম, বোধ হতে লাগলো, শত শত নরকঙ্কাল আমার পাছে পাছে ছুটে আসচে।

মন্দির থেকে বা'র হ'য়ে একেবারে যোশীমঠে উপস্থিত হ'লুম। বাহিরে একটা ঝরণা থেকে অবিরাম জল প'ড়ছে। এই ঝরণার কাছ দিয়ে একটা ছোট দ্বারপথে আমরা মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ কল্লুম। দেখি একটা দোতলা চক, বাইরে টানা বারাণ্ডা, মধ্যে ছোট ছোট কুঠুরী। বাহিরে অনতিদীর্ঘ একটি উঠান, তিন দিকে দোতলা কোঠা, আর এক দিকে মন্দির। অনুচ্চ মন্দির ; মন্দিরের মধ্যে দিনের বেলাতেই ভয়ানক অন্ধকার। অপর সকল স্থানে মন্দিরের মধ্যে যেখানে মূর্তি থাকে, এই মন্দিরে সেখানে তাকিয়া-বেষ্টিত স্থূল গদি দেখতে পেলুম। এইটি শঙ্করাচার্যের গদি। এই গদি বাঁপাশে রেখে অগ্রসর হ'তেই দেখি এক চতুর্ভুজ মূর্তি ; তেমন জাঁকাল নয়, বিশেষতঃ একটা অন্ধকারময় কুঠুরীতে প'ড়ে

www.pathagar.com

তাঁর মাহাত্ম্যও খুব খাটো হ'য়ে গিয়েছে বলে বোধ হ'লো।

মন্দির থেকে বেরিয়ে উঠানের এক পাশে ব'সলুম। উঠানটি পাথর দিয়ে বাঁধানো ; দেখলুম সেখানে অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষ কোলাহল কচ্ছে। একজন পাণ্ডা একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে এমন কুৎসিত ভাষায় ঝগড়া ক'রছে যে, সেখানে দু'দণ্ড অপেক্ষা করা অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। কোথায় মহাত্মা শঙ্করাচার্যের প্রধান মঠে উপস্থিত হ'য়ে আমরা শান্তি আনন্দ উপভোগ করবো, না পাণ্ডাঠাকুরদের বৈষয়িক গণ্ডগোলের জন্য হিমালয়ের শৈত্য ও শান্তিময় ক্রোড়স্থিত এই পরম পবিত্র তীর্থস্থান এক বিড়ম্বনার কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এই মঠ নিয়ে যে সমস্ত পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় হ'য়ে গিয়েছে, তা শুনলে মনে বড়ই কষ্ট উপস্থিত হয়। পাঠক মহাশয়ের অবগতির জন্য মঠের এই শোচনীয় ইতিহাস এখানে সংক্ষেপে বিবৃত ক'রচি।

শঙ্করাচার্য এই মঠের ভার ত্রোটকাচার্য গিরির হাতে সমর্পণ ক'রে যান। এই মঠ তিন শ্রেণীর সন্ন্যাসীর অধিকারে থাকে—গিরি, পুরী ও সাগর। সন্ন্যাসী মহাশয়েরা সহসা এই অতুল সম্পত্তির অধিকারী হ'য়ে সন্ন্যাস-ধর্ম আর ঠিক রাখতে পারলেন না। দীর্ঘকালের কঠোর সংযম ও বৈরাগ্যকে বিলাস-সাগরে ভাসিয়ে শুষ্ক প্রাণে প্রচুর আরাম সঞ্চয় করতে লাগলেন। ধর্ম-কর্ম সমস্ত বিসর্জন দিয়ে শুধু শারীরিক সুখ-সম্ভোগই তাঁদের জীবনের অদ্বিতীয় উদ্দেশ্য হ'য়ে উঠলো। ক্রমে তাঁদের অবস্থা এ রকম হ'য়ে উঠলো যে, মঠ আর চলে না। এই অবস্থায় মঠাধ্যক্ষ গিরি সন্ন্যাসী অন্য সম্প্রদায়ের একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে জুয়া খেলে যথাসর্বস্ব হারান। শেষে এই মঠ বাজী রেখে খেলা আরম্ভ করেন ; দুর্ভাগ্যক্রমে মঠটি হারাতে হয়। সন্ন্যাসী ঠাকুরের যে রকম পণ, তাতে যদি দ্রৌপদী থাকতো, তা হ'লে তাঁকেও হয়ত পণ ধরতেন। যা হোক, তা না থাকলেও এইখানেই এই পর্ব অভিনীত হ'য়ে গেল। সর্বত্যাগী হ'য়েও যিনি ইচ্ছা ক'রে প্রবৃত্তির স্রোতে আপনার মনপ্রাণ ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, এখন বাধ্য হ'য়ে তাঁকে নিবৃত্তির অঙ্কে আশ্রয় নিতে হ'লো ও আসক্তিবর্জিত বৈরাগ্যাবলম্বী সাধুর মত সমস্ত ত্যাগ ক'রে চ'লে যেতে হ'লো। কিন্তু তাঁর এই চিরন্তনের বিলাসক্ষেত্র ছেড়ে যেতে মনে যে দারুণ আঘাত লেগেছিল, মায়াবদ্ধ গৃহীর নৈরাশ্যপূর্ণ মর্মভেদী যাতনা অপেক্ষা তা অল্প নয়।

যা হোক, যে সন্ন্যাসী এই মঠ লাভ করেন, তিনি ইহা দক্ষিণদেশী রাওল ব্রাহ্মণদের কাছে বিক্রয় ক'ল্লেন। তাঁরাই এখন এই মঠের অধিকারী, সুতরাং বদরিনারায়ণের মন্দির আজও তাঁদের দখলে। শুনলুম, এ পর্যন্ত সাতাশ জন রাওয়াল-ব্রাহ্মণ এই মঠের অধ্যক্ষতা ক'রে গেছেন। তাড়িত সন্ন্যাসী বা মঠাধ্যক্ষের বর্তমান উত্তরাধিকারী কেবলানন্দ গিরি এখন নেপালে আছেন শুনা গেল। তিনি অতি মহৎ লোক। এই মন্দির হস্তগত করবার জন্যে তিনি বিশেষ চেষ্টা ক'চ্ছেন। তিনি বলেন, মঠ দান-বিক্রয় করবার বা বন্ধক দেবার সম্পত্তি নয় ; কিম্বা মঠাধ্যক্ষের সে অধিকারও নাই ; তিনি আজীবন মঠের স্বত্বাধিকারী মাত্র, তাও যদি তিনি পবিত্রভাবে মঠের সকল অনুশাসন মেনে চলেন, তা হ'লেই। কলুষিত-চরিত্র বা ভ্রষ্টাচারী হ'লে তাঁকে মঠচ্যুত হ'তে হবে, ইহাই শঙ্কারাচার্যের আদেশ। কেবলানন্দ গিরির এই মঠে সম্পূর্ণ অধিকার আছে। জানি না এই মঠ নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা।

বিস্তৃত মঠপ্রাঙ্গণে ব'সে একজন পলিতকেশ বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর মুখে মঠের শোচনীয়

www.pathagar.com

ইতিহাস শুনতে লাগলুম। মহামহিমান্বিত যোশীমঠের এই শোচনীয় কাহিনী আমার মনে শুধু মানব-হৃদয়ের দুর্বলতা, হীনতা ও স্বার্থপরতার কথাই জাগিয়ে দিতে লাগলো। দূর হ'তে মনে হ'তো যারা সংসারতাপদগ্ধ ক্লিষ্ট পার্থিব হৃদয়ের অনেক ঊর্ধ্বে শান্তি ও প্রীতির সুশীতল ছায়া উপভোগ করেন, পর্বতের কোলের এই সকল পবিত্র তীর্থে তাঁদের দর্শন ক'রে এবং তাঁদের কাছে সান্ত্বনার কথা শুনে হৃদয়ের অশান্তি ও দুর্বলতা খানিকটে দূরে যাবে, চতুর্দিকের বাহ্যপ্রকৃতি শরীর ও মন উভয়কেই পবিত্র পরিতৃপ্ত ক'রে তুলবে। সেই আশাতেই এত দূরে এত কষ্ট ক'রে এসেছিলুম। বাহ্যপ্রকৃতি তার অনন্ত সৌন্দর্যের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে আমাকে মুগ্ধ ক'রে ফেলেছে, এই স্বর্গীয় শোভা আমার হৃদয়ে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছে। কিন্তু মানবের সে দেব-হৃদয় কই? সেই আত্মত্যাগ ও সমদর্শিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যা বিধাতার সর্বশ্রেষ্ঠ দান, এবং যা দেখবার আশাতে এতদূর এসে পড়েছি,—তা কোথায়?

www.pathagar.com

বিষ্ণুপ্রয়াগ

২৭শে মে, বুধবার—অপরাহ্ণ।—আজ যোশীমঠ হ'তে বের হবার একটুও ইচ্ছা ছিল না। শুধু একদিনের জন্যই নয়, আমার ইচ্ছা তিন চার দিন এখানে থাকি। শঙ্করাচার্যের অতীত-গৌরবের সমাধিক্ষেত্র, এই স্থান ছেড়ে আমার সহজে যেতে ইচ্ছে ক'রছিল না। থাকবার ইচ্ছা কল্লুম বটে, কিন্তু থাকা হ'লো না ; স্বামীজি জেদ করতে লাগলেন, আজই রওনা হ'তে হবে ; তার উপর অসহিষ্ণু বৈদান্তিকের তাড়না অসহ্য হ'য়ে উঠলো। দু'দণ্ড যে কোথাও বিশ্রাম করবো সে যো নেই, বোধ হয় জন্মান্তরে আমি গরু এবং বৈদান্তিক রাখাল ছিলাম, তাই বুঝি আজও নাকে দড়ি দিয়ে আমাকে নিয়ে ঘুরিয়ে বেড়াবার ঝোঁক ছাড়তে পারেন নি। কি করা যায়, বেরিয়ে পড়া গেল।

আগেই ব'লেছি পাহাড়ের উপর যোশীমঠ, নীচে বিষ্ণুপ্রয়াগ। যোশীমঠ হ'তে বিষ্ণুপ্রয়াগ একটা খুব বড় খাড়া উৎরাই। যদি পাহাড়ের গায়ে গাছপালা না থাকতো, তা হ'লে শঙ্করের মন্দির থেকে গা ছেড়ে দিলে তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুপ্রয়াগে এসে একেবারে অলকানন্দা দাখিল হওয়া যেত! যোশীমঠ হ'তে উৎরাই-টুকু নামতে আমার একটু বেশী কষ্ট হ'য়েছিল ; কারণ পাহাড়ের গা এমন সোজা, আস্তে আস্তে লাঠিতে ভর দিয়ে নবাবী চালে চলা যায় না, নামতে বেশ একটু বেগ পেতে হয় ; কে যেন উপর হ'তে অর্ধচন্দ্র দিয়ে নামিয়ে দিচ্ছে! আমরা বেলা ৫টার সময় রওনা হয়েছিলুম, কিন্তু আধঘণ্টার মধ্যেই একেবারে বিষ্ণুগঙ্গার উপর টানা সাঁকোর কাছে এসে পড়লুম। এই বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুগঙ্গা অলকানন্দার সঙ্গে মিশেছে।

আমি একটি একটি ক'রে ক্রমাগত প্রয়াগের কথাই ব'লছি। একটা প্রয়াগের জায়গায় পাঁচটা প্রয়াগের কথা ব'লেছি, তবু আমার প্রয়াগ ফুরায় না। আজ আবার আর এক প্রয়াগে উপস্থিত। সর্বসুদ্ধ প্রয়াগ পাঁচটাই বটে, কিন্তু বিষ্ণুপ্রয়াগকে পূর্ববর্ণিত প্রয়াগগুলির মধ্যে একটা Supplement বলে ধ'রে নেওয়ার দরকার ; Supplement এই জন্য ব'লছি যে, 'কেদারখণ্ডে' পাঁচটার বেশী উল্লেখ নেই ; কিন্তু তথাপিও বিষ্ণুপ্রয়াগকে প্রয়াগ না ব'ল্লে তার উপর নিতান্ত অবিচার করা হয় ; শুধু অবিচার নয়, তাতে তার যথেষ্ট অপমান করাও হয়। বিষ্ণুপ্রয়াগকে প্রয়াগ-শ্রেণীভুক্ত না করাতে অন্ততঃ এই প্রমাণ হয় যে 'কেদারখণ্ড'-লেখক একজন চিন্তাশীল ও ভক্ত হ'তে পারেন, কিন্তু তিনি কবি নন এবং কবিত্বের মাধুর্য ও গৌরব অপেক্ষা তিনি পৌরাণিক আধিপত্যকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিতে চান।

যা হ'ক, কাব্যজগতে বিষ্ণুপ্রয়াগের মহিমা স্বপ্রকাশিত, তা কোন লেখকের লেখনীমুখে ব্যক্ত হ'ক, আর নাই হ'ক। আজকাল প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রীতিপূর্ণ স্নিগ্ধ সম্ভার পৌরাণিক প্রতিষ্ঠার উপর নিঃসঙ্কোচে রাজত্ব ক'রচে, সুতরাং এ যুগে বিষ্ণুপ্রয়াগকে প্রয়াগসমষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দিলেও বেশী আপত্তি হবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। আর যদি দুই নদীর সঙ্গমস্থলকেই প্রয়াগ বলা যায়, তা হ'লে এই স্থানটিকেই সকলের আগে প্রয়াগ বলা উচিত।

আমরা যখন যোশীমঠ হ'তে খানিকটে নেমে এসেছি, সেই সময় খানিক দূরে একটা গম্ভীর কল্লোল শুনা গেল। এই অবিরাম কল্লোলের সঙ্গে কার যে তুলনা দেওয়া যেতে

www.pathagar.com

পারে, অনেক চিন্তা ক'রেও স্থির ক'রতে পারিনি। কোথা হ'তে এই শব্দ আসচে, তা কিছুই ঠিক ক'রতে পাল্লুম না, বিশেষ আমাদের তিনজনেরই অভিজ্ঞতা সমান ; সুতরাং কোন রকমেই মীমাংসা হ'লো না। তবে অনুমান এ শব্দ অলকানন্দার স্রোতের শব্দ ভিন্ন আর কিছু নয়। ক্রমে যখন ধীরে ধীরে বিষ্ণুগঙ্গার সাঁকোর উপর এসে প'ড়লুম, তখন খুব প্রবল শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। একটু এদিকে ওদিকে সন্ধান-ক'রতেই দেখলুম, বিষ্ণুগঙ্গা খুব প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে, এ তারই শব্দ। আমরা ঘুরতে ঘুরতে নদীর কাছে এসে দাঁড়ালুম। এখানে নদীর তলদেশ অত্যন্ত ভয়ানক, বড় উঁচুনীচু, তাই এরকম জলের শব্দ হ'চ্ছে।

আমরা সাঁকো পার হ'য়ে বাজারে উপস্থিত হ'লুম। বাজার ত ভারি, সেই 'যথাপূর্ব তথাপর'। খানিকটে অপ্রশস্ত সমতল জায়গায় খান চার দোকান ; তাতে আটা, ডাল, ঘি, নুন, গুড় বিক্রয় হয়। আমরা বাজারে উপস্থিত হ'বা মাত্র একজন দোকানদার— ফরমাইস পেলে সে তখনি গরম পুরী, ভুজ্জি (তরকারী) তৈয়েরি ক'রে দিতে পারে, এই কথা আমাদের কাছে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা ক'রলে ; এবং কথার সাক্ষীস্বরূপ আর তিনজন লোককে দাঁড় করালে ; তারা মুক্তকণ্ঠে এই হালুইকর ঠাকুরের যশোগানে প্রবৃত্ত হ'লো। এদের রকমসকম দেখে আমার বড়ই আমোদ বোধ হ'য়েছিল ; আমার আরো আমোদের কারণ, তারা আমাদের যতটা নির্বোধ ভেবে দু'পয়সা উপায়ের চেষ্টা ক'চ্ছিল, সুখের বিষয় আমরা ততটা নির্বোধ নই, কিন্তু সেজন্য তাদের মনে অনেকখানি আশার সঞ্চার সম্বন্ধে কোনও বাধা হয় নি। দেখলুম কলকাতার চিনাবাজারের দোকানদারেরাই যে ধূর্ত ও ব্যবসাকার্যে দক্ষ তা নয় ; হিমালয়বক্ষে এই সকল দোকানদারেরাও জানে, কি রকম ক'রলে দু'পয়সা হতে পারে।

যাহোক, মিষ্ট কথা ও ভবিষ্যতে পুরীর খরিদ্দার হবার ষোল আনা রকম আশা দিয়ে এই দোকানদার-পুঙ্গবটিকে বশ করা গেল। কোথায় রাত্রি কাটানো যায়, তা ঠিক করবার জন্যে তার উপরই ভার দিলাম। বুঝলাম, আজ তাকে যে লোভ দেখানো গিয়েছে, তাতেই সে আমাদের জন্যে কষ্ট স্বীকার ক'রবে ; আর বাস্তবিক দেখলুম, এই সাধুদের কাছে দু'পয়সা লাভ ক'রতে পারবে বুঝে, সে আমাদের একটা আড্ডার জন্যে খুব উৎসাহের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু তার চেষ্টার কোনও ত্রুটি না হ'লেও অদৃষ্ট ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে, কাজেই কোথাও আড্ডা মিললো না। বামুনঠাকুর অনুসন্ধানের পর অকৃতকার্য হ'য়ে যখন আমাদের সম্মুখে কাতরভাবে দাঁড়াল, তখন আমাদের নিজের কথা ভেবে যতটা দুঃখ না হ'ক, ঠাকুরের ভাব দেখে তার চেয়ে বেশী দুঃখ হ'য়েছিল। আমি ঠাকুরকে বুঝিয়ে দিলুম, তার আর কষ্ট করবার দরকার নেই, আমরাই একটা বাসা খুঁজে নিচ্চি ; কিন্তু এতে যেন সে নিরুৎসাহ না হয়, লুচি-তরকারী তার দোকান ছাড়া আমরা আর কোথাও নিচ্ছিনে।

আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়া গেল। স্থান আর মেলে না। সকালবেলায় যে সব যাত্রী যোশীমঠে না গিয়ে রাস্তা থেকে আমাদের ছেড়ে নীচের পথ দিয়ে বরাবর এখানে চ'লে এসেছে, তারাই এখানে সকল আড্ডা দখল ক'রে ফেলেছে, একটি প্রাণীও ঐ স্থান ছেড়ে যায় নি ; সুতরাং পরে আসার জন্যে আমাদের স্থানাভাব হ'য়ে উঠেছে। এখনো অনেক বেলা আছে, অথচ যাত্রীদল আর অগ্রসর না হয়ে এখানে কেন সময়ক্ষেপ

www.pathagar.com

ক'রেছে, জানাবার জন্যে বিশেষ কৌতূহল বোধ হ'ল। শুনলুম, আগামী কাল যে পথে চলতে হবে, তার মত ভয়ানক বিপদপূর্ণ রাস্তা বদরিনারায়ণের পথে আর নেই ; অপরাহ্ণে এ পথে চলা দুরূহ। রাত্রে নিদ্রায় শ্রান্তি দূর করে সকালে এই পথে চলা সুবিধা ও যুক্তিসঙ্গত মনে ক'রে যাত্রীরা আজকের মত এখানেই অপেক্ষা ক'চ্ছে। অল্প কয়েকখানি ঘর তারা এমন পরিপূর্ণমাত্রায় দখল ক'রেছে যে তার মধ্যে একটু পা বাড়াবার জায়গা নাই। লোক যে বড় বেশী তা নয় ; তারা যদি একটু গোছালো ভাবে আসনগুলি বিছিয়ে নিত, তা হ'লে প্রত্যেক ঘরে আরো পাঁচ-সাতজনের স্থান হ'তে পারতো ; কিন্তু সন্ন্যাসী বাবাজিরা তীর্থ ক'রতেই এসেছেন এবং নারায়ণ দর্শন ক'রে অনেকখানি পুণ্যসঞ্চয়ই তাঁদের অভিপ্রায় ; তাঁরা অনুগ্রহ ক'রে পা দু'খানি একটু গুটিয়ে বসলে সেই পদতলে আমরা যৎকিঞ্চিৎ স্থান পেয়ে এই বরফরাজ্যে কৃতার্থ হ'য়ে যাই এবং তাঁদেরও পুণ্যসঞ্চয় হয়, সে কথা বোধ করি তাঁদের ভাববার অবসর হয় নি। এতটুকু অসুবিধা যারা সহ্য ক'রতে প্রস্তুত নয়, তারা যে কেন সন্ন্যাসী হ'য়েছে তা আমি বুঝতে পারিনে। বলা বাহুল্য, সন্ন্যাসীদের এই স্বার্থপরতা দেখে বেশী রাগ হ'য়েছিল, কি আমাদের রাত্রিবাসের অনুপায় দেখে বেশী রাগ হ'য়েছিল, এতদিন পরে ঠিক ক'রে বলতে পারিনে ; তবে মনে হয়, গাছতলায় বরফে পড়ে থাকার চেয়ে ঘরে একটু আয়াসে থাকা যায়, আর এই সন্ন্যাসীগুলো সেই আয়াসের বিষম বিঘ্ন, অতএব আত্মসুখের কথাটা পিছনে দাঁড় করিয়ে তাদের স্বার্থপরতার উপরই রাগটা বেশী প্রবল হ'য়ে উঠেছিল। বাস্তবিক কত সময় আমরা পরের স্বার্থপরতা দেখে রাগ করি ; কিন্তু আমাদের সে রাগও স্বার্থপরতাপূর্ণ। আমাদের মনে হতে লাগলো, যদি আমাদের দেশ, কি আমাদের ইস্টার্ণ বেঙ্গল স্টেটের রেলগাড়ী হ'তো, তা হ'লে এখনি পুলিসম্যান ডেকে ওদের গাঁটরি ও বোঁচকা বুচকি সরিয়ে দিয়ে এত জায়গা ক'রে নিতে পারতুম যে তাতে ব'সে হাত পা মেলে বিলক্ষণ আরাম করা যেতো। কিন্তু এখানে সে রকমের প্রতিকার সম্ভাবনা কিছুমাত্র নেই, কাজেই উপস্থিত রাগটা চাপা দিয়ে বসার অনুসন্ধানে অন্যত্র প্রস্থান করা গেল।

খানিক ঘুরতে ঘুরতে স্বামীজি ও অচ্যুত ভায়া বসে প'ড়লেন। আমার শ্রান্তি-ক্লান্তি নেই ; আমি ভাবলুম, আগে সঙ্গমস্থলটা দেখে আসি, তার পর যা হয় করা যাবে। সঙ্গমস্থলে চল্লুম। বাজারের পিছনে খানিকটে নীচেই সঙ্গমস্থল, কিন্তু বাজারের পিছনে অল্প একটু নেমেই একেবারে ঠিক সঙ্গমস্থলের মাথার উপরে পাহাড়ের গায়ে একটা খুব নূতন ছোট মন্দির দেখলুম। মন্দিরটি এমন স্থানে নির্মিত যে, এখানে মহাদেব প্রতিষ্ঠা না করে যদি একজন কবিকে প্রতিষ্ঠা করা যেতো, তা হ'লে ঠিক কাজ করা হ'তো। বিষ্ণুগঙ্গা ও অলকানন্দা নীচে দিয়ে আনন্দোচ্ছ্বাসের বিপুল কল্লোলে পরস্পরকে আলিঙ্গন ক'রেছে ; পাশে ঈষৎ বক্র সমুন্নত বিশাল পর্বত আকাশ ভেদ করে উঠেছে এবং তারই গায়ে এই ক্ষুদ্র মন্দির, প্রকৃতির স্বহস্তনির্মিত চিত্রবৎ! তখন সন্ধ্যার বড় বিলম্ব ছিল না, আলো ও অন্ধকারের কোমল মিলন মন্দিরের শোভন দৃশ্যকে আরও মধুর ক'রে তুলেছিল। আরও অগ্রসর হ'য়ে দেখলুম, মন্দিরটির পাদদেশ হতে আরম্ভ করে পাহাড়ের গা খুদে ছোট ছোট সিঁড়ি তৈয়েরি করা হ'য়েছে ; সিঁড়ি একেবারে সঙ্গমস্থলে এসে প'ড়েছে। উদ্দাম তরঙ্গ সেই সিঁড়িতে ও পর্বতের কঠিন গায়ে ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে। এ পর্যন্ত অনেক সুন্দর দৃশ্য দেখেছি, কিন্তু এই প্রকারের এমন সুন্দর দৃশ্য আমার চক্ষে

www.pathagar.com

এই নূতন। মন্দিরের কাছে এসে ইচ্ছা হলো আজ এখানেই থাকি। মন্দিরের বাইরে খানিক বারান্দা বের করা ছিল, তাতে তিন-চারজন লোক বেশ থাকতে পারে ; কিন্তু কাকেও না দেখে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করছি, এমন সময় দেখি সেই দোকানদার বামুন সেখানে উপস্থিত। কথায় কথায় জানতে পাল্লুম, মন্দির এখন সেই দোকানদারেরই জিম্মায় আছে। আমি তখন সেই মন্দিরে থাকবার অভিপ্রায় প্রকাশ কল্লুম। সে প্রথমে কিছুতেই রাজি হ'লো না, কারণ মন্দিরটি নূতন তৈয়েরি হয়েছে, তাতে এখনো দেবতা প্রতিষ্ঠা হয় নি। এক বৎসর হলো ইন্দোরের রাণী এসে এই মন্দির তৈয়েরি করিয়ে দিয়েছেন। এই বৎসর নর্মদাতীর হতে মহাদেবের লিঙ্গমূর্তি এনে মন্দির ও দেবতা উভয়েরই প্রতিষ্ঠা করা হবে।

আমি তো জোর-জবরদস্তি করে মন্দিরের সম্মুখে বসে পড়লুম, সেও কিন্তু নাছোড়বান্দা। যাহোক দুই-চারিটি বচন দেওয়ার পর সে আর কোন আপত্তি কল্লে না। মন্দিরদ্বারে একটি ছোট ছেলে ব'সেছিল, তাকে বাজারে পাঠিয়ে স্বামীজি ও অচ্যুত ভায়াকে ডাকিয়ে আনলুম। স্বামীজি মন্দির ও স্থানের সৌন্দর্য দেখে একেবারে অধীর। বৈদান্তিক পারতপক্ষে কারো প্রশংসা করেন না, কিংবা অল্প কারণে তাঁর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ওষ্ঠের উপকূলে প্রকাশ পায় না ; কিন্তু এই সুন্দর স্থান আবিষ্কার করার জন্যে তিনি আজ আমাকে কলম্বসের পাশে আসন দিতে সঙ্কুচিত হ'লেন না। বাস্তবিক কোথায় আজ স্থানাভাবে এই শীত বরফের মধ্যে অনাবৃত আকাশতলে বাস করার জন্যে তাঁরা প্রস্তুত হচ্ছিলেন, আর কোথায় এই সুন্দর স্থানে দেববাঞ্ছিত-মন্দিরের মধ্যে সুখশয্যা।

মন্দিরের ভিতরটি আটকোণবিশিষ্ট, উপরে যথারীতি চূড়া। দ্বারের সম্মুখে গাড়ী-বারান্দার মত একটা বারাণ্ডা বের করা, তার তিন দিকে বড় বড় কপাট লাগানো ; সুতরাং ইচ্ছা কল্লেই চারিদিক বন্ধ করে বেশ সুরক্ষিত অবস্থায় থাকা যায়।

আমরা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ না করে আগে যে সিঁড়ির কথা বলেছি, সেই সিঁড়ি দিয়ে সঙ্গমস্থলে নেমে গেলুম। সেখানে—আর শুধু সেখানে কেন—এই মন্দিরমধ্যে কথা বলতে হলে খুব চেঁচিয়ে বলতে হয়, কারণ জলের এত শব্দ যে কিছুই শুনতে পাওয়া যায় না। বিষ্ণুপ্রয়াগ সমতল স্থানে নয়, দু'দিক হ'তে যে দু'টি নদী আসছে, উভয়েই পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে নামছে, সুতরাং অন্য স্থান অপেক্ষা এখানে নদীর স্রোত এবং শব্দ দুই-ই বেশী। তার উপর যেখানে সঙ্গমস্থল, তার আট দশ হাত উজানে অলকানন্দা একটা পাহাড়ের উপর থেকে লাফিয়ে নীচে পড়ছে, সুতরাং এই মন্দিরের কাছে শব্দ আরো বেশী। সমুদ্রগর্জন অনেকেই শুনেছেন : অপার জলধির বিপুল গর্জন, বায়ুহিল্লোলে উন্মত্ত তরঙ্গরাশির অসীম মুক্তপ্রদেশে অবাধ নৃত্য এবং তার প্রবল বিক্রম, এ সকলের মধ্যে কোমলতা বা সঙ্কীর্ণতা নেই ; তাই বুঝি আমাদের ক্ষুদ্র কল্পনা তার ভিতর পড়ে শ্রান্ত, অবসন্ন ও ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়ে ; কিন্তু সঙ্গমস্থলের জলের অবস্থা সে রকম নয়। এর অবিশ্রান্ত শব্দে মনে শ্রান্তি আনে না, শান্তি আনে; এই উগ্র শব্দের মধ্যে এমন একটা কোমলতা, এমন একটু মিষ্টতা আছে, যা মর্মস্পর্শী, অনেকক্ষণ শব্দ শুনতে শুনতে বোধ হয় ঘুম আসে ; কিন্তু তাই ব'লে এর বিক্রম কম নয়। সঙ্গমস্থলে এই ঘূর্ণিত ফেনিল জলে নামে কার সাধ্য? নামতে সাহসই হয় না। দিবারাত্রি জল আলোড়িত হচ্ছে ; জলের কাছে গেলে মাথা ঘুরে যায়। ইন্দোরের রাণী মন্দির হতে সিঁড়ি প্রস্তুত করিয়ে তার

www.pathagar.com

সব নীচের সিঁড়ির দু'পাশে পাহাড়ের মধ্যে লোহার শিকল বাঁধিয়ে দিয়েছেন। এই শিকল জলের উপর দোলে, যাত্রীরা এই শিকল ধরে জলস্পর্শ করে, স্নান করবার শক্তি কারো নেই। যাদের মাথা ভাল নয়, একটা কিছু গোলমাল দেখলেই সহজে যাদের মাথা ঘুরে উঠে, তাদের এ জলের কাছে যাওয়া উচিত নয়। হিমালয়ের মধ্যে এমন স্থান আছে যাদের সঙ্গে এর তুলনা হ'তে পারে, কিন্তু সে তুলনা হিমালয়বাসী ছাড়া আর কেউ বুঝবেন কিনা সন্দেহ ; তার চেয় যদি বলা যায়, এ একটা ছোটখাট নায়েগ্রার মত, তা হ'লে বোধ করি অনেকে বুঝতে পারেন, কারণ বাঙ্গালীর মধ্যে দু'চারজন ছাড়া আর কেউ নায়েগ্রা না দেখলেও অনেকেই তার বর্ণনা পড়ে পড়ে তাতে অভ্যস্ত হ'য়ে গেছেন। এই সঙ্গমস্থল নায়েগ্রার একটা ছোট প্রতিকৃতি বল্লেই বোধ হয় বর্ণনা ষোল আনা রকম হয়। এতে যিনি সন্তুষ্ট নন, তাঁকে সঙ্গে করে আমি পাহাড় পর্বত ভেঙ্গে বরং এখানে আসতে রাজী আছি, কিন্তু বর্ণনা দিতে সম্পূর্ণই অক্ষম।

সমস্ত দেখে-শুনে আমরা উপরের সেই মন্দিরে এসে উপস্থিত হলুম। যাবার সময় দেখে গিয়েছিলুম মন্দিরের ভিতরের দ্বার বন্ধ, এখন দেখি দ্বার খোলা। একটি আট নয় বছরের ছেলে সেই উন্মুক্ত ঘরের মধ্যে বসে আছে। ভিতরের দিকে চেয়ে দেখলুম ভবিষ্যতে যেখানে শিবমূর্তি স্থাপিত হবে, সেইখানে একখানা কাঠের ছোট চৌকির,উপর তেলসিঁদুর মাখানো পাথরের খোদা কয়েকখানা মূর্তি ; তেলসিঁদুরের প্রসাদে তাঁরা পুরুষ কি স্ত্রী, মানুষ কি আর কিছু, কিছুই বুঝবার উপায় নেই। মন্দিরের মালিক এখানে আসেন নি, তাই এই বালক নিখরচায় তার পুতুলগুলিকে মন্দিরের মধ্যে বসিয়ে অনায়াসে দু-চার পয়সা রোজগার করছে। পরে যখন মন্দিরের প্রকৃত অধিকারী এসে উপস্থিত হবেন, তখনই এই দেবতারা অন্যান্য জাতিভায়ার মত বৃক্ষতল আশ্রয় ক'রবেন। জিজ্ঞাসা করে জানলুম, বালকটি আমাদের সেই লুচিওয়ালা বামুনঠাকুরের ছেলে। এদের বাড়ি যোশীমঠে। ছেলেটির সঙ্গে গল্প জুড়ে দেওয়া গেল। এদিকে বৈদান্তিক ভায়া দোকানদারকে পুরী প্রভৃতি ফরমাইস দিলেন। যে পরিমাণে জিনিস তিনি ফরমাইস দিলেন, তাতে আমার ও স্বামীজির চার পাঁচ দিন চলতো এবং যদি বৈদান্তিকের উদরের পরিমাণ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা না থাকতো, তা হলে মনে করতুম ভায়া এই তীর্থস্থানে বুঝি আট দশ জন লাধুসন্ন্যাসীকে খাইয়ে স্বর্গের পথ কিঞ্চিৎ প্রশস্ত করবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু তিনি তেমন লোক নন, পুণ্যার্জনের জন্যে তিনি সর্বত্যাগ করেছেন কিন্তু উদরের জন্যে তিনি এই পুণ্যের কিয়দংশ ত্যাগ ক'রতে প্রস্তুত।

সন্ধ্যা হ'য়ে এল। অন্ধকার হ'য়েছে দেখে ছেলেটি উপরে উঠে গিয়ে বাজার থেকে ঘি-সলতে-প্রদীপ নিয়ে এল ; তাই বুঝতে পারলুম মন্দিরের বর্তমান অধিবাসিগণ প্রত্যহ প্রদীপের মুখ দেখতে পান না। আজ আমাদের কল্যাণে তাঁরা একটু দেবত্ব উপভোগ করে নিলেন। শুধু ঘি-সলতে নয় ছেলেটি যথারীতি আড়ম্বর ক'রে ঠাকুরদের আরতি করলে ; তারপর আবার উপরে দোকানে গিয়ে খানকতক লুচি আর খানিকটে গুড় এনে ঠাকুরদের ভোগ দিলে ; বলা বাহুল্য আমাদের জন্যে তার বাপ যে লুচি তৈয়েরি ক'রেছিল, মন্দিরের ঠাকুরমশায়েরা তাতেই ভাগ বসালেন। ভোগ হ'য়ে গেলে ছেলেটি আমাদের প্রসাদ দিতেও ত্রুটি কল্লে না। এতদবস্থায় সে বালককে যৎকিঞ্চৎ না দেওয়া ভাল দেখায় না, সুতরাং তাকে কিছু দেওয়া গেল। সে তা প্রণামী শ্রেণীভুক্ত ক'রে বকশিশের জন্যে

www.pathagar.com

জেদ ক'রতে লাগলো। কায়দা মন্দ নয়। বৈদান্তিক ভায়া বল্লেন, এখন ঐ পর্যন্ত থাক, ফিরে আসবার সময় বকশিশের ব্যবস্থা করা যাবে। বোধ হয় আমাদের আর বিরক্ত করা সঙ্গত নয় মনে করে সে মন্দির ত্যাগ ক'রে চ'লে গেল এবং যাবার সময় প্রদীপ নিবিয়ে 'তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে' করে দোরে তালা লাগিয়ে গেল। সে সেই রাত্রে এই চড়াই উঠে যোশীমঠে যাবে। কি সাহস! বাঙ্গালী বালক দূরের কথা, বাঙ্গালী সাহসী যুবকও এ কাজে প্রবৃত্ত হ'তে সাহস করেন না। এজন্যে একবার আমাদের নিজেকে নিন্দা করবার জন্য মনটা একটু ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিল, কিন্তু ভেবে দেখলুম, এ বালকের এই অভ্যাস ও শিক্ষা অনেক দিনের। পর্বতক্রোড়ে প্রতিপালিত এই সকল বালক-বালিকা মাতৃকোড় থেকে পর্বতক্রোড়ে প্রথম পদক্ষেপ ক'রেই এই রকম কষ্টসহ, নির্ভীক হ'তে চেষ্টা ক'রেছে,—তাই বুঝি একজন য়ুরোপীয় কবি ব'লেছেন, পর্বত স্বাধীনতার প্রসূতি। কিন্তু আমরা কেমন ক'রে সাহসী, কষ্টসহিষ্ণু হ'তে শিক্ষা ক'রবো? ছেলেবেলায় চল'তে চলতে দৈবাৎ যদি পদস্খলিত হ'তো, তা হ'লে মা দৌড়ে এসে গায়ের ধুলো ঝেড়ে দিতেন এবং মাটিতে লাথি মেরে বুঝিয়ে দিতেন আমার কোন দোষ নেই, যত দোষ মাটির ; সেই তাঁর যাদুকে গড়াগড়ি খাইয়েছে। তারপর ক্রমে বড় হ'য়ে হারিকেন লণ্ঠন ছাড়া চলতে শিখিনি এবং ঠাকুরমার রোমাঞ্চকর ভূতের গল্প শুনে নিজের লম্বা ছায়াকেও বিকট ভূত মনে ক'রে কতদিন চীৎকার ক'রেছি ; সুতরাং আমাদের সঙ্গে এদের কি রকমে তুলনা হ'তে পারে?

আমরা আহারাদি ক'রে মন্দিরে শয়নের উদ্যোগ ক'রতে লাগলুম। পাঠক-পাঠিকা আমাকে ক্ষমা ক'রবেন, এই আহারের পূর্বে আমার ডাইরীতে এমন একটা ব্যাপারের কথা আছে, যা এখানে উল্লেখ করায় সম্পূর্ণ আপত্তি ছিল, কিন্তু আমার এই ডায়েরী নকল করবার সময় আমার কাছে আমার একটি আত্মীয়া ব'সে ছিলেন। এই ব্যাপারটি গোপন করাতে তিনি আমার উপর এমন গঞ্জনা আরম্ভ ক'ল্লেন যে, আমি সেটি উল্লেখ না ক'রে থাকতে পাচ্ছিনে, বিশেষ তাঁর অনুরোধ উপেক্ষণীয় নয়। ব্যাপারটি তেমন কিছু গুরুতর নয়, একটু চা খাওয়া মাত্র। বিষ্ণুপ্রয়াগে এই শীতের মধ্যে একটু গরম হবার অভিপ্রায়ে যোশীমঠ হ'তে কিঞ্চিৎ চা-সংগ্রহ হয়েছিল ; সন্ধ্যার পর বিশেষ আয়েস ক'রে সেই চা-পান করা গিয়েছিল। তাতে আমাদের যা তৃপ্তি হ'য়েছিল তা বর্ণনাতীত ; এবং স্বামীজি চা-পানের উপসংহারে যে "আঃ" ব'লে আরামজ্ঞাপক শব্দ উচ্চারণ ক'রেছিলেন, তা অনেক দিন মনে থাকবে। আমরা সন্ন্যাসী মানুষ ; তবু আমাদের এই পর্বতের মধ্যে কাত্‌লির অভাবে লোটাতে জল গরম ক'রে চিনির অভাবে গুড় দিয়ে চা-খাওয়ার বিড়ম্বনা কেন, এই মনে ক'রে যদি কোন বিদ্রূপপরায়ণা পাঠিকা নাসিকা কুঞ্চিত করেন, এই ভয়ে এই চা খাওয়ার বৃত্তান্তটি বেমালুম গোপনের চেষ্টায় ছিলুম, কিন্তু ঘরের ঢেঁকি কুমীর হ'লেই বিপদ। যা হ'ক এই ব্যাপার প্রকাশ করতে বাধ্য করায় আমি তাঁর উপর বড় রাগ ক'রেছিলুম, কিন্তু তাতে আমাকে তিনি যে গল্প শুনিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে আমি বড়ই জব্দ হয়েছিলুম। তিনি ব'ল্লেন, একবার পুরুষোত্তমে এক সন্ন্যাসী একখানা ইঁট মাথায় দিয়ে শুয়ে ছিল। কতকগুলি যাত্রী সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন তার সঙ্গীদের ডেকে বললে, "একবার সন্ন্যাসী ঠাকুরের সুখ দেখ, যদি উঁচু জায়গায় মাথা না রাখলে শোয়া না হয় ত সন্ন্যাসী না হ'লেই হ'ত"! সন্ন্যাসী এই কথা শুনে ইঁটখানি

www.pathagar.com

দূরে ফেলে দিয়ে শুধুমাথায় শয়ন ক'রলে। তাতেও বেচারার অব্যাহতি নেই। পূর্বকথিত যাত্রী ব'লে উঠলো "হুঁ, সুখটুকুও আছে, রাগটুকুও আছে।" আগে যদি জানতুম কিছুদিন বাদে আমাকে এমন একটা বিড়ম্বনা সহ্য ক'রতে হবে, তা হলে কখনো বিষ্ণুপ্রয়াগের সেই মন্দিরে ব'সে চা খাবার যোগাড় ক'ত্তুম না। বুঝলুম ভগবান মানুষকে সর্বজ্ঞ না করুন, নিদেন দু'এক জায়গায় ভবিষ্যতজ্ঞ না ক'রে কাজ ভাল করেন নি।

আহারাদির পর স্বামীজি ও বৈদান্তিক শয়ন ক'ল্লেন। আমার চক্ষে ঘুম নেই। মন্দিরের মধ্যে ঘোর অন্ধকার, সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, কেবল মন্দিরের নীচে সঙ্গমস্থল হ'তে জলের 'হু হু' শব্দে নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে দিচ্ছে। কম্বলটা মুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে বাইরে এলুম। তখন রাত্রি অধিক হ'য়েছিল এবং আকাশে শুক্লপক্ষের ক্ষীণ চন্দ্রের উদয় হ'য়েছিল। বিজন পার্বত্য -প্রদেশ ঘুমন্ত, তার উপর চন্দ্রের মৃদু রশ্মি ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়েছে। আমি আস্তে আস্তে অতি সাবধানে মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে জলের ধারে এলুম এবং অনেকক্ষণ সেখানে ব'সে রইলুম। অতি সুন্দর মধুর রাত্রি, যদি এত শীত না থাকতো! ছোট ছোট ধাপে তার নির্মল জল আছড়ে প'ড়ছে আর ফেনিল আবর্তের উপর জ্যোৎস্না প'ড়েছে, ঠিক যেন একখানা সুন্দর ছবির মত দেখাতে লাগলো। গভীর রাত্রে এই অবিরাম শব্দ-উচ্ছৃঙ্খল ভাব যেন আকুলভাবে ব'লতে লাগলো :

"এ আবেগ নিয়ে কার কাছে যাব,
নিতে কে পারিবে মোরে!
কে আমারে পারে আঁকড়ি রাখিতে দুখানি বাহুর ডোরে।
আমি কেবল গাই কাতর গীত!
কেহ বা শুনিয়া ঘুমায় নিশীথে, কেহ জাগে চমকিত!
কত যে বেদনা, সে কেহ বোঝে না, কত যে আকুল আশা,
কত যে তীব্র পিপাসাকাতর ভাষা।"

অনেকক্ষণ এখানে ব'সে থাকলুম। যতক্ষণ ব'সেছিলুম বোধ হ'য়েছিল বুঝি জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছি ; যেন মৃত্যুর আবরণ ভেদ ক'রে এক মহাজীবনের অমর প্রান্তে এসে লেগেছি। এখন ভাসতে ভাসতে কোথায় যাব কে জানে?

অনেক রাত্রে স্বস্থানে এসে শয়ন ক'ল্লুম এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হ'য়ে প'ড়লুম।

www.pathagar.com

পাণ্ডুকেশ্বর

২৮এ মে বৃহস্পতিবার।।—ইতিপূর্বে যে ভয়ানক রাস্তার কথা ব'লেছি, আজ সেই রাস্তায় চলতে হবে। এতদিন ত ভয়ানক ভয়ানক পথই দেখে আসা গেল। আরো ভয়ানক। আমার ত তার একটা ধারণাই হ'লো না। এখন যদি কোন পথে গাড়ীর চাকার মত গড়িয়ে যাওয়া যায়, তা হ'লে একটা নূতন রকমের ভয়ানক হবে ব'লে বোধ হয়। যাহোক এই রাস্তার ভয়ানকত্ব জানবার জন্যে মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ আগ্রহ জন্মালো। বিষ্ণুপ্রয়াগ হ'তে বদরিনারায়ণ বারো ক্রোশ অর্থাৎ আঠার মাইল। এ দেশের এক ক্রোশ দেড় মাইল ; কিন্তু এইবার এক এক ক্রোশকে—'ডালভাঙ্গা" ক্রোশ বলা যেতে পারে। আমাদের সহরাঞ্চলের পাঠকমহাশয়দের বোধ হয় ডালভাঙ্গা ক্রোশের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই। বাঙ্গালীর কোন কোন জেলার পথিকেরা গন্তব্যস্থানে রওনা হবার সময় গাছের ডাল ভেঙ্গে তা হাতে নিয়ে চ'লতো। পথ চ'লতে চ'লতে রৌদের উত্তাপে যখন এই ডালের পাতাগুলি শুকিয়ে যেত, তখনই এক ক্রোশ পথ চলা হ'ত—তা আট ক্রোশ যাওয়ার পরই ডাল শুকোক, কি দশ ক্রোশ পরই শুকোক। বদরিনারায়ণের এই বারো ক্রোশ আমাদের দেশের "আট বারং ছিয়ানব্বই" ক্রোশের ধাক্কা।

রাস্তায় বের হ'য়ে ধীরে চলা আমার শাস্ত্রে লেখে নাই। যখন বঙ্কিমবাবুর সীতারামের দুই সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী ও শ্রী পুরুষোত্তম দর্শনাকাঙ্ক্ষায় যাচ্ছিলেন, সেই সময় শ্রীকে কিছু দ্রুতগামিনী দেখে জয়ন্তী ব'লেছিলেন, "ধীরে চ বহিন, তাড়াতাড়ি চ'ল্লে কি অদৃষ্টকে ছাড়াতে পারবি?"—তাড়াতাড়ি চল্লে যদি অদৃষ্টকে ছাড়ানো যেতো, তাহ'লে এতদিন এ দগ্ধ অদৃষ্ট অনেক পেছনে প'ড়ে আর কোন পথিকের স্কন্ধাবলম্বনের অবসর খুঁজতো। কিন্তু তা তো হবার নয় ; অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে ফেরে ; এবং তা জেনেও আমি তাড়াতাড়ি চলি ; অভিপ্রায়, অদৃষ্টে যা কিছু আছে শীঘ্র শীঘ্র ঘটে যাক ; তারপরে দিনকতক একটু বিশ্রাম ভোগ করা যাবে। বৈদান্তিক ভায়াও আমার তাড়াতাড়ি চলার একটা ভালরকম কৈফিয়ৎ চেয়েছিলেন। সেবার তাঁকে আমি এই কৈফিয়ৎ দিয়েছিলুম ; তাতে তিনি আমাকে যে সম্ভাবনা জানিয়েছিলেন, তার মধ্যে কতখানি বেদান্ত ও কতটুকু মায়াবাদ ছিল, তা ঠিক করতে পারি নি। যাই হ'ক, কিন্তু তাঁর গল্পে একটু নূতনত্ব ছিল এবং পথ চ'লতে সেই নূতনত্বটুকু বেশ আমোদজনক বোধ হয়েছিল। আমার সহৃদয় পাঠকগণকে আমি সে রস হ'তে বঞ্চিত করতে চাইনে, কারণ সেটা সাধুর লক্ষণ নয়।

বৈদান্তিক ভায়া বল্লেন, "আমি যে অদৃষ্টের ভোগটা তাড়াতাড়ি কাটিয়ে দিনকতক আরাম ভোগের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় স্ফীত হ'চ্ছি, তা আমার মত বিরক্ত মূঢ় নূতন সন্ন্যাসীর কাছে বড় সহজ ব'লে বোধ হ'লেও কাজে তা বিলক্ষণ কঠিন। যার ললাটে আরাম ভোগের কক্ষে শূন্য অঙ্ক লেখা আছে, সে কি ঋণ ক'রে আরাম ভোগ ক'রবে? আরাম-বিরামের রাজ্যে দেনাপাওনার কারবার থাকলে অনেক রাজারাজড়া অতি উচ্চ দাম দিয়ে এই জিনিসকে কিনতেন। কিন্তু ভগবানের মর্জি অন্য রকম।" বাস্তবিক অদৃষ্ট জিনিসটা বড়ই খারাপ, শুধু ইহলোকে নয়, পরলোকের পার পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে ছোটে ; এবং তার জন্যে কোন মুটে বা কুলীর আয়োজন করতে হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভায়া ব'ল্লেন,—"উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একজন লোকের কাকচরিত্র বিদ্যায় খানিকটা অভিজ্ঞতা ছিল। লোকটা

www.pathagar.com

একদিন শ্মশানের কাছে দিয়ে যেতে যেতে দেখলে, একটা অনেকদিনের পুরানো মড়ার মাথা প'ড়ে রয়েছে। সেই নর-কপালের সাদা সাদা অক্ষরগুলোর উপর লোকটার নজর প'ড়লো ;—কাকচরিত্র বিদ্যাবলে সে প'ড়লে—

"ভোজনং যত্র তত্রৈব শয়নং হট্টমন্দিরে,
মরণং গোমতীতীরে অপরং বা কিং ভবিষ্যতি।"

লোকটা শুধু কাকচরিত্রই যে জানতো তা নয়, একটু বুদ্ধিবৃত্তিরও ধার ধারতো। "অপরম্বা কি ভবিষ্যতি" প'ড়ে তার মনে কৌতূহল হলো, এরপরে আর কি হয় জানতে হবে। মরে গিয়েছে, শ্মশানে মাথার খুলিটে শুধু প'ড়ে রয়েছে, এখনো "অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি"? পণ্ডিত মড়ার মাথাটা কুড়িয়ে বাড়ি এনে তা একটা হাঁড়িতে পুরে একটা নির্জনস্থানে টাঙ্গিয়ে রাখলে। আরও নূতন কিছু হলো কিনা পরীক্ষার জন্যে প্রায়ই হাঁড়ির মুখ খুলে দেখে। একদিন পণ্ডিত কার্যোপলক্ষে দু-চার দিনের জন্যে বিদেশেযাত্রা ক'রলে পর, কৌতূহলাবিষ্টা পণ্ডিতপত্নী সেই হাঁড়ির মুখ খুলে দেখলেন, একটা নর-কপাল তার মধ্যে পরম সমাদরে রক্ষিত হ'য়েছে। পণ্ডিতের যিনি সহধর্মিণী, তাঁর পক্ষে এই নর-কপাল দেখে তাঁর প্রকৃত তথ্য অনুমান ক'রে নেওয়া অবশ্য নিতান্ত সহজ ব্যাপার হবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত ক'রলেন, আর কিছুই নয়, পণ্ডিতজীর বোধ হয় কোন প্রিয়তমা ছিল ; তার মৃত্যু হওয়াতে বিরহক্লিষ্ট পণ্ডিতবর তার মস্তকটি কুড়িয়ে এনে এইরূপ সঙ্গোপনে হাঁড়ির মধ্যে রেখে দিয়েছেন ; এবং মধ্যে মধ্যে এই কঙ্কালাবশেষখানি দেখেই দুঃসহ বিরহজ্বালা প্রশমন করেন। পণ্ডিতপত্নীর দুর্জয় ক্রোধ এবং অভিমানের উদয় হ'লো। পণ্ডিত সশরীরে সেখানে বর্তমান থাকলে বোধ হয় তিনি সম্মুখযুদ্ধে আহূত হ'তেন। সে বিষয়ে আপাততঃ কিঞ্চিৎ বিলম্ব দেখে পণ্ডিতপত্নী সেই নর-কপালখানি হাঁড়ি থেকে বের ক'রে ঢেঁকিতে চূর্ণ ক'রে একটা পচা নর্দমার মধ্যে নিক্ষেপ ক'ল্লেন। পণ্ডিত গৃহে ফিরে সর্বপ্রথমেই হাঁড়ি দেখতে গিয়ে দেখেন হাঁড়িও নেই, কঙ্কালও নেই। ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন, হাঁড়ি কোথায়? পত্নী পণ্ডিত মহাশয়কে বিরহ-ব্যথায় অত্যধিক ব্যাকুল করবার অভিপ্রায়ে সমস্ত কথা সবিস্তারে ব'লে প্রিয়তমার কপালের দুরবস্থা দেখাইবার জন্যে নর্দমার কাছে হাত ধ'রে নিয়ে গেলেন। পণ্ডিতের কিন্তু চক্ষুস্থির!—"অপরং বা কিম ভবিষ্যতি" এই রকম ভাবে ফলবে তা কে জানতো?

বৈদান্তিক ব'ল্লেন, মরণের পর যখন অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে ফেরে, তখন আমার সুখভোগের আশাটা অলীক মাত্র। বৈদান্তিকের আর কোন ক্ষমতা না থাক, তিনি মনটাকে বেশ দমিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু আমার তাতে বড় আসে যায় না।

গল্প করতে করতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়া গেল। উপক্রমণিকাতেই স্বামীজি আমাকে খুব ধীরে চলবার জন্যে অনুমতি ক'ল্লেন ; এবং আজ যদি তাড়াতাড়ি চলি, তা হ'লে আমার অসুখ হ'তে পারে ব'লে ভবিষ্যৎবাণী করতেও ছাড়লেন না ; কিন্তু তাঁর এ রকমের সাবধানতা নূতন নয়, কাজেই আমার কাছে তার তেমন দর হলো না।

আমরা খানিকদূর অগ্রসর হ'য়ে একটা কাঠের সাঁকো দিয়ে অলকানন্দা পার হলুম। সাঁকোটির উপর দিয়ে যেতে বড়ই ভয় করতে লাগলো। ইংরেজের তৈরি লোহার সাঁকোর উপর দিয়ে বেশ সগর্বে চলে যাওয়া যায়, কিন্তু পাহাড়ী কারিগরের তৈয়েরি এই কাঠের

www.pathagar.com

সাঁকোর কাছে এসে আমার সেকালের লছমণঝোলার কথা মনে পড়লো। বাস্তবিক এমন খারাপ সাঁকো আমি এ পর্যন্ত একটাও দেখি নি। যা হ'ক অতি সাবধানে সাঁকোটা পার হওয়া গেল। খানিক দূর এগিয়ে যখন পেছন ফিরে চাইলুম, তখন সঙ্গীদের কাকেও দেখতে পেলুম না। এই বাঁকা রাস্তায় পঞ্চাশ হাত এগিয়ে গেলে আর কাকেও বড় দেখবার যো নেই।

সাঁকো পার হ'য়ে রাস্তার ভীষণতা বুঝতে পাল্লুম। এ পর্যন্ত অনেক "চড়াই উৎরাই" দেখেছি, কিন্তু এমন "চড়াই উৎরাই" আর কোন দিন নজরে পড়ে নি! বরাবর শুধু চড়াই আর উৎরাই। বহুকষ্টে আধ মাইল চড়াই উঠলুম ; ওঠা যেই শেষ হলো অমনি আবার উৎরাই আরম্ভ ; আবার যেই উৎরাই শেষ হলো অমনি চড়াই আরম্ভ ; নাগরদোলার মত কেবল চড়াই আর উৎরাই। সমান জমি, কি সামান্য উঁচুনীচু রাস্তা মোটেই নেই। এই রকম তিন-চারটে চড়াই উৎরাই পার হ'লেই মানুষের জীবাত্মা ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়ে। আমি কতবার ক্রমাগত সাত আট মাইল চড়াই উঠেছি, কিন্তু কখনও এত কষ্ট হয় নি। একবার উঠা তারপরেই নামা, এতে যে কি কষ্ট তা বুঝানো সহজ নয়। বুকের হাড় ও পাঁজরাগুলো যেন চড়চড় ক'রে ভেঙ্গে যায়। তার সঙ্গে সঙ্গে আবার সর্বনেশে তৃষ্ণা ; এইমাত্র ঝরণার জল খাওয়া গেল, পরক্ষণেই মুখ নীরস, গলা শুকনো, যেন কতকাল জল খাওয়া হয় নি ; বুকের মধ্যে কে যেন মরুভূমি সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। তবে সুখের মধ্যে, এই পথে যত ঝরণা, এত ঝরণা আর এ পাহাড়-রাজ্যের কুত্রাপি দেখি নি ; আর এত ঝরণা আছে বলেই এ পথে মানুষ চলাফেরা ক'রতে পারে।

রাস্তায় চলতে আরম্ভ ক'রে গন্তব্যস্থানে না পৌঁছিয়ে আর আমি কখনো বিশ্রাম করিনে, কিন্তু এই ভয়ানক পথে এ রকম জিদ বজায় থাকলো না। চলি আর বসি এবং ঝরণা দেখলেই সেখানে গিয়ে অঞ্জলি পুরে জল খাই। রাস্তায় চার-পাঁচবার বিশ্রাম ক'রে এবং দশ-বারো বার জল খেয়ে শরীরের সঙ্গে শক্তির সঙ্গে আর এ বিষম পথের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ ক'রতে ক'রতে আট মাইল দূর পাণ্ডুকেশ্বরে উপস্থিত হ'লুম। বেলা তখন প্রায় নয়টা। এতখানি রাস্তা আমি তিন ঘণ্টায় এসেছি ; শুনলুম, যে সকল সন্ন্যাসী পাহাড়-ভ্রমণে অত্যন্ত অভ্যস্ত, তাঁহারাও পাঁচ ছয় ঘণ্টার কম বিষ্ণুপ্রয়াগ হ'তে পাণ্ডুকেশ্বরে আসতে পারে না। খুব অল্পসংখ্যক পাহাড়ী জোয়ানেরাই তিন ঘণ্টায় এ রাস্তা হাঁটতে পারে। আজ এই ভয়ানক দুর্গম রাস্তা অতিক্রম করতে একজন দুর্বল বঙ্গসন্তান, প্রবল-বিক্রম, বলিষ্ঠদেহ পাহাড়ীর সমকক্ষ হয়ে উঠেছে মনে ক'রে অহঙ্কারে আমার বুকখানা দশহাত হ'য়ে উঠলো ; এবং নিজেকে অদ্বিতীয় বঙ্গবীর স্থির ক'রে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ ভোগ করা গেল। কিন্তু হায়, সকলে আমার মত বাঙ্গালী নয় ; বঙ্গভূমির মুখ উজ্জ্বলও সকলের দ্বারা সম্ভব নয়। আমি অমিত-পরাক্রমে তিন ঘণ্টায় বিষ্ণুপ্রয়াগ হতে পাণ্ডুকেশ্বরে এলুম বটে, কিন্তু স্বামীজি ও বৈদান্তিক কারো দেখা নেই। এ বেলা তাঁরা আসতে পারেন, সে বিষয়েও আমার সন্দেহ হ'ল। তাঁরা দেখছি বাঙ্গালীর নাম রাখতে পারলেন না।

কি করা যায় ; পাণ্ডুকেশ্বরে এসে একটু ঘুরে বেড়ানো গেল। প্রথমেই পাণ্ডুকেশ্বরের নাম-রহস্য জানবার জন্য কৌতূহল হ'ল। শুনলুম, এখানে মহারাজ পাণ্ডু দীর্ঘকাল যাবৎ তপস্যা ক'রেছিলেন, তাই এ স্থানের নাম "পাণ্ডুকেশ্বর"। এখানে একটা খুব প্রাচীন মন্দির দেখতে পেলুম। বদরিকাশ্রমের রাস্তায় এ পর্যন্ত যতগুলি মন্দির দেখেছি, তার মধ্যে

www.pathagar.com

দুটির মত প্রাচীন মন্দির আর আমার নজরে পড়ে নি, একটি হৃষীকেশে, আর একটি এই পাণ্ডুকেশ্বরে। অনেককালের পুরানো ব'লে মন্দিরটার খানিক অংশ মাটির মধ্যে ব'সে গিয়েছে। মন্দিরের পাশে ছোট ছোট চার-পাঁচটা পাথরের কোটাবাড়ি আছে, সেগুলির জীর্ণ অবস্থা ; নানা রকমের গাছপালা তাদের মাথার উপর সগর্বে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাছগুলোই কি অল্পদিনের? তাদের মোটা মোটা শিকড়গুলি পাথরের মধ্যে প্রবেশ করতে কতকাল লেগেছে! এই সকল মন্দিরের সংস্কারের কোন সম্ভাবনা নেই ; আর বিশ পঁচিশ বছর পরে সমস্ত ভেঙ্গে প'ড়ে যাবে, এবং এগুলি কি ছিল তা জানবার পর্যন্ত উপায় থাকবে না। এ রকম ভাঙ্গা স্তূপ আমরা এ পর্যন্ত কত দেখেছি ; সেগুলি উদাসীন চোখের সামনে দু'দণ্ডের বেশী স্থায়িত্বলাভ করে নি ; কিন্তু এককালে সে সকল স্তূপ যে কত গৌরব, কত পবিত্রতা এবং মহিমার অখণ্ড বাসস্থান ছিল, তা ভাবলে মনের মধ্যে একটা সঙ্কোচপূর্ণ ভক্তির আবির্ভাব হয়। মনে হয় জীবন ও মৃত্যু শুধু জীবজগৎকেই যে আচ্ছন্ন ক'রে আছে তা নয়, এই জড়জগতের বহু দ্রব্যও জীবিতের ন্যায় উচ্চ সম্মান এবং প্রবল খ্যাতি লাভ করে ; কিন্তু কালক্রমে তাদের মৃত্যু হ'লে, তখন তাদের মানসম্ভ্রম, খ্যাতি-প্রতিপত্তি সমস্তই শৈবালাচ্ছাদিত ইষ্টক বা প্রস্তর স্তূপের নিম্নে সমাহিত হ'য়ে যায় এবং দর্শকগণ কদাচিৎ তাদের দিকে একবার চক্ষু ফিরিয়ে অতীত গৌরবের কথা চিন্তা করে।

পাণ্ডুকেশ্বরের বাজারটি নিতান্ত ছোট নয়, কিন্তু যদি বারো মাস এখানে লোক বাস ক'রতে পারতো, তা হ'লে বাজারটি আরও ভাল হ'ত। লোকে গ্রীষ্মের চার পাঁচ মাস কেবল এখানে বসবাস করতে পারে, দোকানেও কেবল সেই কয় মাস খরিদবিক্রী হয়। শীত পড়তে আরম্ভ হ'লে দোকানী পসারী এবং বাসিন্দা লোকজন বিষ্ণুপ্রয়াগ, যোশীমঠ প্রভৃতি স্থানে উঠে যায়। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে আবার সকলে ফিরে এসে নিজ নিজ আড্ডা দখল ক'রে বসে। এতদিন এ স্থানটা জনসমাগমশূন্য ছিল, আজ কয়েকদিন হ'তে আবার লোক জুটতে আরম্ভ হ'য়েছে। কারণ এখানে গ্রীষ্মের সূত্রপাত মাত্র। গ্রীষ্মের সূত্রপাত শুনে পাঠক মনে করবেন না, আমাদের দেশে ফাল্গুন মাসের শেষে যে অবস্থা হয়, এখানেও সেই রকম। মাঘমাসের শীতের তিনগুণ শীত কল্পনা ক'রে নিলে এ শীতের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু শীতকালের অবস্থা আমরা কিছুতেই কল্পনা ক'রে উঠতে পারিনে—তা আমাদের কল্পনাশক্তি যতই প্রবল হ'ক। এখন বরফ গলছে, আর শহরগুলি বরফের মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হ'চ্ছে। এ দৃশ্য বড়ই সুন্দর। শীতকালে সমস্ত বরফে ঢাকা থাকে। একটা স্থান দেখলুম, সমস্ত বরফে ঢাকা ; একদিন পরেই দেখা গেল বরফ গলে গলে তার মধ্য থেকে একটা দীর্ঘচূড়া প্রকাণ্ড মন্দির বের হ'য়ে পড়েছে। হঠাৎ এই রকম পরিবর্তন দেখলে মনে ভারি আনন্দ হয়। আমি চ'লতে চ'লতে দেখচি সহরের অনেক স্থান অনেক পথ এখনো বরফে ঢাকা রয়েছে ; স্থানে স্থানে বা বরফ গ'লছে, আর তার ভিতর থেকে ঘাস বেরিয়ে পড়ছে। চারিদিক সাদা, মধ্যে মধ্যে নবীন তৃণ মাথা তুলে দিয়ে চারিদিকের তুষারধবল স্তূপের মধ্যে অনেকখানি নূতনত্ব বিস্তার ক'রছে।

ঘুরে ঘুরে একটা দোকানঘরে এসে ব'সলুম। দশটা বেজে গিয়েছে ; এখনও সঙ্গীদের দেখা নেই। এই অপরিচিত জনবিরল স্থানে একা বড়ই কষ্ট বোধ হ'তে লাগলো ; সঙ্গীদের জন্যও ভাবনা হ'তে লাগলো।

www.pathagar.com

ক্রমে যত বেলা বাড়তে লাগলো, ততই শরীরের মধ্যে গরম বোধ করতে লাগলুম। বোধ হতে লাগলো যেন শরীরের মধ্য দিয়ে আগুন ছুটে বেরোচ্ছে। আমি আর ব'সে থাকতে পাল্লুম না, কম্বল মুড়ি দিয়ে সেই দোকানেই শুয়ে পড়লুম। ক্রমে এমন মাথা ধ'রলো যে তা আর বলবার নয় ; মনে হ'লো মাথার মধ্যে কে ক্রমাগত হাতুড়ীর বাড়ি মারছে। চোখ দুটি বের হবার উপক্রম হ'ল এবং বুকের মধ্যে এমন যন্ত্রণা যে শ্বাসরোধের আশঙ্কা হ'তে লাগলো, স্থির হ'য়ে থাকতে পাল্লুম না, যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলুম। শুয়ে থাকি তাতেও কষ্ট, উঠে বসি তারও উপায় নেই ; তার উপর এমন জায়গায় এসে প'ড়েছি যে, আমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে, এমন লোকও একটি নেই! যে দোকানে প'ড়ে রয়েছি, সে দোকানদার এখনও নীচে থেকে এসে পৌঁছে নি। পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত ; অদূরে ঝরণা, কিন্তু সাধ্য নেই উঠে গিয়ে একটু জল খেয়ে আসি। অল্পক্ষণ পরে বমি আরম্ভ হ'লো সঙ্গে সঙ্গে পিপাসারও বৃদ্ধি হ'লো। এই দারুণ পথে বেড়াতে বেড়াতে অনেকবারই আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছি ; কিন্তু মনে হ'লো যেন আজ আর অব্যাহতি নেই। এই মহাপ্রস্থানের পথে একটা ব্যর্থ জীবন তার অলসমধ্যাহ্নেই কি আয়ুর শেষপ্রান্তে এসে উপস্থিত হ'লো? হায়, আজ সকালেও জানতুম না এই নির্জন স্থানে, সঙ্গীন অবস্থায় এ রকম ভাবে প্রাণবিয়োগ হবে। শারীরিক যাতনার সঙ্গে এইরূপ মানসিক চিন্তার উদয় হওয়ায় প্রাণ আরো ছটফট করতে লাগলো। মৃত্যুভয়ে যে বেশী কাতর হ'য়েছিলুম এমনও বলতে পারিনে। দুঃখ, কষ্ট, অশান্তি, যন্ত্রণা কিসের অভাব আছে, যার জন্যে মৃত্যুর শান্তি এবং নিরুদ্বেগ তুচ্ছ জ্ঞান ক'রবো। তবে এত যন্ত্রণাতেও যে বেঁচে থাকতে ইচ্ছা হ'চ্ছিল, এটাও অস্বীকার ক'রতে পাচ্ছিনে। আসল কথা আমাদের জীবনের প্রতিদিনের এই অভ্যস্ত স্রোত এবং সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার চক্রের মধ্যে হঠাৎ যে অজ্ঞাত, পরীক্ষাতীত, রহস্যসঙ্কুল ঘটনার নূতনত্ব এসে সমস্ত গোল ক'রে দেবে, এবং বর্তমানের সমাপ্তি হ'য়ে যাবে, এ দেখতে আমরা রাজী নই ; তাই হাজার দুঃখেও আমরা মৃত্যু চাইনে। কে জানে, মৃত্যুর পর আমাদের প্রাণ বর্তমানের আকাঙ্ক্ষা অভাব ও কষ্টের প্রাবল্যকেই কত সুমধুর ব'লে পুনর্বার তা পাবার আগ্রহ করে না?

বেলা যখন দ্বিপ্রহর হ'য়ে গেছে, তখন আমার সঙ্গীদ্বয় এসে পৌঁছলেন, তাঁরা দুইজনে পথশ্রমে মরার মত হয়ে এসেছিলেন ; কিন্তু আমার অবস্থা দেখে তাঁরা নিজের কষ্ট ভুলে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপরেই স্বামীজি ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে আমাকে কোলে তুলে বাতাস করতে লাগলেন এবং ব্যাকুলভাবে আমাকে কত স্নেহের ভর্ৎসনা ক'ল্লেন! অচ্যুতভায়া আমার সর্বশরীরে হাত বুলোতে লাগলেন। আমার মাথাটা যাতে একটু ভাল থাকে, এজন্য সহস্র চেষ্টা হ'তে লাগলো। আমার আরোগ্যের জন্যে এঁদের দুজনের প্রাণের সমগ্র আগ্রহ এবং হৃদয়ের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হ'লো ; কিন্তু তাঁদের চেষ্টার ফল হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। আমি অবশেষে অবসন্ন হ'য়ে প'ড়লুম। নিরুপায় দেখে স্বামীজি ও অচ্যুত ভায়া একজন লোককে জল গরম ক'রতে অনুমতি দিলেন। সে ক্রমাগত জল গরম ক'রে আমার পায়ে ঢালতে লাগলো।। জলই কি শীঘ্র গরম হয়? অনেক চেষ্টাতে জল খানিকটে গরম হ'লো, টগবগ ক'রে ফুটচে, হু হু ক'রে তাপ উঠছে। উনোন হতে নামিয়ে যেমনি পায়ে ঢালা অমনি ঠাণ্ডা ; আমাদের দেশে শীতকালে কলসীর জল যে রকম ঠাণ্ডা হয়, সেই রকম। অনেকক্ষণ পরে এই রকম

www.pathagar.com

জল ঢালতে ঢালতে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হ'লো। তখন তাঁরা আমাকে ধরাধরি ক'রে চারিদিকে বন্ধ একটা অন্ধকার ঘরে নিয়ে গিয়ে শোয়ালেন। ক্রমে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম।

শেষবেলা জেগে উঠে দেখি, অচ্যুতানন্দ ও স্বামীজি আমার পাশে বসে আছেন, আমার সম্মুকে একখানি আসনে একজন গায়ে জামাজোড়া, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি ভদ্রলোক ঘরখানা জমকে নিয়ে ব'সে রয়েছেন। লোকটির চেহারা দেখেই একজন বড়লোক বলে বোধ হ'লো। হঠাৎ এখানে তাঁর কি রকমে আবির্ভাব হ'ল, ভেবে আমি একটু আশ্চর্য হ'য়ে গেলুম! এদিকে ওদিকে চেয়ে দেখলুম তাঁর সঙ্গে অন্য দুই-চারজন লোকও আছে। এঁদের পরিচয় জানবার জন্য আমার ভারি কৌতূহল হ'লো। আমার কিন্তু ক্ষুধার প্রবৃত্তিটা আরো প্রবল হ'য়ে উঠায়, আগে আহারের চেষ্টাতেই প্রবৃত্ত হ'তে হ'লো। আমি নিদ্রিত হ'লে স্বামিজী ও অচ্যুত ভায়া রুটি তৈয়েরি ক'রে নিজেরা খেয়ে আমার জন্যে কতক ভাগ রেখে দিয়েছিলেন, আমি উঠে বসে পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে সেগুলি উদরস্থ ক'ল্লুম। আহারান্তে একলোটা জল খেয়েই সমস্ত ক্লান্তি ও পরিশ্রম যেন দূর হ'য়ে গেল।

একটু সুস্থ হ'য়ে এই অভ্যাগত ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ ক'ল্লুম। এঁর নাম পণ্ডিত কাশীনাথ জ্যোতিষী ; জন্মস্থান গুজরাট ; সম্প্রতি কলিকাতা থেকে আসছেন। কলিকাতায় ইনি মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের বাড়িতে বাস করেন। শুনলুম মহারাজা বাহাদুর এঁকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি করেন। বাঙ্গলা দেশের কোন সংবাদই অনেকদিন পাইনি। জ্যোতিষী মহাশয়ের সঙ্গে বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধে অনেক কথা হ'লো। তিনি কলিকাতার অনেক বড় বড় ঘরের কথা বলতে লাগলেন ; দেখলুম লোকটি শুধু জ্যোতিষের রহস্য পর্যালোচনাতেই যে সময়ক্ষেপ করেন তা নয়, রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর স্বাধীন মতামতের পরিচয় পাওয়া গেল ; আর বাস্তবিক এতে আশ্চর্য হ'বার বিশেষ কিছু নেই। লোকতত্ত্বে যাঁদের অসাধারণ কৃতিত্ব আছে—রাজনীতি, সমাজনীতি তাঁদের সহজে বোঝাই সম্ভব।

এতক্ষণ পরে জ্যোতিষী মহাশয় নিজের কথা পাড়লেন। কলিকাতার ধনকুবের এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কার কি রকম অদৃষ্ট গণনা ক'রেছেন, কার কি কি ভাল ফলেছে এবং কে তাঁকে কি রকমে শ্রদ্ধাভক্তি করেন, সেই সকল কথা পুণঃ পুনঃ ব'লতে লাগলেন। নিজ মুখে যদি কাকেও আত্মপ্রশংসা ক'রতে শোনা যায়—তবে সে হাজার ভাল লোকের মুখে হ'লেও ভাল লাগে না। জ্যোতিষী মহাশয় খুব বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ধার্মিক লোক হ'তে পারেন, কিন্তু তাঁর এইরূপ আত্মপ্রশংসায় আমি অতিকষ্টে ধৈর্য রক্ষা ক'রতে পেরেছিলুম, বিশেষ এই অসুস্থ শরীরে। যা হ'ক, আমার এই ধৈর্যাতিশয্যে জ্যোতিষী মহাশয়ের উৎসাহ বা সাহস বোধ হয় বেড়ে গেল ; হয়ত এমন নির্বিবাদ শ্রোতা বহুদিন তাঁর ভাগ্যে জোটে নি। তিনি একজন ভৃত্যকে ডেকে তাঁর বাক্স আনতে বললেন। বাক্স আনা হ'লে তিনি তার মধ্য হ'তে কতকগুলি খাতাপত্র বের করলেন। আমার বড়ই আশঙ্কা উপস্থিত হ'লো ; ভাবলাম এখনি বা আমার অদৃষ্টই গণনা ক'রে আমার ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব নখদর্পণে দেখিয়ে দেন। আমার ভবিষ্যৎ জানবার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না ; জানি সেখানে আমার জন্যে অনেক দুঃখ জমানো আছে ; আলাদা ক'রে

www.pathagar.com

ফর্দমাফিক সে সমস্ত দুঃখ জেনে আর কি ফল হ'বে ?—মনে মনে এই রকম তর্ক করচি, এমন সময় জ্যোতিষী মহাশয় আমার হাতে কতকগুলি কাগজপত্র দান ক'ল্লেন। ও হরি, এগুলো জ্যোতিষের কোন পুঁথি নয়,—ইংরেজি, ফারসীতে লেখা কতকগুলি প্রশংসাপত্র। যে সমস্ত আমার দেখবার কিছুমাত্র আবশ্যক ছিল না ; এবং সে জন্যে আমার মনে একটুও কৌতূহলের উদ্রেক হয় নি ; কিন্তু জ্যোতিষী মহাশয় ছাড়বার পাত্র নন। ইংরেজীগুলো প'ড়ে তাঁকে তার অর্থ বোঝাবার জন্যে আমাকে অনুরোধ ক'ল্লেন, এবং আমি ফারসী জানিনে ব'লে দুঃখ ক'রে তিনিই ফারসী প্রশংসাপত্রগুলি প'ড়ে আমাকে তার অর্থ বোঝাতে লাগলেন। পড়ার ভঙ্গিমাই বা কি! আমি বলি আমার অর্থ বোঝবার দরকার নেই, কিন্তু তিনি যদি কিছুতেই ছাড়েন! দেখলুম ভারতবর্ষের বহু প্রদেশ হতে তিনি প্রশংসাপত্র পেয়েছেন, এবং সকল প্রশংসাপত্রেই তাঁর প্রধান জ্যোতিষী ব'লে খ্যাতি আছে। দেশে মহারাট্টাদের প্রদত্ত অনেক জায়গীর আছে ; তা হ'তে জ্যোতিষীজির প্রচুর অর্থাগম হয়। ইনি নিজের অর্থে তীর্থপর্যটনে এসেছেন। যেখানে যান, সেখানে অনেক অতিথিসেবা করান ; সঙ্গে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী ও চাকর-বাকর আছে। এই দুরারোহ পাহাড় কি হেঁটে পার হওয়া যায়?—তাই পাহাড়ীদের কাঁধে চ'ড়ে তীর্থভ্রমণ ক'রচেন ইত্যাদি নানা কথা ব'লতে লাগলেন। লোকটার লেখাপড়াও জানা আছে ; কিন্তু নিজের গরিমা, বিদ্যার গরিমা, দানের গরিমা, মানসম্ভ্রমের গরিমা প্রকাশ করবার জন্যে লোকটা মহাব্যস্ত। ভারি আশ্চর্য মনে হয় যে, এই রকম গরিমা প্রকাশ করাটা নিতান্তই অনুচিত কাজ, এবং এতে মানুষের কাছে বরঞ্চ আরো লঘু হ'য়ে পড়তে হয়, এতটুকু সাধারণ জ্ঞানও কেন এঁদের নেই? যাহা হউক, সুবিধার বিষয় এই, যাঁরা ঐরূপ প্রশংসাপ্রিয়, তাঁদের খোসামোদের দ্বারা সময়ে ঢের কাজ বাগানো যায়। এই প্রসঙ্গে আমার একটি বন্ধুর কথা মনে প'ড়েছে। বন্ধুটি কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত লোক, তাঁর অর্থ অনেক। কিন্তু আমাদের ন্যায় বন্ধুগণের ভোজে সে অর্থের সদ্ব্যয় কদাচিৎ মাত্র হ'য়ে থাকে। আমরা একদিন তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করায় তাঁর ভ্রাতা একটা খুব বড়রকমের মাছ এনে একটু ভালরকম খাওয়ার আয়োজন করেন। বন্ধুটি ভ্রাতার এই কার্যে একেবারে খড়্গহস্ত ; রাগে কত কথাই ব'ল্লেন, 'একালের ছোঁড়াগুলো কর্তাব্যক্তিদের গ্রাহ্যই করতে চায় না (তাঁর অনুমতি না নিয়ে মাছ আনা হ'য়েছিল, তাই বোধ করি এ কথা), আবার একালের ছেলেগুলো ভারি অমিতব্যয়ী, বাজে পয়সা খরচ না ক'ল্লে এদের হাত যেন শুড়শুড় করে (দুই টাকা চার আনা দিয়ে মাছ কেনা হয়েছে, সে কি সহ্য হয়?)। আহারান্তে ব'ল্লেন, "ছেলেগুলো ইংরেজী শিখে দেশটা উচ্ছন্ন দিলে" (নিজে ইংরেজী জানেন না)। এই ঘটনার পরদিন আমি আর উল্লিখিত মিতব্যয়ী বন্ধু এই দুজনে বেলা আটটার সময় ট্রামে চেপে চৌরঙ্গির দিক হ'তে ফিরে আসচি। জোড়াসাঁকোর কাছে এসে আমাদের খাওয়াদাওয়ার গল্প আরম্ভ হ'লো। আমি বল্লুম, "আগে আগে কলকাতায় এসে ভাল খাবার পাওয়া যেতো, এখন সে রাম নেই সে অযোধ্যাও নেই। যারা খাওয়াবে তারা সকলেই এখন কলিকাতা ছাড়া ; তবু যে মধ্যে মধ্যে এখানে এলে ভাল খাওয়া যায় সে কেবল এক তোমার জন্যে। তুমি ত আর কিছু বন্ধুবান্ধবকে খারাপ খাওয়াতে পার না ; এজন্যে পয়সা ব্যয় করতেও তোমার আপত্তি নেই। নিজেই ভাল জিনিস সন্ধান ক'রে খাওয়াদাওয়ার উদ্যোগ করা, এ গুণটি তোমার যেমন, আর কারো সে রকম দেখতে

www.pathagar.com

পাইনে।" বন্ধু যেন স্বর্গ হাতে পেলেন ; অমনি তাঁর মুখ খুলে গেল, আমার হাত দু'টি ধ'রে সবিনয়ে বল্লেন, "দেখ ভাই, তোমাদের খাওয়াবার জন্যে আমার বড়ই আগ্রহ হয়। একসঙ্গে যে পাঁচদিন আমোদের কাটানো যায়, সেও পরম সুখের কথা। টাকাকড়ি তো আর সঙ্গে যাবে না, কিন্তু এ কথা বোঝে ক'জন?—" দেখতে দেখতে ট্রামগাড়ি ঘড়ঘড় শব্দে নূতনবাজারে এসে পড়লো। বন্ধুবর চীৎকার ক'রে ব'ল্লেন, "বাঁধো"। গাড়ি না বাঁধলে ভায়া নামতে পারতেন না, সুতরাং তাঁর নামবার আবশ্যক হলে তার জন্যে অনেকখানি আয়োজন করতে হ'তো। অনেক সোরগোল ক'রে তিনি নেমে পড়লেন, তারপর আমার হাত ধ'রে টানাটানি। আমি বল্লুম, "নামতে হবে শোভাবাজারের মোড়ে, এখানে হঠাৎ তোমার কি কাজ পড়ে গেল?" ভায়া কোন দিকে কান না দিয়ে আমার হাত ধ'রে বাজারের ভিতর প্রবেশ কল্লেন, এবং খেজুরগাছের মাথার মত মাথাওয়ালা এক ডজন গলদাচিংড়ি, দুর্মূল্য ফুলকপি এবং কড়াইশুঁটি প্রভৃতিতে তিন টাকার বাজার নিয়ে বাসার দিকে চল্লেন। শুধু আমি অবাক নই, বাসায় উপস্থিত হ'লে সকলেই অবাক হ'য়ে গেল! রাত্রে মহাধুমে পোলাও কালিয়ার বন্দোবস্ত হলো। সেদিন দাদার অমিতব্যয়িতার পরিচয় পেয়ে অমিতব্যয়ী ছোটভাইটি যে সকল স্বগত উক্তি ক'রেছিল, তা প্রকাশ্যে বল্লে বোধ হয় আমোদ আর একটু বেশী হ'ত। যা হ'ক ইংরাজী না শিখলে দেশ কিরকম ক'রে উদ্ধার হয় রাত্রে দাদার কাছে সে তার অতি সুন্দর পরিচয় পেয়েছিল। সেই অনেক দিনের পুরানো কথা আজ খুলে লিখলুম, এখন বন্ধুবিচ্ছেদ না হলে বাঁচি।

যা হোক, শত শত প্রশংসাপত্র দেখিয়েও জ্যোতিষী মহাশয়ের আস মিটলো না। শেষে বাক্সের ভিতর থেকে দু'তিনখানা "অমৃতবাজার" বের ক'রে আমাকে দুই-তিনটে জায়গা প'ড়তে দিলেন। পাশে লাল দাগ দেওয়া ;—দেখলুম, হরিদ্বারে কুম্ভমেলার সময় ইনি নিজে খরচপত্র ক'রে অনেক গরীব সাধু-সন্ন্যাসীকে আহার দিয়েছিলেন ও এতদ্ভিন্ন প্রচুর বস্ত্র-অর্থাদিও দান ক'রেছিলেন, এই কথা কে "অমৃতবাজারে" টেলিগ্রাম ক'রেছে ; ইনি সেই সমস্ত টেলিগ্রাম সংগ্রহ ক'রে রেখেছেন।

জ্যোতিষীর কাছে মহারাজ ঠাকুর বাহাদুর ও কুমার বাহাদুরের ফটো দেখতে পেলুম, উজ্জ্বল, প্রসন্ন, শান্তিপূর্ণ বদন এবং তাতে পুরুষসুলভ কাঠিন্যের অভাব দেখে মনে আপনিই একটা প্রীতি এবং শ্রদ্ধাভক্তির ভাব এসে উপস্থিত হ'লো। কতদিন স্বদেশ দেখি নি—স্বদেশীর মুখ পর্যন্ত যেন ভুলে গিয়েছি। আজ এই ছবি দু'খানি দেখে ভারি আনন্দ লাভ ক'ল্লুম। এই প্রবাসের মধ্যে বোধ হ'ল, এঁরা আমার পরম আত্মীয়। কোথায় মহৈশ্বর্যসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত রাজপরিবার, আর কোথায় সংসারত্যাগী পথের ফকির ; আমি কিন্তু আমাদের মধ্যে এই গভীর ব্যবধান ভুলে গেলুম। শুনেছি স্বর্গে মানুষে মানুষে ব্যবধান নেই, স্বর্গের এই দ্বারদেশে কি তারই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে?

সন্ধ্যার সময় একটু বাইরে বেড়াতে গেলুম। সন্ধ্যার বাতাসে এবং স্নিগ্ধতার মধ্যে শরীর অনেকটা ভাল বোধ হ'লো। আস্তে আস্তে পাণ্ডুকেশ্বরের মন্দির এবং আরো গোটাকতক ভাঙা মন্দির দেখে এলুম। দেখতে দেখতে আকাশে মেঘ ক'রে এল, আমরা কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিলুম। অল্পক্ষণের মধ্যেই ভয়ানক শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হলো, শীতে আমরা আড়ষ্ট হ'য়ে পড়লুম—ভাগ্যি আমরা আগেকার সেই দোকানঘরটা ছেড়ে এসেছি তাই রক্ষা, নতুবা আজ মারা পড়ার আটক ছিল না। যতক্ষণ জেগেছিলুম,

www.pathagar.com

বৃষ্টি একবারও থামেনি। রাত্রিতে আর কিছু আহারাদি হ'ল না, বেশ আরামের সঙ্গে রাত কাটানো গেল। স্বামীজি ব'লেছিলেন, আগামী কল্যই আমরা বদরিকাশ্রমে পৌঁছতে পারবো। সেই কথা শুনে আমার বড় আনন্দ হ'য়েছিল। এত কষ্ট এত পরিশ্রম, এত কঠোর উদ্যম, কাল সমস্ত সার্থক হবে! যাঁরা নিষ্ঠাবান ধার্মিক, ভগবানের চিরপ্রসন্নতাই যাঁদের লক্ষ্য, এবং ভক্তিকেই যাঁরা জীবনপথের অমূল্য পাথেয় ব'লে ধ্রুব জেনেছেন, তাঁদের শান্তিলাভ অসম্ভব কথা নয়। কিন্তু আমার লক্ষ্য, আমার উদ্দেশ্য যে কিছুই নেই। বদরিনারায়ণের মধুর সত্তা কি আমার হৃদয়ের দারুণ পিপাসা নিবারণ করতে পারবে? দেখি যদি সাধুর এই অভীষ্ট মন্দিরে, এই সনাতন ধর্মের পীঠস্থলে একটু শান্তি একটু তৃপ্তি যুগান্তব্যাপী মাহাত্ম্যের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। আশায়, উৎসাহে এবং স্বপ্ন-জাগরণে সমস্ত রাত্রি কেটে গেল।

www.pathagar.com

বদরিকাশ্রমে

২৯ মে, শুক্রবার।—মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা ছিল, খুব ভোরে বের হ'য়ে পড়তে হবে, তাই রাত থাকতেই ঘুম ভেঙে গেল। তখনই আমরা যাত্রার আয়োজন ক'রে নিলুম। আজ আমাদের যাত্রার অবসান। আনন্দে, উৎসাহে এবং সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা নিরাশায় হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে যাচ্ছিল। কোন কবি লিখেছেন, "আশা যার নাই তার কিসের বিষাদ" —আমারও কোন বিষাদ ছিল না, কিন্তু যোগী-ঋষিগণ যে সুখের আস্বাদনে বিমুগ্ধ, আমার সে সুখ কোথায়?—আজ হিমালয়ের পাষাণমণ্ডিত স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের শস্যশ্যামলা, নদনদীশোভিতা, সমতল মাতৃভূমির দিকে চক্ষু ফিরিয়ে মনে মনে ভাবলুম, কোথা সুখ, কোথা তুমি? মাতা বঙ্গভূমি, তোমাকে ত্যাগ ক'রে আজ ভূতলে অতুলতীর্থ বদরিকাশ্রমের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে আছি। সুখের সন্ধানেই এতদূর এসেছি ; সুখ নাই মিলুক, শান্তি কৈ? হায়, মনে সে পবিত্রতা নেই, চিত্তের সে দৃঢ়তা নেই, প্রাণের সে একাগ্রতা নেই, কিসে হৃদয়ে শান্তি পাব? এত পরিশ্রম, জীবনের এই কঠোর ব্রত সমস্তই নিষ্ফল হ'লো।

আমাদের আগে আগে কয়েকজন সাধু অগ্রসর হ'চ্ছিলেন ; তাঁদের আনন্দ, তাঁদের প্রাণের উচ্ছ্বাস দেখে আমার হিংসা হ'তে লাগলো। বদরিনারায়ণের উপর পূর্ণ বিশ্বাসে সোৎসাহে তাঁরা অগ্রসর হ'চ্ছেন, বিশ্বাসরত্ন-অপহৃত হতভাগ্য আমি তাঁদের সেই সুখস্বর্গচ্যুত! সত্য বটে, জীবনে একদিন এমন সুখ ছিল, যার তুলনায় অন্য সুখ কামনা ক'রতুম না ; কিন্তু তা হারিয়েছি ব'লেই কক্ষচ্যুত গ্রহের মত দেশে দেশে ঘুরে আজ এই গিরিরাজ্যে অনন্ত হিমানীর মধ্যে প্রাণের যাতনা বিসর্জন দিতে এসেছি। দেবতায় ভক্তি নেই, চির প্রেমময়ের মঙ্গলময়ত্বেও বিশ্বাস নেই ; তবু আশা, যদি প্রাণ শীতল হয়। জানি ধর্মরাজ্যে, প্রেমের রাজ্যে, স্বর্গরাজ্যে 'যদি'র প্রবেশ নিষেধ। তাই আশার মধ্যে নিরাশা, আনন্দের মধ্যেও নিরানন্দ ভাব প্রবেশ ক'রতে লাগলো। তবুও স্বামীজির আনন্দ, বৈদান্তিকের উৎসাহ এবং অন্যান্য যাত্রীদের প্রফুল্ল মুখ দেখে হৃদয় প্রসন্ন হ'য়ে উঠলো ; প্রাণের দীনতা ও আশার ক্ষীণতায় এই রকম ধার করা উৎসাহ ও আমোদ ঢেকে খুব স্ফূর্তি ক'রে অগ্রসর হ'তে লাগলুম।

আমাদের আগে পিছে আরও যাত্রী যাচ্ছিল ; কিন্তু আমরা তিনটিতে একদল। পথে যেতে অনেকগুলি কুঁড়েঘর রাস্তার ধারে নজরে পড়লো। এ সকল ঘর পাহাড়ী লোকের বাঁধা। তারা এ সকল জায়গা থেকে কাঠ দুধ প্রভৃতি নিয়ে বদরিনারায়ণে বিক্রী ক'রে আসে ; এতে তাদের বেশ উপার্জন হয়। পাণ্ডুকেশ্বর ছেড়ে আরো এক মাইল উপরে এখনও বাস করবার যো হয়নি, সমস্ত বরফে ঢাকা। এতদিন দূর হ'তে পর্বতের গায়ে, চূড়ায় বরফের স্তূপ দেখে এসেছি, সময়ে সময়ে বরফের ভিতর দিয়ে যেতে হ'য়েছে বটে, কিন্তু সে অল্প সময়ের জন্য, এবং তাতে বরফের ভিতর দিয়ে চলার অসুবিধা ভোগ ক'রতে হয়নি। আজ দিগন্তবিস্তৃত শ্বেত তুষারের রাজ্য দিয়ে যেতে লাগলুম। ইতিপূর্বে যে পথ দিয়ে চ'লেছিলুম, কিছুদিন আগে যে সকল জায়গা বরফে ঢাকা ছিল, গ্রীষ্মকাল আসায় তা গ'লে পথঘাট সব বেরিয়ে প'ড়েছে ; কিন্তু এ স্থানটি অনেক উচ্চ, তাই এখানকার বরফ আজও গলেনি। পায়ের নীচে কতক জায়গায় বরফ কর্দমময়

www.pathagar.com

হ'য়েছে মাত্র। শীতের প্রারম্ভে নারিকেল-তৈল যেরকম জমে, অনেকটা সে রকম ; কিন্তু খানিক উপর হ'তে ঊর্ধ্বতন প্রদেশে যে বরফ আছে, তা জমাট পাষাণ স্তূপের মত। সৃষ্টির শেষ দিন পর্যন্ত তা সেই এক ভাবেই থাকবে ব'লে বোধ হয়। শীতের সময় বিষ্ণুপ্রয়াগ, কোন কোন বার যোশীমঠ পর্যন্ত, বরফের মধ্যে ডুবে থাকে, গ্রীষ্মকালে নীচের বরফ জল হ'য়ে নদীস্রোতের বৃদ্ধি করে ; সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির একটা নবজীবন, একটা নূতন মাধুরী পরিস্ফুট হ'য়ে উঠে।

পাণ্ডুকেশ্বরের একটু উপরের বরফ এখনও গলেনি, আর কয়েক দিন পরে জায়গায় জায়গায় গ'লে পথ দেখিয়ে দেবে ; তাতে সমস্ত পথ যে বেশ সুগম হবে তা নয়, তবে এই শ্বেতরাজ্যের মধ্যে পথের একটা মোটামুটি সন্ধান পাওয়া যাবে। মরুভূমির মধ্য দিয়ে চ'লতে শুনেছি পথভ্রান্ত হ'তে হয় ; আমি তেমন নামজাদা মরুভূমির মধ্যে কখন পড়ি নি, কিন্তু এই রকম রাজ্যের মধ্যেও পথহারা হবার সম্ভাবনা কম নয়। যে দিকে তাকান যায় শুধু সাদা, বরফ-মণ্ডিত। কোন দিক দিয়ে কোথায় পথ গেল, একে ত তা ঠিক ক'রে নেওয়াই মহাবিপদের কথা, তার উপর এমন অসংলগ্ন পথ যে পদে পদে পথ ভ্রান্তির সম্ভাবনা। অন্য কারও পথের ঠিক থাকে কি না, তা বলতে পারিনে, কিন্তু আমরা তিনটি প্রাণী ত প্রতি মুহূর্তে ভাবতে লাগলুম, এইবার বুঝি পথ হারিয়েছি। এমন কি অন্যান্য চিন্তা দূর হ'য়ে এই দুর্ভাবনাটাই বেশী হ'য়ে উঠলো।

স্বামীজি ও অচ্যুত ভায়া কথাবার্তা চালাতে লাগলেন। আমার কিন্তু সেদিকে মন ছিল না। আমি তখন ঘোর চিন্তায় অভিভূত হ'য়ে চ'লছিলুম। বরফের এই অভিনব রাজ্যে এসে আমি একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছি ; সঙ্গে সঙ্গে আমার অতীত জীবনের দুই একটি কথা মনে পড়ছিল। শৈশবের সেই কোমল হৃদয়, সরল মন, অকপট বন্ধুত্ব এবং সকলের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও ভালবাসা, সে কেমন সুন্দর কেমন মোহময় ছিল। তখন আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামখানি আমার পৃথিবী ছিল ; তার প্রত্যেক বৃক্ষপত্র উন্মুক্ত ক্ষেত্রে ভারাবনত শস্যশীর্ষ এবং দূর-প্রবাহিত বায়ুতরঙ্গের অভিশ্রান্ত গতি যেন কতই স্নেহ ঢেলে দিত। ক্রমে বড় হ'য়ে বিদেশে কলিকাতায় পড়তে গেলুম ; পবিত্রচেতা মধুর-হৃদয় কত সঙ্গী লাভ হলো ; এবং একখানি প্রেমপূর্ণ, নিতান্ত নির্ভরতাপূর্ণ হৃদয় আমার জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তার জীবনের সুখ-দুঃখ মিশিয়ে নিলে। নয়ন সমক্ষে পৃথিবীর নূতন শোভা দেখতে পেলুম, এবং তার অভিনব মাধুর্য হৃদয় পূর্ণ ক'রে দিল। তখন হৃদয়ে কত বল, মনে কত সাহস, প্রাণে কত বিশ্বাস! মনে হ'তো পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা মানুষের দুখানি হাত সুসম্পন্ন ক'রতে না পারে। জীবনের সেই পূর্ণবসন্ত কোথায়? —বসন্তের জ্যোৎস্নাধৌত রাত্রে আম্রমুকুলের সৌরভে পরিপূর্ণ একটি ক্ষুদ্র উপবন-প্রান্তে প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর কোমল মিলন, সেই অভিমান ও আদর, হাসি ও অশ্রু, সে সকল কোথায়? কার্যক্ষেত্রে বিপুল পরিশ্রম, লোকহিতে গভীর একাগ্রতা—সে এখন স্বপ্ন ব'লে মনে হয়। ইহজীবনের মধ্যেই যেন একটা বৃহৎ ব্যবধান। তারই একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আজ হা-হুতাশ ক'চ্ছি! তখন একদিনও কি কল্পনা ক'রেছি আজ যেখানে এসেছি, জীবনে একদিন এমন স্থানে আমার পদধূলি প'ড়বে? কিন্তু আজ এ অভিনব প্রদেশে, স্বর্গের শূন্য সোপানতলে পদার্পণ ক'রে আমার সুখময় শৈশব ও যৌবনের মধুর স্মৃতি দু'দণ্ডের

www.pathagar.com

জন্যে মনে প'ড়ে গেল। আমার চিরনির্বাসিত অশান্ত হৃদয় সেই কুসুমকুঞ্জ-বেষ্টিত শান্তিময় আলয়ের কথায় চঞ্চল হয়ে উঠলো; অন্যের অলক্ষিতে দু'বিন্দু অশ্রু মুছে গাছপালাবর্জিত দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে তুষারাবৃত অলকানন্দার ধারে ধারে চ'লতে লাগলুম।

পাণ্ডুকেশ্বর ছেড়ে যে সব কুটির দেখতে দেখতে এলুম, সেগুলি বুঝি আমার সুকোমল প্রভাত জীবনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। বাস্তবিক কুটিরগুলি আনন্দপূর্ণ, প্রকৃত সুখের বাসস্থান। পাহাড়িয়ারা এখানে সপরিবারে বাস করছে। সকালে কেহ কাঠ কাটছে, কেহ আঁটি বাঁধছে, কেহ রুটি তৈয়েরি ক'রতে ব্যস্ত, কেহ বা উদরের তৃপ্তিসাধনে নিবিষ্টচিত্ত। পাহাড়ী যুবতীরা কেহ গান গাচ্ছে, কেহ ছোট ছোট ছেলেমেয়ের কাছে দাঁড়িয়ে যাত্রীর দল দেখছে ; সরল, উন্নতদেহ; প্রফুল্লমুখে কোমল হাসি। যাত্রীর দল দেখে বালিকা, যুবতী এমন কি নিতান্ত শিশুর দলও "জয় বদরিবিশালা কি জয়।" ব'লে আনন্দধ্বনি ক'রছে, এবং যাত্রীদের কাছে এসে কেহ বা একটা পয়সা, কেহ বা কিছু সূচ সূতা চাচ্ছে। দেখলুম এরা অনেকেই সূচ সূতার প্রার্থী। বোধ হয় এই দুইটি জিনিসের এরা বেশী ভক্ত। সকল বালক বালিকাই হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ ; যুবতীগণের দেহ সবল ও দীর্ঘ। প্রকৃতি যেন নিজ হস্তে অতি সহজ ভাবে সমস্ত অঙ্গের পূর্ণতা সম্পাদনা ক'রেছেন। বিশেষ তাদের মধ্যে একটা জীবন্ত ভাব দেখলুম, যা আমাদের ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বঙ্গদেশের প্লীহাযকৃৎ-প্রপীড়িত অন্তঃপুরে কখনই দৃষ্টিগোচর হয় না! বোধ হ'ল এদেশে কোন রকম পীড়ার প্রবেশাধিকার নেই। এমন যে মলিন বস্ত্র ও ছিন্ন কম্বল পরিহিত ছেলে মেয়ের দল, তবু তাদের গোলাপী আভাযুক্ত সুন্দর মুখ দেখলে কোলে তুলে নিতে ইচ্ছে হয়। কতবার সতৃষ্ণ-নয়নে তাদের মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম। এখানে আর একটু তফাৎ দেখলুম ; দেশে থাকতে যখন আমরা রেলের গাড়ীতে কি নৌকাযোগে কোথাও যেতুম, প্রায়ই দেখা যেত, পথের দু'পাশে রাখাল বালকেরা পাঁচনবাড়ি তুলে আমাদের শাসাচ্ছে, কখন বা ছোট হাতের মুষ্টি তুলে, কখন কখন বিকট মুখভঙ্গি ক'রে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে ; কিন্তু এ দেশে চাষার ছেলের সে রকম কোন উপসর্গ দেখা গেল না ; ছেলেমেয়েগুলি সকলেই কেমন ধীর শান্ত। কেহই কালীঘাটের কাঙ্গালীর মত কাহাকেও জড়িয়ে ধরে না, কিম্বা গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চৌরঙ্গীর মোড় পর্যন্ত ছুটে আসে না। কেহ একটি পয়সা চাহিতেও সঙ্কোচবোধ করে ; হয় ত মুখের দিকে একটি বার চেয়ে ঘাড় নীচু ক'রলে। যদি তার মনের ভাব বুঝে তার হাতে একটি পয়সা দেও ত উত্তম, না দেও দাঁড়িয়ে থেকে চলে যাবে। আমাদের বঙ্গভূমি ভিক্ষুকের আর্তনাদে ও কাতর প্রার্থনায় পরিপূর্ণ ; তাতে দাতাদিগের কর্ণও বধির ক'রে ফেলে, সুতরাং আমাদের বঙ্গীয় দানশীলগণ যদি এদেশে আসেন ত এই সব বুভুক্ষু বালক-বালিকাদের নীরব প্রার্থনা প্রতিপদেই অনাদৃত হয়। কিন্তু যে সকল সাধু-সন্ন্যাসী এ পথে পদার্পণ করেন, তাঁদের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা নিতান্ত কম, এবং তাঁরা গরীবের কাতর প্রার্থনা শুনবার আগেই যথাসাধ্য দান করেন। অতএব দাতার দানে যেমন বিরক্তি নেই, গ্রহীতার ভিক্ষা গ্রহণেও সেইরূপ অপ্রসন্নতার সম্পূর্ণ অভাব দেখা গেল। যে নিতান্ত ভিখারী, যার পয়সার অত্যন্ত প্রয়োজন, সেও একবারের বেশী দু'বার চায় না। তবু আমার দেশে দুষ্টুমি-জ্ঞাপক বিশেষণ যোগ করতে হ'লেই লোকে বলে "পাহাড়ে মেয়ে" "পাহাড়ে শয়তান" ইত্যাদি। এই পাহাড়ের বুকের

www.pathagar.com

মধ্যে এসে, পাহাড়ের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ ক'রে পাহাড়ীর প্রতি এ রকম কোপকটাক্ষ অকারণ ব'লে মনে হ'লো।

আরও কিছু অগ্রসর হতেই দেখি যে, পাহাড়ের দেবকুটিরের চিহ্ন একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। চারিদিকে সাদা চিহ্ন ছাড়া আর কিছু দেখবার নেই; কে যেন সমস্ত প্রকৃতিকে দুগ্ধফেননিভ বস্ত্রখণ্ডে মুড়ে রেখেছে। পায়ের নীচে পুরু বরফ তেমন কঠিন নয়; তার মধ্যে কদাচিৎ দু'টো একটা জায়গায় বরফ গলাতে পাথরের কৃষ্ণ বর্ণ বেরিয়ে পড়েছে। সেইগুলি লক্ষ্য ক'রে পথ চলতে লাগলুম। ইচ্ছা তাড়াতাড়ি চলি,—কিন্তু ভয়ানক কাদার মধ্যে দিয়ে যেতে যেমন জোর পাওয়া যায় না, এক পা তুলতে আর এক পা বসে যায়, আমাদের অবস্থা তদ্রূপ; তবে তফাৎ এই যে, কাদার মধ্যে থেকে পা তুলতে ভারি ও আটালো বোধ হয়; বরফে সে রকম কোন উপসর্গ নেই। প্রথমে মনে হ'ল আমরা দইয়ের উপর দিয়ে চ'লছি; ইচ্ছে হ'ল খানিকটে তুলে গালে ফেলে দিই। কিন্তু স্বামীজির কাছে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত ক'রতেই তিনি এ রকম অশিষ্টাচারণ করার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি প্রদর্শন ক'রে "প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ" এই চাণক্য-নীতির মর্যাদা রক্ষা ক'ল্লেন, এবং পাছে বরফ খাওয়া অন্যায় ব'ল্লে এ যুক্তিতর্কের দিন তাঁর "মিত্রবদাচরেৎ"-এর প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন না করি, এই ভয়ে তিনি ব'ল্লেন "বরফ খেলে পেটের ব্যারাম হয়!" এই অদ্ভুত মত শুনে আমার হাসি এল; মনে হ'ল আজকাল আমাদের দেশে যুক্তির আধিক্যের মধ্যে বড় একটা নূতনতর জিনিস প্রবেশ ক'রেছে—সেটা হ'চ্ছে শারীরতত্ত্ব! ছেলেবেলায় শুনতুম, একাদশীতে নিরম্বু উপবাস ক'ল্লে পুণ্যসঞ্চয় হয়, এখন শুনি একাদশীতে উপবাস ক'ল্লে শরীরের রস অনেকটা শুষ্ক হয়, সুতরাং জ্বরের আর ভয় থাকে না। আগে শুনতুম, কুশাসন পবিত্র জিনিস সুতরাং কোন ধর্মকর্ম উপলক্ষে কুশাসনে বসাই যুক্তিসঙ্গত; এখন শুনতে পাই, কুশাসন অপরিচালক—তাই শরীরজ বিদ্যুতের সঙ্গে ভূমিজ বিদ্যুত একীভূত হ'য়ে শরীরের অনিষ্ট সাধন ক'রতে পারে না। এইরূপে টিকি রাখা হতে আচমন করা পর্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠানেরই এমন এক অভিনব ব্যাখ্যা বের হ'য়েছে, যাতে প্রমাণ করে, দেহরক্ষার চেয়ে আর ধর্ম নেই এবং যা কিছু আমাদের ক্রিয়াকর্ম সকলই এই দেহরক্ষার জন্যে। এতে ফল হয়েছে এই যে, যুক্তিগুলি নিতান্ত উপহাস্যাস্পদ হ'য়ে প'ড়েছে। অবশ্যই স্বামীজির প্রদর্শিত উদারাময়ের আশঙ্কা সম্বন্ধে এত কথা খাটে না; তিনি বৃদ্ধ, পরিপাকশক্তির প্রতি হয়ত তাঁর আর তেমন বিশ্বাস নেই এবং "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং" এই কথাটার উপর হয় ত অবিচল বিশ্বাস। স্বামীজি আমাকে অনেক অন্যায় কাজ ক'রতে বহুবার নিষেধ ক'রেছেন, এবং তাঁর নিষেধ সত্ত্বেও সেই সকল কাজ ক'রে দু'চারবার বেশ ফলভোগও ক'রেছি; কিন্তু বৃদ্ধের অতি সতর্কতা অনুসারে চলাটা সর্বদা আমাদের পুষিয়ে ওঠে না। অতএব স্বামীজির নিষেধ-বাক্যে মনোযোগ না দিয়ে দুই এক তাল বরফ তুলে গালে ফেলে দিলুম; দুর্ভাগ্যবশতঃ তৃপ্তিলাভ করতে পাল্লুম না। সেই বাল্যকালে যখন কলিকাতায় পড়তুম, তখন বৈশাখের নিদারুণ গ্রীষ্মে গলদঘর্ম হ'য়ে কখন কখন দুই এক পয়সার বরফ কিনে প্রবল পিপাসার নিবৃত্তি করা যেত। পিপাসা এখনও তেমনই প্রবল আছে, কিন্তু বরফে ত আর তৃপ্তি বোধ হয় না।

এই রকম ভাবে চার পাঁচমাইল চলার পর আমরা "হনুমান চটি"তে উপস্থিত হ'লুম।

www.pathagar.com

এর নাম কেন যে 'হনুমান চটি' হ'লো তা ব'লতে পারিনে। দোকানদার আজ মোটে চার পাঁচ দিন হ'ল এসে এখানে দোকান খুলেছে ; তার আগে এ চটি বরফে ঢাকা ছিল। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করায়, সেও এই নামের রহস্য ভেদ করতে পাল্লে না, কিন্তু সে যে জবাব দিলে তাতে হাসি এল। ব'ল্লে সে ছেলেমানুষ (বয়স চল্লিশের কাছাকাছি!) তার এ সকল শাস্ত্রকথা জানবার বা বুঝবার সময় হয় নি ; বয়োবৃদ্ধ সাধুদের জিজ্ঞাসা ক'ল্লে ঠিক উত্তর মিলতে পারে। এই চটি পর্ণকুটির নয়। এই দারুণ বরফের রাজ্যে পাতার কুটিরে বাস রক্তমাংসধারীদের পক্ষে অসম্ভব এবং সে রকম সম্ভাবনা উপস্থিত হ'লে প্রাণ নামক পদার্থটি দেহকে আগেই জবাব দিয়ে ব'সে থাকে।

চটিতে ছোট পাথরের ঘর, তার একটা বারান্দা বের করা ; আর তার পাশেই সম্মুখ দিক খোলা আর একটি ছোট ঘর। শুনলুম, এ ঘর চটিওয়ালার নয়, সে এক দেবতার ঘর। দু'চার দিনের মধ্যেই দেবতাটি নিম্নদেশ হ'তে এখানে এসে তাঁর সিংহাসন দখল ক'রে ব'সবেন এবং পুণ্যপ্রয়াসী যাত্রীদের আর একদফা খরচ বাড়বে। এই চটিতে বেশী ঘর না থাকার কারণ জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম যে, এখানে কোন যাত্রীই থাকতে চায় না। বদরিকাশ্রম এখান থেকে মোটে চার মাইল। বদরিনারায়ণের এত নিকটে এসে কে আরাম বিরাম বা আহারাদি ক'রবে? আর নারায়ণ দর্শনার্থীর মধ্যেই বা কে সাত সমুদ্র তের নদী পার হ'য়ে এসে এই চার মাইলের জন্যে এখানে ব'সে থাকবে? তীর্থযাত্রীদের মধ্যে এমন প্রায়ই দেখা যায় না, যারা মন্দিরের দ্বারে এসে দেবতার শ্রীমুখপঙ্কজ না দেখে সিঁড়ির উপর ব'সে অপেক্ষা করে। সুতরাং এখানে বেশী দোকান থাকার বিশেষ কোন দরকার নেই ; একখানা দোকান, তাই ভাল রকম চলে না। আর এই জন্যেই দোকানী তার দোকনে চাল ডাল বড় একটা রাখে না, কিছু পেড়া (সন্দেশ) বা পুরী সর্বদা প্রস্তুত রাখে এবং দরকার হ'লে প্রস্তুত ক'রে দিতে পারে। যাত্রীরা প্রায়ই এখানে ছোলাভাজা পুরী ইত্যাদি জলখাবার কিনে নেয়। আমরাই বা এ সুযোগ ছাড়ি কেন? এই দোকানে টাটকা ভাজা পুরীর সুগোল পরিধি দর্শনে বৈদান্তিক ভায়া বিশেষ লোলুপ হ'য়ে উঠলেন। স্বামীজি ব'ললেন, "অচ্যুত, আজ আমাদের মহা আনন্দের দিন ; এমন দিন মানুষের ভাগ্যে বড় কম ঘটে, আর অল্পক্ষণ পরেই আমাদের জীবন সার্থক হবে। আজ মনের আনন্দে এখানে আহারাদির আয়োজন কর।" অচ্যুত ভায়াকে এ কথা বলাই বাহুল্য ; একে নিজের ষোল আনা ইচ্ছা, তার উপর স্বামীজির অনুমতি—ভায়া উৎসাহে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। সে দিনের সেই উৎসাহ দেখে মনে হ'য়েছিল, ভায়া যদি ধর্মকর্মে সর্বদা এমন উৎসাহ প্রকাশ ক'রতেন, তা হ'লে যতদিন তিনি দণ্ড ছেড়েছেন, তাতে এতদিন কৃষ্ণ বিষ্ণুর মধ্যে একজন হ'তে পারতেন!

দীর্ঘকাল অনাহারে থাকায় এবং পথপর্যটনে ক্ষুধা অসম্ভব রকম বৃদ্ধি হ'য়েছিল। যথাবিহিত ক্ষুধাশান্তি ক'রে এবং এক ঘণ্টার জায়গায় তিন ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করার পর বদরিনারায়ণের পথে শেষ আড্ডা ত্যাগ কল্লুম।

একটু অগ্রসর হ'য়েই সম্মুখে একটা প্রশস্ত দুরারোহ পাহাড় দেখলুম। আগাগোড়া কঠিন বরফরাশিতে আবৃত ; যেন বিভূতিভূষিত যোগিশ্রেষ্ঠ ; সরল, উন্নত, শুভ্রদেহ, ধৈর্য ও গাম্ভীর্যের যেন অখণ্ড আদর্শ। মস্তক আকাশ স্পর্শ ক'রছে, মধ্যাহ্নসূর্যের কিরণ তাতে প্রতিফলিত হ'য়ে কিরীটের ন্যায় শোভা পাচ্ছে। নিম্নে স্তূপে স্তূপে বরফ সঞ্চিত হ'য়ে

www.pathagar.com

পাদদেশ আবৃত ক'রেছে। আমরা যেন বিস্ময় ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দেবার জন্যই তাঁর পদতলে এসে দাঁড়ালুম।

কিন্তু আমাদের এই বিস্ময় ও ভক্তি শীঘ্রই ভয়ে পরিণত হ'লো ; শুনলুম, এই উন্নত পাহাড়ের পরপ্রান্তে বদরিকাশ্রম। এই পাহাড় উল্লঙ্ঘন না ক'ল্লে আমাদের সেই পুণ্যাশ্রম দেখবার অধিকার নেই ; কিন্তু এ পাহাড় অতিক্রম করা বড় সহজ কথা নয়। যাত্রার আরম্ভে সন্ন্যাস-গ্রহণের প্রথম উদ্যমেই যদি এমন একটা বিশাল পর্বত আমার অভীষ্ট সাধনের পথ আটকে এই রকমভাবে দাঁড়াতো, তবে এই সন্ন্যাসব্রত—কঠোরতাই যার সাধনার অঙ্গ—তা গ্রহণ ক'রতে সাহস ক'রতুম কি না সন্দেহ।

একে ত ক্রমাগত সোজা উপরের দিকে উঠা, প্রতিপদে পা ভেঙে এবং নিশ্বাস আটকে আসে, তার উপর পায়ের নীচে বরফের স্তূপ। যেখানে বরফ একটু গ'লছে, সেখানে যেন বালিরাশির উপর দিয়ে যাচ্ছি। প্রতি পদক্ষেপেই পা ডুবে যাচ্ছে। আবার যেখানে জমাট কঠিন বরফ, সেখানে ভয়ানক পিছল, একটু অসাবধান হ'য়ে পা ফেল্লেই আর কি মুহূর্তের মধ্যে ইহজীবনটা ডিঙিয়ে পরলোকের দ্বারে উপস্থিত হওয়া যায়।

চ'লতে চ'লতে পায়ের যাতনা ক্রমে অনেকটা কমে এল দেখলুম। আস্তে আস্তে পা দুখানি অসাড় হ'য়ে পড়লো ; তখন সেই তুষারশীতল স্পর্শ আর কাতর করতে পারলে না। বেশ বেগের সঙ্গেই চ'লতে লাগলুম। সময়ে সময়ে খানিকটা বরফ তুলে নিয়ে গোলাকার ক'রে দূরে ছুঁড়ে ফেলি ; দেখতে দেখতে তা ধুলোর মত গুঁড়ো হ'য়ে যায়।

পা অবশ হ'য়ে ক্রমে ক্রমে ভারি হ'য়ে এল, তবু প্রাণপণ শক্তিতে এ পথটুকু চ'লতে লাগলুম। খানিক পরে পাহাড়ের মাথায় গিয়ে পৌঁছুলুম। বেলা তখন শেষ হ'য়ে এসেছে।

এখানে এসে চেয়ে দেখলুম অপর পাশে খানিকটে নীচে কিছুদূর বিস্তৃত একটা সমতল ক্ষেত্র। দুই পাশে দুটি অভ্রভেদী পাহাড় ধনুকের মত সেই সমতলভূমিকে কোলে নিয়ে রয়েছে। অলকানন্দা দূরে দূরে আঁকাবাঁকা দেহে অতি ধীরগতিতে চ'লে যাচ্ছে। কোথাও সামান্য স্রোত দেখা যাচ্ছে ; অনেক স্থানেই জল দেখবার যো নেই। পাতলা বরফগুলি ধীরে ধীরে ভেসে যাচ্ছে, তাই দেখে স্রোতের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। কোথাও বা স্রোতের সম্পর্ক মাত্র নেই, আগাগোড়া জমে গিয়েছে, কেবল নদীগর্ভের নিম্নতায় নদীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যাচ্ছে। সেই দুগ্ধফেননিভ বহুদূরবিস্তৃত তুষাররাশির উপর অস্তোন্মুখ তপনের লাল রশ্মি প্রতিফলিত হ'য়ে এমন বিচিত্র শোভা হ'য়েছিল যে, বোধ হ'লো সে যেন পৃথিবীর শোভা নয়, সে দৃশ্য অলৌকিক। আমি মনে মনে কল্পনা করলুম, শান্তিহারা অধীর হৃদয়ে ঘুরতে ঘুরতে আজ বুঝি বিধাতার আশীর্বাদে দুঃখকোলাহলময় পৃথিবীর অনেক ঊর্ধ্বে বরণীয় স্বর্গরাজ্যের দ্বারে উপনীত হয়েছি। ঐ তুষারমণ্ডিত সন্ধ্যারাগরঞ্জিত অলকানন্দার শোভাময় উপকূল, আমার কাছে সুরনদী মন্দাকিনীর প্রবালে বাঁধানো সুরম্য তীর বলে বোধ হ'য়েছিল। চারিদিকে কেমন শান্তি, কত পবিত্রতা। দুঃখ, কষ্ট, পথশ্রম সমস্ত ভুলে গেলুম। এই অসীম যন্ত্রণাময় দগ্ধজীবনের গুরুভারও যেন লঘু হয়ে গেল। অদূরে রামায়ণের তুষারমণ্ডিত মন্দির। সমতলভূমির উপর আর একটি ছোট মন্দির ও কতকগুলি ছোট ছোট পাথরের ঘর। নদীর ধারে

www.pathagar.com

যেমন বালির ঘর বেঁধে মেয়েরা খেলা করে ; এবং খেলা সাঙ্গ ক'রে তারা বাড়ি চ'লে গেলে ঘরগুলি সেই নির্জন নদীতীরে পড়ে থাকে, অলকানন্দার তীরে এই শুভ্র সমতল প্রদেশে এই ছোট ঘর ও মন্দির দেখে আমার মনে হ'লো বুঝি দেববালারা এসে খেলাচ্ছলে এগুলি তৈয়েরি ক'রে ছিল, বেলা অবসান হওয়ায় খেলা সাঙ্গ ক'রে তারা বাড়ি ফিরে গিয়েছে।

কিন্তু পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্ন পদ্য মেলা দুরূহ। তুমি সন্ধ্যাবেলায় আফিস থেকে ফিরে তোমার গৃহপ্রান্তস্থ ফুলবনে ব'সে আকাশের দিকে চেয়ে পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধ শ্বেত হাসি দেখছ, আর তোমার হৃদয়ে শত শত মধুর কল্পনার তুফান উঠছে, এমন সময় হয়ত তোমার উদরের নীচ ক্ষুধাবৃত্তি তোমাকে স্বর্গ হ'তে ডেকে বল্লে "সেই ন'টার সময় চাট্টি নাকে মুখে গুঁজে আফিসে যাওয়া হয়েছিল, এখন আর একবার উদর-দেবতাকে সন্তুষ্ট কল্লে হয় না?" এবং হয় ত তোমার গৃহিণী হাস্যমুখে এসে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন, "চাঁদের আলোতে আর পেট ভরে না, এখন রাত্রে কি খাবে তাই বল, ভাত না রুটি?"—অমনি সোনার চাঁদ, বসন্তের বাতাস, ফুলের গন্ধ দূর হয়ে গেল। সেই সন্ধ্যার প্রাক্কালে এই রমণীয় স্থানে দাঁড়িয়ে যখন প্রতি মুহূর্তে করুণারূপিণী সরল-হৃদয়া দেববালাগণের আগমন প্রত্যাশা ক'রছি সেই সময়ে দেখলুম, মোটা ভুঁড়ি-বের-করা টিকিওয়ালা পাণ্ডার দল দ্রুতপদে এসে আমাদের আক্রমণ ক'ল্লে। মন্দাকিনী-তীরে দাঁড়িয়ে আছি কল্পনা না ক'রে যদি কল্পনা করতুম কৈলাসশিখরে উপস্থিত হওয়া গেছে, তা হ'লে এই অনাকাঙ্ক্ষিত পাণ্ডাগণকে কৈলাসনাথের অনুচর ব'লে ভ্রম না হওয়ার অতি অল্পই সম্ভাবনা ছিল।

পাণ্ডাঠাকুরেরা এসে আমার সঙ্গী খাঁটি সন্ন্যাসী দু'জনকে বাদ দিয়ে আমাকে পাকড়াও ক'ল্লে "হামলোক শুনা কি এই শেঠজি ছদ্মবেশ লেকে আয়া" ব'লে দুতিনজন ভারি সোরগোল ক'রে সেই পবিত্র স্থানের নিস্তব্ধতা ভেঙে দিলে এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে "ঐ নারায়ণজীর মন্দির" "ঐ ধ্বজা" "ঐ অলকানন্দা" প্রভৃতি দেখিয়ে আমার পাণ্ডাত্ব গ্রহণের আয়োজন করতে লাগলো। বলা বাহুল্য আমাকে তারা চিনিয়ে না দিলেও ঐ সকল জিনিসের পরিচয় অবগত হতে আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হ'তো না। পাণ্ডাদের উৎপাতে আমাকে ব্যতিব্যস্ত দেখে অচ্যুতভায়া হাসতে লাগলেন, অর্থাৎ কিনা তারা ঠিক লোককেই পাকড়াও ক'রেছে। আমার ভয় হ'তে লাগলো, কালীঘাটের পাণ্ডাদের হাতে স্বর্ণলতার নীলকমলের যেমন দূরবস্থা হ'য়েছিল, আমারও বা পাছে সেই রকম হয়।

যাহোক, আমার মত লোটা-কম্বলধারী অর্ধগৃহী ও অর্ধ সন্ন্যাসীকে একজন বড়দরের শেঠজি বলে অনুমান করাতে তাদের বিচার বিবেচনাশক্তিকে তারিফ করতে হয়। উপক্রমণিকাতেই পাণ্ডাদের এই রকম অত্যাচার দেখে আমার বড়ই ভয় হলো, না জানি পুরপ্রবেশ কল্লে আরো কি ঘটবে। কিন্তু সে চিন্তা ক'রে কোন ফল নেই ভেবে, পাণ্ডাদের অনেক আশা ভরসা দিয়ে তাদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে অগ্রসর হলুম, তারাও বদরিনারায়ণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নানারকম দুর্বোধ্য শ্লোক আউড়ে যেতে লাগলো ; তার এক লাইনও যদি আমি বুঝতে পেরে থাকি। কিন্তু তাতে তাদের ক্ষতি কি, তারা খুব উৎসাহের সঙ্গেই কলরব করতে করতে যেতে লাগলো। এদের মধ্যে একজন পাণ্ডা ভারি চালাক, সে আমার নির্জলা তোষামোদ আরম্ভ কল্লে, বল্লে, "আরে শেঠজি! আপকো বদন দেখকে মালুম হুয়া আপ বহুত বড়া আদমী, এইসা আদমী নারায়ণ দর্শন করনেকো

www.pathagar.com

ওয়াস্তে কভি নেহি আয়া।" আর একজন গল্প জুড়ে দিল, সে গল্পের কতখানি সত্য এবং কতটা তার কল্পনাপ্রসূত, তা অবশ্য আমি ঠিক করে উঠতে পারি নি,—আর সে জন্যে আমার কিছু আগ্রহও ছিল না। কিন্তু সে যা বল্লে তার মোদ্দাটা এখানে একটু লেখা যেতে পারে। সে বল্লে, কয়েক বছর আগে এখানে এক যুবক সাধুর শুভাগমন হয়েছিল। তার আকার প্রকার এবং অবয়বাদি সমস্ত অবিকল আমারই মত কেবল সে ব্যক্তি আমার চেয়ে কিছু লম্বা ও গৌরবর্ণ, আমার চেয়ে কিছু মোটা এবং দাড়িগোঁফ খানিক বড়, বয়সও আমার চেয়ে কিছু কম বা বেশী হতে পারে ; সুতরাং বলা বাহুল্য আমার সঙ্গে সেই গল্পোক্ত ভদ্রলোকের সবই মিলে গেল! আমারই মতন তাঁর গায়ে একখানা কম্বল ছিল তবে সেখানি মূল্যবান বিলিতী কম্বল। কত লোক কত সময় কত ভাবে এখানে আসে, কে তার হিসাব রাখে? তবে যারা জাঁকজমকে অনেক লোকজন সঙ্গে নিয়ে আসে, তাদেরই কাছে লোকের কিছু গতিবিধি হয়। উপরিউক্ত লোকটির সঙ্গে কোন লোকজন ছিল না ; সুতরাং তার দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি ; বিশেষ সে লোকটি এসে কোন দোকানে কি পাণ্ডার ঘরে আশ্রয় নেয় নি। নারায়ণের মন্দিরের বাইরে একটা খোলা জায়গায় ব'সে থাকতো ; কদাচ এক-আধবার কোথাও উঠে যেত। তাকে এই রকম নিতান্ত অনাথের ন্যায় দীনবেশে অন্যের অনাহূতভাবে প'ড়ে থাকতে দেখে মোহান্ত মহাশয়ের তার প্রতি দয়া হ'লো। তিনি তাকে ডেকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু সে কোন কথার ভাল একটা জবাব দিলে না, সাধু-সন্ন্যাসীরা যেমন সকল অনুসন্ধান উড়িয়ে দিতে চান এও সেই রকম ভাব দেখালে। যাহোক সঙ্গে খাবার সংস্থান নেই অথচ বদরিনারায়ণে এসে একজন সাধু অনাহারে মারা পড়বে, ইহা অনুচিত মনে ক'রে, মোহান্ত মহাশয় দু'বেলা তাঁকে ঠাকুরদের প্রসাদ খেতে দিতেন। সে কোন দিন প্রসাদ খেতো, কোন দিন স্পর্শও করতো না, যেমন প্রসাদ তেমনি প'ড়ে থাকতো। লোকটির আর একটু বিশেষত্ব ছিল—দিবসের অধিকাংশ সময়ই কম্বল মুড়ি দিয়ে প'ড়ে থাকত, নীরবে প'ড়ে থাকতেই ভালবাসত ; এবং কেহ আলাপ করতে গেলে বরং একটু বিরক্তিই প্রকাশ করতো।

এই ভাবে দশ পনের দিন যায়। নারায়ণদর্শন ক'রে সকল যাত্রী ফিরে যায়, তারা সকলেই কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার সেই সুন্দর যুবক সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে চলে যায়। কেহ বা তার সেখানে ব'সে থাকবার কারণ জিজ্ঞাসা করে— কিন্তু কোন সদুত্তর পায় না। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা পেয়াদা, সিপাহী, চাকরবাকর সঙ্গে খুব জমকালো পোশাকআঁটা, অস্ত্র-শস্ত্র-সজ্জিত চার পাঁচজন শেঠ এসে বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হ'লো। তারা এখানে কা'কেও কিছু না ব'লে, চারিদিকে কার যেন অনুসন্ধান ক'রে ফিরতে লাগলো। শেঠদিগের এই ব্যবহারে নারায়ণের পাণ্ডারা কিঞ্চিৎ ভীত ও বিস্মিত হয়ে পড়লো, এবং ব্যাপার কি জানবার জন্যে তাদের পিছে যাত্রীর ভিড় জমে গেল। যাহোক তারা খুঁজতে খুঁজতে মন্দিরদ্বারে এসে দেখে, একজন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। এ ব্যক্তি আর কেহ নয়, পূর্বকথিত সন্ন্যাসী! কম্বল মুড়ি দিয়ে থাকে দেখে একজন "কোন হ্যায় রে!" বলে সজোরে তাকে ধাক্কা মারলে। ধাক্কা খেয়ে সন্ন্যাসী মুখাবরণ উন্মুক্ত করে উঠে বসতেই সেই জামাজোড়া-পরিহিত লোকগুলি তাঁর সম্মুখে নতজানু হয়ে ব'সে পড়লো, ও বল্লে, "কসুর মাপ কিজিয়ে, মহারাজ, আপ হিঁয়া, হামলোক তামাম দেশ

www.pathagar.com

ঢুড়কে হিঁয়া আয়া।" যে সকল পাণ্ডা এই ব্যাপার দেখছিল, তারা একেবারে অবাক! তাদের অপরাধ কি? সে বেচারীদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এমন একটি সন্ন্যাসী-মহারাজ কখন দৃষ্ট হয় নি। পৌরাণিক গল্পে বা উপন্যাসে কখন কখন এরকম লোকের কথা শুনেছে বটে ; কিন্তু এই কলিযুগের শ্রেষ্ঠভাগে যে এমন ঘটনা ঘটতে পারে, তা তারা কি রকম ক'রে বিশ্বাস ক'রবে? এদিকে মহারাজের ছদ্মবেশ যখন প্রকাশিত হয়ে পড়লো, তখন "চুপ চুপ, গোল মৎ করো" রবে চারিদিকে গোল বেড়ে গেল, সুতরাং মহারাজ আর আত্মগোপন করতে পাল্লেন না। শেষে অনেক দান-ধ্যান হলো, ব্রাহ্মণ লোকেরাও বহুত জিনিস লাভ কল্লে, অবশেষে মহারাজা স্বস্থানে প্রস্থান করেন। পাণ্ডাজীর গল্প শেষ হ'তে না হ'তে আর একজন পাণ্ডা আর এক গল্প আরম্ভ কল্লে ; তার গল্পটাও এই রকমই, তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, এতে যেমন মহারাজের অমাত্যগণ এসে তাঁকে নিয়ে চল্লেন, তাতে সে রকম কেহ আসেনি, মহারাণী স্বয়ং এসেছিলেন ; কিন্তু তিনি মহারাজের মৃতদেহ ভিন্ন তাঁকে জীবিত দেখতে পান নি, সুতরাং এখানে শ্রাদ্ধ দানধ্যানাদি সমাপ্ত ক'রে, হরকোপানলে মদনভস্ম হলে রতি যেমন শূন্য প্রাণে পতির মৃতদেহ ত্যাগ ক'রে বিলাপ করতে করতে সুরপুরে ফিরে গিয়েছিলেন, রাণী তেমনি স্বরাজ্যে ফিরে গেলেন। পাণ্ডা ও ব্রাহ্মণেরা যে এই রকম ক'রে মধ্যে মধ্যে চোর্বচুষ্য আহার ও প্রচুর দক্ষিণা লাভ করে, তারা তা আমাকে জানাতে ত্রুটি কল্লে না। আমি ত তাদের কথায় এই বুঝলুম যে, "তুমি একজন ছদ্মবেশী মহারাজা, আমরা নারায়ণের কৃপাবলে তোমায় চিনেছি, আর গোপন করতে পারবে না, এখন আমাদের কি দেবে তা দেও।"

আমি কিন্তু এদের অতিস্তুতিবাদে ভারি বিপন্ন হয়ে পড়েছিলুম। আমার সেই অপরিচ্ছন্ন ঝাঁকড়া চুল, ছিন্নবস্ত্র ও জীর্ণ কম্বলের মধ্যে হতে তারা কিরূপে যে রাজা-রাজড়ার গন্ধ আবিষ্কার কল্লে, তা আমি অনুমান করতে পাল্লুম না। তার চেয়ে বরং স্বামীজির তেজোময় শরীর, আভূমিচুম্বিত দাড়ি, গৈরিক বসন, গৈরিক আলখাল্লা এবং গৈরিক থানের প্রকাণ্ড পাগড়ীতে আবৃত মস্তক দেখলে তার মধ্যে একটা মহারাজ সংগুপ্ত আছে, এমন বিবেচনা করা নিতান্ত অসঙ্গত হতো না। যাহোক ক্রমে যখন আমরা বদরিকাশ্রমের অত্যন্ত কাছে এলুম, তখন ধীরে ধীরে পাণ্ডার দল পুষ্ট হ'তে লাগলো এবং তারা নিজেদের বাহাদুরী দেখিয়ে আমাকে কাড়াকাড়ি করবার উপক্রম কল্লে। ক্রমে তাদের মধ্যে মুখোমুখী ছেড়ে শেষে হাতাহাতি হয় দেখে আমার ভারি ভয় হলো। আমি তখন উপায়ান্তর না দেখে আমার মুষ্টিযোগ ত্যাগ কল্লুম ; বল্লুম আমার পাণ্ডা লছমীনারায়ণ। জানতুম লছমীনারায়ণ বয়সে প্রায় সকল পাণ্ডা অপেক্ষা ছোট হলেও সম্মানে, অর্থগৌরবে অন্য সকল পাণ্ডাকে ছাড়িয়ে উঠেছিল। লছমীনারায়ণ এই মহাধর্মাশ্রমের আখড়াধারী, এ সাগরে সেই কর্ণধার ; সুতরাং তার নাম বলবামাত্র অন্যান্য পাণ্ডাদের উৎসাহ একেবারে নিবে গেল। তখন তারা অন্য উপায় না দেখে, 'ব্রাহ্মণ, আশীর্বাদ ক'রবে, তাতে মঙ্গল হবে', ইত্যাকার ধূয়া ধরে কিঞ্চিৎ আদায়ের চেষ্টা দেখতে লাগলো। নিরাশ করা বড় ভাল দেখায় না মনে ক'রে মিষ্টবাক্যে তাদের কিঞ্চিৎ আশা দিয়ে পুরী প্রবেশ ক'ল্লুম।

www.pathagar.com

বদরিনাথ

২৯শে মে, শুক্রবার।—কাঠের একটা সাঁকো দিয়ে অলকানন্দা পার হ'য়ে ধীরে ধীরে বদরিনাথে প্রবেশ কল্লুম। আঘাতের পর প্রতিঘাত স্বাভাবিক নিয়ম। বদরিনাথের পথে যখন চলছিলুম, তখনকার সেই উৎসাহ, আগ্রহ, মনের ভয়ানক আবেগ, অভীষ্ট স্থানে এসে সে সমস্তই যেন সংযত হ'য়ে গেল। এই রকমই হ'য়ে থাকে।

পথে যখন অবিশ্রান্ত সংগ্রাম ক'রতে হ'য়েছে, তখন মনে হয়েছিল এই নিদারুণ যুদ্ধের অবসানে এমন একটা কর্মশীলতার মধ্যে গিয়ে পড়বো, যেখানে পূজার্চনার অবিরাম কলরবে মানব-হৃদয়ের সুখদুঃখ ও হর্ষের বিপুল উচ্ছ্বাসে এক সুগভীর কল্লোল উত্থিত হ'চ্ছে। নদীর জলপ্রবাহ সমুদ্রের ফেনিল ঊর্মিরাশির নির্বোধ নৃত্যের মধ্যে মিশে যেমন হারিয়ে যায়, সেইরূপ হিন্দুর মহাতীর্থে, নারায়ণের পুণ্য পীঠতলে, দেবমহিমার এক অনন্ত প্রশান্তির মধ্যে, আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের ব্যাকুল-বাসনা ও অশান্ত উদ্বেগও সমাহিত হবে। কিন্তু এখানে পৌঁছে কেমন নিরাশ হ'য়ে প'ড়লুম।

বদরিনাথে প্রথম প্রবেশ ক'রেই চারিদিকে একটা নিরুদ্যম, একটা উদাসীন ভাব চোখের সম্মুখে পড়লো। মনে হ'লো এ উদাসীনতা বুঝি হিন্দুধর্মের মর্মে মর্মে বিজড়িত। তীর্থযাত্রীদের উদ্যম উৎসাহে কি হবে, একটা অলস কর্মহীনতা তীর্থস্থানে যেন চিরস্থায়ী রকমের আড্ডা বেঁধেছে। অলকানন্দা অতি নিরুদ্বেগে মন্থর গমনে বরফরাশির নীচে দিয়ে চ'লে যাচ্ছে ; শহরের অধিকাংশ ঘর বাড়ি এখন পর্যন্তও বরফের তলায় প'ড়ে আছে। যে কয়খানা ঘর দেখা যাচ্ছে, তাদের অবস্থাও অতি শোচনীয় ; তাহা কতক বরফের প্রসাদাৎ, আর কতক আমাদের পূর্বাগত সন্ন্যাসী মহাশয়দের কৃপায়, আর কতকগুলি ঘর এই তিন বৎসর কাল ধ'রে বন্ধ থাকা বশতঃ নষ্ট হ'য়ে গেছে ; বিশেষ সন্ন্যাসী মহাশয়েরাই ক্ষতি করেছেন কিছু বেশী। ঘরের দরজা জানালাগুলি বেবাক অন্তর্হিত হ'য়েছে। অবশ্য সেগুলো যে সশরীরে স্বর্গে গিয়েছে, তা নয় ; যে সকল সন্ন্যাসী সর্বপ্রথমে এখানে এসেছিলেন, তাঁরা দেখেছিলেন তখনও হাটবাজার বসেনি সুতরাং জ্বালানি কাঠ পাওয়া অসম্ভব ; তাই আপনাদিগকে শীতের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য এই সমস্ত জানালা দরজা ব্রহ্মাকে উপহার দিয়েছেন, এবং তীর্থস্থানে এসে পরের জিনিসপত্র নাশ ক'রে "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" এই মহানীতি-বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার জন্যে তাঁদের মহৎ হৃদয় যে কিরূপ ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিল—এই সমস্ত জানালা দরজার অভাব তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্তু পরে যে সকল যাত্রী আসবে, তারা এই বরফ-রাজ্যে এসে এদের অভাবে যে কত কষ্ট পাবে এ কথা চিন্তা করবার বোধ করি তাঁদের অবসর হয় নি।

পুরপ্রবেশ করার পূর্বে যে সকল পাণ্ডা আমাকে পেয়ে ব'সেছিল, তাদের থেকে যে রকম ক'রে অব্যাহতি পেলুম, সে কথা পূর্বেই লিখেছি। বদরিনারায়ণে এসে কোথায় উঠবো তা লছমীনারায়ণ আমাদের দেবপ্রয়াগেই ব'লে দিয়েছিল। তাঁর শ্রীহস্ত লিখিত সেই ঠিকানা এখনও আমার ডাইরী বইয়ে আছে ; তা এই—"কূর্মধারাকি উপর মোকাম, লছমীনারায়ণ পাণ্ডা, বেণীপ্রসাদ রামনাথকী চাচী।"—প্রথম কথাগুলোর অর্থ বুঝেছিলুম যে, কূর্মধারার উপরে লছমীনারায়ণ পাণ্ডার বাড়ি, আর সেখানে বেনীপ্রসাদ আছেন, তা

www.pathagar.com

সে বেণীপ্রসাদ মানুষই হোন আর লছমীনারায়ণের গৃহবিগ্রহই হোন। কিন্তু শেষের দিকটার অর্থ নিতান্ত হেঁয়ালীর মত বোধ হওয়াতে সে অর্থ নিষ্কাশনে অসমর্থ হ'য়ে তখনই লছমীনারায়ণকে সে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম ; কিন্তু কি কারণে জানিনে, উক্ত পাণ্ডাশ্রেষ্ঠ ঐ কথা কয়টির অর্থ সম্বন্ধে আমাকে সজ্ঞান করানো আবশ্যকতা মোটেই অনুভব করে নি। আমার কৌতূহল প্রবৃত্তির আগ্রহাতিশয্য দেখে উপরন্তু ব'লেছিল, "বস্ উয়ো বাৎ বোলনেসেই ডেরা মালুম হোগা"—সুতরাং কথাটা আর মোটেই বোঝা হয় নি। কিন্তু এখনও মনে পড়ে সে দিন সমস্ত অপরাহ্নটা এই কথার অর্থনির্ণয়ের জন্যে বৈদান্তিক ভায়ার সঙ্গে কিরূপ অনর্থক বাক্যব্যয় ক'রতে হ'য়েছিল। বৈদান্তিক শুধু তার্কিক নন, একজন সুরসিক ও ভারি সমজদার লোক ; তাই তাঁর প্রথমেই সন্দেহ হ'লো এই বেণীপ্রসাদ লোকটা লছমীনারায়ণের হয় শ্যালক, না হয় ভগিনীপতি। সম্বন্ধটা কিছু মধুররসাত্মক ব'লেই পাণ্ডার পো আমাদের কাছে তার মর্মভেদ করা বাহুল্য জ্ঞান ক'রেছিল। যা হ'ক বৈদান্তিক শুধু এই অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে ক্ষান্ত হলেন না, এবং আমিও এই অনুমানের বিরুদ্ধে কিঞ্চিৎ প্রতিবাদ ক'রেছিলুম, সুতরাং তিনি কথাটার ধাতু ও শব্দগত অর্থ বের করবার জন্য প্রস্তুত হ'লেন। গভীর গবেষণা ও প্রচুর চিন্তার পর শেষে তিনি এই স্থির ক'ল্লেন যে, সেখানে বেণীপ্রসাদ আছে এবং রামনাথের খুড়ী আছেন, কেন না "চাচী" শব্দের অর্থ খুড়ী ছাড়া আর কিছু হ'তেই পারে না ; কাজেই "রামনাথকী চাচী" এক সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি। তবে স্ত্রীলোকের নাম ধরে আড্ডা খুঁজতে হবে, এই যা মনের মধ্যে একটা খটকা লেগে রইল। বৈদান্তিক ব'লে বসলেন, জায়গায় জায়গায় অমনতর দুই একটা স্ত্রীলোক থাকে, পুরুষের চেয়ে তাদের খ্যাতি অনেক জেয়াদা। বলা বাহুল্য স্বয়ং লছমীনারায়ণ আমাদের সঙ্গে আসতে পারে নি, কারণ সে আরও কয়দিন দেবপ্রয়াগে না থাকলে অনেক নূতন যাত্রী তার বেদখল হ'য়ে যাবে, তার এই ভয় ছিল ; তবে সে আমাদের ভরসা দিয়েছিল যে শীঘ্রই সে আমাদের সঙ্গে এসে মিশবে। যা হোক বদরিনাথে এসে সেই "রামনাথকী চাচীর" অনুসন্ধানে বেশী নিগ্রহ ভোগ করতে হয় নি ; সকল পাণ্ডাই তীর্থের কাকের মত রাস্তায় ব'সে থাকে ; যখন তারা শুনলো যে আমরা লছমীনারায়ণের লোক, তখন তাদের মধ্যে একজন এসে নিজেকে বেণীপ্রসাদ ব'লে পরিচয় দিলে। বেণীপ্রসাদের আকার প্রকার কি রকম তা আমরা কেউই জানতুম না, সুতরাং কলিকাতা, কালীঘাট, কি ঐ প্রকার কোন স্থানে হ'লে স্বতঃই সন্দেহ হ'তো যে, হয়ত বা একটা জাল বেণীপ্রসাদ এসে আমাদের স্কন্ধে ভর ক'রেছে এবং গোলযোগের মধ্যে যখন আসল বেণীপ্রসাদটা বেরিয়ে প'ড়বে তখন আমাদের এক বিষম মুস্কিলে প'ড়তে হবে। কিন্তু বদরিনাথের মত স্থানের এখনও ততটা অধঃপতন হয় নি! সুতরাং ঐ লোকটা বেণীপ্রসাদ ব'লে পরিচয় দেবামাত্র আমরা অসঙ্কোচে তার সঙ্গে চ'লতে লাগলুম।

কিন্তু বেণীপ্রসাদ বেচারীও আমাদের নিয়ে মহা বিপদে প'ড়লো। তাদের ঘরবাড়ি এখনও বরফে ঢাকা, আরও পনের ষোল দিন না গেলে তারা বরফস্তূপের মধ্যে হ'তে প্রকাশ হ'চ্ছে না। বেণীপ্রসাদ নিজে অন্য লোকের একটা কুটির দখল ক'রে বাস ক'চ্ছে ; সুতরাং এ রকম অবস্থায় সে আমাদের কোথায় রাখে, এই ভাবনাতে অস্থির হ'য়ে প'ড়লো। যা হোক, শেষে সে পাহাড়ের উপর আর একজনের একটা ঘরে আমাদের

www.pathagar.com

আড্ডা স্থির ক'রে দিলে। এই ঘর যার সে তখনও এখানে এসে পৌঁছে নি ; আমাদের আশঙ্কা হ'তে লাগলো ঘরওয়ালা হঠাৎ এসে আমাদের প্রতি অর্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা না করে ; কারণ, এরা বিলক্ষণ অতিথিপরায়ণ হ'লেও অতিথিসেবার পুণ্যটুকু তাদের জন্যে রেখে অন্য লোকে যে তার অর্থগত উপস্বত্বটুকু ভোগ ক'রবে, এদের পক্ষে তা অসহ্য। কিন্তু অনর্থক উদ্বিগ্ন হওয়াতে কোন লাভ নেই ভেবে আমরা সেই ঘরেই আড্ডা গাড়বার যোগাড় ক'রে নিলুম। ঘরটি বেশ লম্বা চওড়া বটে, কিন্তু তার আভ্যন্তরিক অবস্থা অতি শোচনীয় ; দ্বারগুলি পূর্বাগত সন্ন্যাসীদের অগ্নিসেবায় লেগেছে। রাত্রে দুর্জয় শীত আসছে ; তখন এই ঘরে কি ক'রে তিষ্ঠান যাবে, এখন এই চিন্তাতেই আমরা সকলে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে প'ড়লুম। সন্ধ্যা হ'তেও আর বেশী দেরী নেই। সন্ধ্যার সময় একবার নারায়ণ দর্শনে যাব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শুনলুম অপরাহ্ণেই নারায়ণের দ্বার বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে, সুতরাং রাত্রিযাপনের জন্যে আগুনের যোগাড়ে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব হ'তেই বড় শীত বোধ হ'তে লাগল এবং সর্বশরীর পুরু কম্বলে ঢাকা থাকা সত্ত্বেও শীতে সর্বাঙ্গ অবশ হ'য়ে এল। শুনেছি মহাকবি কালিদাসকে কে একবার জিজ্ঞাসা ক'রেছিল "মাঘে শীত, না মেঘে শীত?"—তার উত্তরে কবিবর নাকি ব'লেছিলেন, "যত্র বায়ু তত্র শীত।" কখন বদরিকাশ্রম দর্শন করতে এলে কালিদাস তাঁর এই উত্তরের অসারতা বুঝে নিশ্চয়ই লজ্জিত হ'তেন। চারিদিকে উঁচু পাহাড়ে বায়ুপ্রবাহশূন্য স্থানেও যেরকম মারাত্মক শীত, তা কবিপ্রতিভার আয়ত্তীভূত নয় ; যে সকল পুণ্যপ্রয়াসী তীর্থযাত্রী এ সকল স্থানে আসে, তাহারাই তা মর্মে মর্মে অনুভব করে। তবু ত মে মাস, মাঘ মাসের প্রবল শীত অনুমান করবার শক্তি মানুষের নাই। আমরা বহু কষ্টে কাষ্ঠ সংগ্রহ ক'রে আগুন জ্বাল্‌লুম এবং তার পাশেই শয্যারচনা করা গেল। সে রাত্রে কিছুই আহার হ'ল না।

হিমালয় পর্বতের মধ্যে এত দূরে জনমানবশূন্য চিরতুষাররাশির ভিতরে এতখানি সমতলভূমি দেখলে প্রাণে বড়ই আনন্দ বোধ হয়। হরিদ্বার থেকে যাত্রা ক'রে এতদূর এসেছি, এর মধ্যে যা কিছু অল্প সমতল জমি দেখেছি তা শ্রীনগরে ভিন্ন সমস্ত জায়গাই "কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ" অষ্টাবক্রবিশেষ। হরিদ্বার হ'তে বদরিকাশ্রম দুই শত মাইলেরও বেশী। একে তো হিমালয় প্রদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য ভারী গম্ভীর ; এ গাম্ভীর্যের সহিত স্বতঃই সাগরের গাম্ভীর্য তুলনা ক'রতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এই দুই জিনিসের মধ্যে আশ্চর্য রকমের তফাৎ। একটি মহা উচ্চ, অসমান, সুদীর্ঘ শ্যামল বৃক্ষশ্রেণীর চিরন্তনের বাসভূমি—আর একটি সুগভীর নীলিমায় সমাচ্ছন্ন, তবু এ দুইয়ের মধ্যে কেন যে তুলনার কথা মনে আসে, তাহা ঠিক বলা যায় না ; বোধ করি, এ উভয়কে দেখেই আর একজনকে মনে পড়ে ; এই মহান সৌন্দর্যের মধ্যে বিশ্ব-পিতার মহিমা ব্যাপ্ত আছে, তাই একটি দেখে আর একটির কথা মনে উদয় হয়। হিমালয়ের একেই ত গম্ভীর দৃশ্য তার উপর বদরিকাশ্রমের দৃশ্যটা আরও গম্ভীর। দুই দিকে দুইটা পর্বত একেবারে আকাশ ভেদ ক'রে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের স্তব্ধ ছায়া বদরিকাশ্রমকে ঢেকে ফেলেছে। পাণ্ডাদের মুখে শুনলুম, এই দুইটি পর্বতের একটির নাম "নর" অপরটির নাম "নারায়ণ"। আরও শুনলুম, এই পর্বতদ্বয়ের অঙ্গ ক্রমেই বিস্তৃত হ'চ্ছে। শাস্ত্রে নাকি লেখা আছে, ক্রমে এরা বর্ধিত-কলেবর হয়ে নারায়ণের মন্দির ঢেকে ফেলবে সুতরাং বদরিকাশ্রম তীর্থ চিরদিনের মত হিমালয়ের পাষাণ-বক্ষে লুকিয়ে যাবে। তবে পাণ্ডারা এই ভরসা করে

www.pathagar.com

যে দুই চারিশত বছরের মধ্যে সে রকম দুর্ঘটনা ঘটবার কোন সম্ভাবনা নেই ; কাজেই আশু দারিদ্র্যতার আক্রমণ সম্বন্ধে তারা নিরাপদ ; তবে তাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়দের যথেষ্ট আশঙ্কা রইল বটে!

যে উপত্যকার উপর বদরিকাশ্রম প্রতিষ্ঠিত, তা অতি সুন্দর। শুধু ভক্তের নয়, কবিরও এখানে উপভোগের যথেষ্ট সামগ্রী আছে। এই পুণ্যভূমি ভেদ ক'রে অলকানন্দা প্রবাহিত হচ্ছে ; কিন্তু বছরের বেশি সময়ই তা বরফে আচ্ছন্ন থাকে, এখনও ইহা বরফে ঢাকা। আরও কিছুদিন পরে বরফ গ'লে তার ললিত তরল স্রোতে ভেসে যাবে! সে দৃশ্য ভারি সুন্দর!

বদরিকাশ্রম উত্তর দক্ষিণে লম্বা ; দীর্ঘ বোধ হয় ৪০০ ফিটের বেশী নয়, কিন্তু অসমান পাহাড়ের মধ্যে এই স্থানটুকু খুব দীর্ঘ ব'লে বোধ হয়। দীর্ঘে এতখানি হলেও প্রস্থে বেশী নয় ; আরও দেখলুম প্রান্তদেশ খানিকটা ঢালু, কিন্তু বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দেখলেই তবে তা বুঝতে পারা যায়, নহিলে সহসা বোধগম্য হয় না। দূরের পর্বত থেকে অনেকগুলি ঝরণা বের হ'য়ে অলকানন্দায় পড়েছে এবং নদীর বরফ ভেদ করে সেই জল ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। উপরে যে কূর্ম-ধারার কথা ব'লেছি, তা এই বদরিনাথের বাজারের মধ্য দিয়ে নেমে নদীতে পড়েছে। এই ঝরণাতে বাজারের লোকের যথেষ্ট উপকার হয়। কূর্মধারা ছাড়া বাজারের পাশেই আর একটা ঝরণা আছে। বাজারে যে কতগুলি দোকান আছে, প্রথম দৃষ্টিতে তা ঠিক বুঝতে পাল্লুম না ; এখনও অনেকগুলি দোকান বরফের নীচে সুপ্তাবস্থায় লুপ্ত আছে, কিন্তু সমস্ত ঘরবাড়ির একটা সঠিক ধারণা না হ'লেও বোধ হ'লো পাণ্ডাদের বাসস্থান ও দোকান সবশুদ্ধ ত্রিশ পঁয়ত্রিশখানা ঘরের বেশী হবে না। বাজারে দরকারী জিনিসপত্র সকলই পাওয়া যায় ; তবে দরকার অর্থে যদি কেহ অনুমান ক'রে থাকেন, জুতা, ছাতা, সাবান, পমেটম ইত্যাদি সৌখীন রকমের জিনিসপত্র সব পাওয়া যায়, তবে আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। পাহাড়ের মধ্যে এসে অনাবশ্যক বহুবিধ দরকারী জিনিসের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম ; আবশ্যক বোধ হ'তো আটা, ভাল ঘি, লবণ, লঙ্কা আর কাঠ। আর বাঙ্গালী মানুষ অনেকদিন উপরি উপরি ডাল রুটির শ্রাদ্ধ ক'রতে ক'রতে এক এক দিন চাট্টি ভাতের জন্যে প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠতো, সুতরাং মধ্যে মধ্যে চাউলের খোঁজও না হ'তো এমন নয়। তার উপর যে দিন বড়ই নবাবী করার প্রবৃত্তি হ'তো, সেদিন গোটা দুই চারি "পেড়ার" (সন্দেশ) আয়োজন করা যেতো ; কিন্তু এ রকম দুঃসাহস প্রকাশ করতে প্রায়ই ভরসা হ'তো না —কারণ, সে সকল সন্দেশের জন্মদিন স্থির করতে হোলে বহুদর্শী প্রত্নবিৎ পণ্ডিতকে যত্নপূর্বক ইতিহাস অনুসন্ধান করতে হয় ; কত কীটই যে তার মধ্যে বাসা বেঁধে বংশানুক্রমে বাস ক'রছে তার ঠিক নেই! এখানে যে কয়খানা দোকান আছে, তার সকলগুলিতে কিছু না কিছু খাদ্যদ্রব্যের যোগাড় থাকে আর প্রত্যহ ছাগলের পিঠে বোঝাই দিয়ে অনেক জিনিসের আমদানীও হয়। আমাদের দেশে যেমন গাড়ী কি বলদ বা ঘোড়ার উপর জিনিসপত্র চাপিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়, এ দেশে সে রকম হবার যো নেই। পাহাড়ে ঘোড়াই হ'ক আর বলদই হ'ক, এই সকল দুর্গম পথে তারা বোঝা বইতে সম্পূর্ণ অশক্ত। একে পথ দুরারোহ, তার উপর এত সঙ্কীর্ণ যে, বৃহৎকায় পশু সে সকল পথে চলাফেরা ক'রতে পারে না ; আর যদিই বা তা সম্ভব

www.pathagar.com

হয় ত শীঘ্রই তারা হাঁপিয়ে পড়ে। ক্ষুদ্রকায়, কষ্টসহ ছাগলজাতিই এ পথের একমাত্র অবলম্বন ; এবং তাদের উপরই এ দেশের লোকের জীবন নির্ভর ক'রছে। বাঙ্গালা দেশে যখন ছিলুম তখন জানতুম, মা দুর্গার কাছে বলি দেওয়া ছাড়া ছাগলের ছাগজন্ম সার্থকের আর কোন পথ নাই এমন কি ছাগমাংসে উদর পরিতৃপ্তির আশায় মুগ্ধ গুপ্ত-কবি লিখে গিয়েছেন "এমন পাঁঠার নাম যে রেখেছে বোকা, শুধু সেই বোকা নয়, তার ঝাড়ে বংশে বোকা।" উদয়-পরায়ণতার বশবর্তী হয়েই তিনি রহস্যপূর্বক মানবসন্তানকে লক্ষ্য ক'রে উক্তপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ ক'রেছেন। এতদ্ভিন্ন কবিরাজ মহাশয়ের বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত সেবনে দেহ পুষ্ট এবং ছাগলদুগ্ধ পানে উদরাময় নিরাকৃত হয়, এরূপও শুনা গিয়েছে। এই জন্যই আমাদের দেশ ছাগবংশের প্রতি যা কিছু কৃতজ্ঞ ; কিন্তু এই বরফরাজ্যে এসে দেখি ছাগলের দ্বারাই এখানে রেলওয়ের কাজ চ'লছে এবং ছাগলই এ দেশের সুখসমৃদ্ধির কারণ হ'য়ে রয়েছে। প্রতিদিন কত ছাগলের পিঠে কত জিনিস চাপিয়ে পাহাড় হ'তে পাহাড়ান্তরে নিয়ে যাওয়া হ'চ্ছে ; কিন্তু কোনোদিনও তাদের পদস্খলনের কথা শুনতে পাওয়া যায় নি। তবে এরা যেমন ছোট জানোয়ার, তেমনি অল্প বোঝা বয়। ছাগলের পিঠে দশ সেরের বেশী বোঝা চাপাতে দেখি নি, কিন্তু তার চেয়েও ভারি বোঝা বইতে পারে। বোধ হয় অনেক দূর চ'লতে হয় ব'লে বোঝা লঘু করা হয়। আর যখন দলে দলে ছাগল এই কাজে লাগান হয়, তখন বোঝা ছোট হওয়াতে ব্যবসায়ীদের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, বরং বেশী বোঝা দিলে যদি কোন ছাগল পথের মধ্যে অক্ষম হ'য়ে পড়ে ত বিপদের কথা। এই সকল ছাগল যে শুধু এই তীর্থস্থানের ও হিমালয় প্রদেশের লোকের খোরাক বয় এমন নয়, ভোট ও তিব্বতের লোকেরাও লবণ প্রভৃতি তাদের প্রয়োজনীয় দুষ্প্রাপ্য জিনিস কেনবার জন্যে দলে দলে ছাগল নিয়ে আসে। চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং আষাড়ের কয়েকদিন পর্যন্ত প্রতিদিন দলে দলে লম্বকর্ণ বৃহদাকৃতি ছাগল যাতায়াত করে। তারপর যখন বর্ষা নামে, তখন স্থানে স্থানে বেগবতী ঝরণা সকল হ'তে অবিশ্রাম জল ঝরতে থাকে ; পথও দারুণ পিচ্ছিল হয়। তখন চলাচল এক রকম অসম্ভব হ'য়ে উঠে। তার পরে শীতকাল—তখন ত বরফে রাস্তাঘাট সমস্ত একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, সুতরাং যা কিছু কেনাবেচা, তা এই কয় মাসের মধ্যেই শেষ করে নিতে হয়।

বদরিনাথের একটি মন্দির আছে। মন্দিরটি দেখতে তত পুরাতন ব'লে বোধ হয় না ; তবে অল্পদিনের, তাও নয়। মন্দিরের বাইরে চারিপাশে সামান্য একটা উঠান। এই উঠানের চারিদিকে একটা একমহল ছোট চক, তাতে অনেক ছোট দেবতার অধিষ্ঠান আছে। নারায়ণের সঙ্গে এই সকল দেবতার কোন পার্থিব সম্বন্ধ নেই, এগুলি পাণ্ডাঠাকুরদের রোজগারের অবলম্বন মাত্র। নারায়ণের প্রাঙ্গণে যখন এঁদের স্থান হ'য়েছে, তখন এঁরা মাহাত্ম অংশে নিতান্ত খাট নয়, এই হেতুবাদে পয়সাওয়ালা অনেক যাত্রী এইসকল বিগ্রহের মাথায় দুই এক পয়সা চড়ায় (অর্থাৎ প্রণামী দেয়)। মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করবার একটা দ্বার আছে, তার কবাট অতি প্রকাণ্ড। মন্দিরটি আমাদের দেশের মন্দিরের মতই। মন্দিরের গায়ে বিশেষ কোন কারুকার্য দেখলুম না ; আমাদের দেশের সাধারণ মন্দিরগুলি যে রকমের বৈচিত্র্য-বিহীন, এও তাই ; তবে দেবমাহাত্ম্যেই এর মাহাত্ম্য এত বেশী। উঁচুতে কালীঘাটের মন্দিরের চেয়েও খাট বলে বোধ হ'লো ; তবে এটি আগাগোড়া পাথরের গাঁথা, এ পাথরের রাজ্যে পাথরের উপর যে মন্দির নির্মিত,

www.pathagar.com

তার পক্ষে এটা কিছু আশ্চর্য কথা নয়, বরং ইষ্টকনির্মিত হ'লেই একটু আশ্চর্য হবার কারণ থাকতো। এদিকে যত মন্দির দেখলুম, সকলগুলিই পাথরের গাঁথা।

মন্দিরটি জীর্ণ হ'য়েছে ; কিন্তু আগে ব'লেছি বাহ্যদৃশ্যে তেমন জীর্ণ বলে বোধ হয় না। সকলের বিশ্বাস এ মন্দির শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত। এ কথা অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই ; ইহা বহু প্রাচীন জনপ্রবাদ, এবং তার কতক প্রমাণও যে নেই, এমন নয়! কিন্তু মন্দিরটি দেখলে কেহই বিশ্বাস ক'রবেন না যে, এটি শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত —এমন আধুনিকের মত দেখায়! আমি প্রথমে একটু আশ্চর্য হ'য়েছিলুম, কিন্তু পরে ভেবে দেখলুম যে মন্দিরটি বছরের মধ্যে আট মাস বরফের নীচে ঢাকা থাকে, রৌদ্র-বৃষ্টির সঙ্গে বড় একটা দেখাসাক্ষাৎ হয় না, সুতরাং তাঁর উপরের দিকে ময়লা ধরবার অতি অল্পই সম্ভাবনা। কিন্তু আর বেশী দিন বে-মেরামত অবস্থায় রাখা উচিত নয় ভেবে মন্দিরাধ্যক্ষ এর মেরামত আরম্ভ ক'রেছেন। তবে কতদিনে যে এই কাজ শেষ হবে, কখনও হবে কি না, তা ভবিষ্যৎ-জ্ঞান না থাকলে শুধু অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে বলা ভারি শক্ত। হয় ত মেরামত শেষ হ'তে না হ'তে আরও দু'চার জন মোহান্তের জীবনকাল কেটে যাবে ; কারণ একে ত বছরের দু'তিন মাসের বেশী কাজ হবার যো নাই, তার উপর যে রকম "গদাইলস্কর" ভাবে কাজ চলচে, তাতে একদিকে গড়ে তুলতে আর একদিক ভেঙে না পড়ে। হায় কলিকাল। স্বয়ং বিশ্বকর্মা থাকতে নারায়ণের মন্দির মেরামতের জন্য আজ কিনা সামান্য রাজমিস্ত্রিরা তাদের দুর্বল হাতে ছোট ছোট পাথরের চাপ নিয়ে টানাটানি ক'রচে এবং যতটুকু কাজ ক'রছে তার চেয়ে অনেক বেশী পয়সা ফাঁকি দিয়ে খাচ্ছে, এদের নরকেও স্থান হবে না।

এখন পর্যন্ত অদৃষ্টে নারায়ণ দর্শন ঘটেনি ; কিন্তু বাল্যকাল হ'তে শুনে আসছি, বদরিকাশ্রমের নারায়ণের মূর্তি পরশ-পাথরে নির্মিত। স্পর্শমণি উপকথার বস্তু, কল্পনা ও কবিতাতে কখন কখন তার শক্তি অনুভব করা যায় বটে ; কিন্তু এই পৃথিবীতে যদি সে রকম একটা জিনিসের অস্তিত্ব থাকতো, তা হ'লে এই ঘোর জীবনসংগ্রামের দিনে অনেকের পক্ষে সুবিধার কথা ছিল। বাটাবিভ্রাটের ভয়টা ত ক'মে যেতই, তা ছাড়া ইন্‌কম্‌ট্যাক্সের জন্যও এতটা কষ্ট পেতে হ'তো না, এবং অনাহারে থেকে ভদ্রতার দণ্ডস্বরূপ ঘটি বাটি বিক্রয় ক'রে ট্যাক্স দেবার দায় হ'তেও অনেকাংশে নিষ্কৃতি পাওয়া যেত। কিন্তু কবিতা ও কল্পনাতে যা মেলে, এ নিষ্ফলতার পৃথিবীতে তা কোথা হ'তে মিলবে? দেশে থাকতে কতদিন শুনেছি, কখন ঠাকুরমার কাছে কখন বা বাচস্পতি মহাশয়ের বক্তৃতাতে যে,—হিমালয় পর্বতে এমন সব যোগী-ঋষি আছেন, যাঁরা যোগবলে ভস্মকে কাঞ্চন এবং বিষকে অমৃত ক'রতে পারেন! কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ এ পর্যন্ত বিষের জ্বালা অনেক সহ্য ক'ল্লুম বটে, কিন্তু অমৃতের আস্বাদন ত বড়-একটা হ'লো না ; তা হ'লে বোধ করি আবার এ সংসারে কর্মভোগের মধ্যে এসে প'ড়তে হ'তো না। তবে এইটুকুও বলা যেতে পারে যে, অমৃতের আস্বাদন না পাই, এমন এক আধ জন সন্ন্যাসী দেখা গিয়াছে বটে, যাঁরা সচ্চিদানন্দের করুণামৃত-ধারা পান করে জীবনকে কৃতার্থ ক'রেছেন ; কিন্তু তাঁদের কোন কথা জিজ্ঞাসা করা ঘটে নি, তাঁদের স্বর্গীয় জ্যোতির সম্মুখে উপস্থিত হ'লে সাংসারিক আসক্তিপূর্ণ বাসনা ও চিন্তা ভস্মীভূত হ'য়ে যায়। কিন্তু আমাদের পাপ হৃদয়ে যে আশ্বাসবাণীর ঘোষণা হয়, আমরা তার উপযুক্ত নই, সুতরাং দু'দিনের

www.pathagar.com

মধ্যে সে সকলই অন্তর্হিত হ'য়ে যায়। তখন বাস্তবিকই একটা অনন্ত যাতনায় প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠে, এবং কাতর হৃদয় বিদীর্ণ ক'রে স্বতঃই ধ্বনিত হয়—

"যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই, আপনার মন ভুলাতে,
শেষে দেখি হায়! ভেঙে সব যায়, ধূলা হ'য়ে যায় ধূলাতে।
সুখের আশায় মরি পিপাসায়, ডুবে মরি পথে পাথারে ;
রবি শশী তারা কোথা হয় হারা, দেখিতে না পাই তোমারে!"

রাত্রে শুয়ে হিহি ক'রে কাঁপতে কাঁপতে কত কথাই ভাবতে লাগলুম। বৈদান্তিকের সুখ-নিদ্রাটা আমার কাছে নিতান্ত চক্ষুশূল ব'লে বোধ হ'চ্ছিল। বিশেষ যতক্ষণ ঘুম না আসে চুপ ক'রে পড়ে আকাশ পাতাল চিন্তা করার চেয়ে ততক্ষণ কথা বলাতে বোধ করি একটু বেশী আরাম আছে ; কিছু না হোক কথাবার্তায় শীতের প্রকোপটা অনেক কম বিবেচনা হয়। অতএব বৈদান্তিকের ক্লান্তিহর নিদ্রাটুকু বিনষ্ট ক'রতে মনে কিছুমাত্র দ্বিধা উপস্থিত হ'লো না। কাঁচা ঘুম ভাঙাতে বৈদান্তিক বোধ করি আমার প্রতি কিঞ্চিৎ উষ্মাযুক্ত হ'য়েছিলেন, কিন্তু আমি তাঁকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা কল্লুম "আচ্ছা, নারায়ণের দেহ যে পরশ-পাথরে নির্মিত বলে, এ কথাটার অর্থ কি? আমি ত অনেকক্ষণ ভেবে কিছু-ই ঠাহর ক'রতে পাল্লুম না, সত্যি সত্যি পরশ-পাথর ত আর নেই!"—আশু তর্কের একটি সুন্দর সম্ভাবনা দেখে ভায়ার নিদ্রা ও বিরক্তি দুই-ই এককালে দূর হ'য়ে গেল! তিনি সোৎসাহে পার্শ্বপরিবর্তন ক'রে বলতে লাগলেন যে, পরশ-পাথর কথাটার অর্থ নিয়েই আমি গোল কচ্ছি। আমাদের দেশের সকল বিষয়েরই এক একটা অর্থ আছে —যাকে আজকাল আমরা আধ্যাত্মিক অর্থ ব'লে থাকি ; এবং বৈদান্তিকের মতে কেহ কেহ তার প্রতি অন্যায় কটাক্ষপাতও ক'রে থাকে। বোধ হয় তিনি আমার উপর কটাক্ষ ক'রেই কথাটা ব'ল্লেন ; কিন্তু উপস্থিত-ক্ষেত্রে তিনি গুরু আমি শিষ্য, সুতরাং কোন রকম উচ্চবাচ্য না ক'রে শুনতে লাগলুম। তিনি অর্ধরাত্রব্যাপী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা যা বুঝালেন, তার মোদ্দাখানা এই যে, পরশ-পাথরের গূঢ় অর্থ ধর্ম। কারণ কল্পিত পরশ-পাথর স্পর্শে যেমন লোহা সোনা হয়ে যায়—তেমনি ধর্মের সংস্পর্শে তুচ্ছ দ্রব্যও মূল্যবান হয় এবং যা নিতান্ত মলিন, তাও উজ্জ্বল ও তেজোময় হ'য়ে উঠে ; লোকে তখন তা আগ্রহভরে কণ্ঠে ধারণ করবার জন্য আকুল হয়! নারায়ণের দেহ পরশ-পাথরে নির্মিত, তার অর্থ কি না, তিনি ধর্মস্বরূপ ; তাঁকে স্পর্শ দূরের কথা, দর্শনমাত্র মানুষ খাঁটি সোনা হয়ে যায়। পাপ মনকে যে স্পর্শমণি নিষ্পাপ, পবিত্র ক'রে তুলতে পারে—লোহাকে তুচ্ছ সোনা করার পরশমণি তার কাছে কোথায় লাগে?

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, বাস্তবিকই বৈদান্তিক ভায়ার এই বক্তৃতা আমার অতি মিষ্ট লেগেছিল। এমন একটা সার কথা তাঁর কাছে থেকে আমি মুহূর্তের জন্যও প্রত্যাশা করি নি ; কিন্তু তাঁর কথা শুনে আমার হৃদয়ে আর একটা নূতন চিন্তার উদয় হ'লো —হায়! দেবতার পদতলে এসেও আমার এই জীবনব্যাপিনী চিন্তা দূর হয় নি! আমার মনে হ'লো এ সংসারে রমণীহৃদয়ই একমাত্র স্পর্শমণি! দেবতার মহিমা যেখানে প্রবেশ ক'রতে অক্ষম, সেখানেও সে আপনার উজ্জ্বল মহিমা বিকাশ করে এবং পুরুষের কঠোর হৃদয়কেও পুণ্যময় ও পবিত্র ক'রে তোলে। আমার একখানি স্পর্শমণি ছিল, হঠাৎ তা হারিয়ে ফেলেছি। দেখি, যদি এই হিন্দুর মহাতীর্থে আর একখানি স্পর্শমণির সন্ধান পাই —যাতে এই পাপভারানত ধূলিম্লান জীবনকে সজীব, উজ্জ্বল ও পবিত্র ক'রে তুলতে পারি!

www.pathagar.com

বদরিকাশ্রমে নারায়ণ দর্শন

বৈদান্তিকের কথার পর আমার কিঞ্চিৎ নিদ্রাকর্ষণ হ'লেও অতি সকালেই জেগে উঠেছিলুম। কোন স্থানে উপস্থিত হলে অনেক সময় রাত্রে ঘুম তত গভীর হয় না এবং সকালে সহজে নিদ্রাভঙ্গ হ'লে প্রাণের মধ্যে যেন একটা অভাব অনুভূত হয়। মনে পড়ে, ছেলেবেলায় যে দিন বিদেশে যাই, তার পরদিন নিদ্রাহীন প্রভাত কেমন অপ্রসন্ন এবং স্নিগ্ধতাহীন ব'লে বোধ হ'য়েছিল। তারপর আরও কত বিদেশে বেড়ালুম, এই শেষের কয় বৎসর ত নিত্য নূতন বিদেশে; তবে আজ প্রভাতে উঠেই প্রাণের মধ্যে একটা অভাব অনুভূত হ'লো কেন? এ কি মায়া? মায়াবাদের ঊর্ধ্বে যাঁহার অবস্থান, তাঁহার পুণ্যমন্দিরের দ্বারেও মায়ার প্রভাব!

যা হ'ক, সে জন্য দেবতার প্রতি আমার অভক্তি হয় নি। শঙ্করাচার্যের সমুজ্জ্বল প্রতিভা মানব মস্তিষ্ককে বিস্মিত করেই ক্ষান্ত হয় নি; তাঁর ধর্মানুরাগ, অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে শৃঙ্খলাসাধনের জন্য যত্ন, মানবজাতির প্রতি অপক্ষপাত সহানুভূতির পরিচয়, এই মন্দির সগর্বে বহন করচে। এখানে এসে সর্বপ্রথমেই আমাদের হৃদয়ে যে সুপবিত্র মহৎ গীতটি ধ্বনিত হ'লো, অনেক দিন আগে কলিকাতার আদি ব্রাহ্ম-সমাজের এক বার্ষিক অধিবেশনে কোন শ্রদ্ধেয় গায়কের কণ্ঠে তা গীত হ'তে শুনেছিলুম। সে দিন এগারোই মাঘের প্রভাত, বাহিরে মসুজ্জ্বল সূর্যকিরণ এবং প্রভাতের তুষার-শীতল বায়ু-প্রবাহ, কিন্তু মণ্ডপের মধ্যে শত শত সহৃদয় ভক্তের সমাগম হ'য়েছিল। তাঁরা সংযত হৃদয়ে সচ্চিদানন্দের উপাসনায় মগ্ন; অন্য দিকে উচ্ছ্বাসময়ী ভাষায় ধ্বনিত হ'চ্ছিল—

"গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুটন্ত জ্যোতিঃ রে।
কেমন আরতি হে ভবখণ্ডন তব আরতি,
অনাহত শব্দে বাজন্ত ভেরী রে।।"

দেবমন্দিরের চারিপার্শ্বে যে পুণ্য ও পবিত্রতা বিস্তৃত আছে, তাই আমাদের অনেক ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারে; কিন্তু তীর্থস্থানের দূরদৃষ্ট, বদরিকাশ্রম ভিন্ন আর কোথাও এ পবিত্রতা ও শান্তি স্নিগ্ধভাবে আছে কিনা জানি না। আমি ত অনেক দিনই অনেক স্থান হ'তে অপূর্ণ হৃদয়ে স'রে গিয়েছি। আমার হৃদয় শুষ্ক, ভক্তিহীন, হয় ত তার ঠিক ভাব গ্রহণ ক'রতে পারি নি। যে সকল দৃশ্যে অনেকেই মুগ্ধ হয়, আমার চঞ্চল হৃদয়ের ভিতর হয় ত তার বিশেষ কিছু মাধুরী এবং মহান ভাব ধারণা করতে পারি নি; তাই বুঝি আশা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু যে দৃশ্য দেব-মন্দিরে সর্বদা দেখা যায়, তাতে শুধু আমি কেন, অনেকেই ব্যর্থমনোরথ হন। হয়ত কোথাও খর্পরাঘাতে ছাগ-শিশুর মস্তক রক্তসিক্ত হ'য়ে ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে, কতকগুলি নির্দয় লোক রাক্ষসের ন্যায় নৃত্য করছে; আর কেহ কেহ ভক্তিভরে 'মা, মা' চীৎকার ক'চ্ছে। এই সকল ভয়ানক দৃশ্যের মধ্যে ভক্তি যে কিরূপে অব্যাহত থাকে, তা বুঝে উঠা আমাদের সাধ্য নয়। আবার কোথাও বা যত

www.pathagar.com

রকম মন্দ লোক দল বেঁধে একটা মহা হট্টগোল আরম্ভ ক'রেছে ; সে সকল জায়গায় পিতৃ-পিতামহের শ্রাদ্ধ থেকে আরম্ভ ক'রে পরবর্তী তিন লাখ তেষট্টি হাজার বংশধরকে স্বর্গে পাঠানোর অতি সহজ ব্যবস্থা হ'চ্ছে ; যে কোন রকমে সংসারের কাজ শেষ ক'রে স্বর্গে প্রবেশ ক'রতে পারলেই মানবজন্ম সার্থক হ'লো। এখানে কিন্তু তার কিছু সূচনা দেখা গেল না ; যেন এখানে অনুষ্ঠান আছে, তার উপদ্রব নেই ; মাতৃস্নেহ আছে, পুত্রের ভক্তিরও অভাব নেই ; সরল ভাব, বহুকালের উন্নত-কল্পনা, এখানে যেন জমাট বেঁধে তার উপর একটা সুমহান দেবমহিমা প্রতিষ্ঠিত ক'রে রেখেছে। সেই মহিমা অনুভব ক'রে আমরা পরিতৃপ্ত হ'য়ে যাই, জীবনকে ধন্য বলে মনে হয়। দেব-মন্দির ও দেবতা পাষাণময়, কিন্তু যুগান্তর প্রবাহিত ভক্তি, প্রেম ও পবিত্রতায় তা সমুজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে; দেব-মন্দির ও দেবতা অপেক্ষাও তাঁদের পুণ্য-স্মৃতি অধিক সৌভাগ্যময়।

ক্রমে পূর্বদিক পরিষ্কার হ'লে আমার দেবদর্শনস্পৃহা বলবতী হ'য়ে উঠলো। প্রত্যুষে বোধ হ'লো, কে যেন স্নিগ্ধ রাগিণীতে সন্তোষ ও সম্ভ্রমময় আগ্রহ ঢেলে দিচ্ছে ; সেই ললিত মধুর শব্দ পৃথিবীর বাদ্যযন্ত্র হ'তে ধ্বনিত হয় না ; সেই মঙ্গলবাদ্য পৃথিবীর শোকসন্তপ্ত, দুঃখভারাবনত, পাপক্লিষ্ট পথিকের কর্ণে অভিনন্দন সঙ্গীতরূপে প্রতীয়মান হয়।

৩০শে মে, শনিবার। সূর্যোদয় হ'লো। অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে নারায়ণ দর্শন ক'রতে বের হ'য়ে পড়লুম ; কিন্তু শুনলুম বেলা আটটার আগে মন্দিরের দ্বার খোলা হয় না ; কাজেই কিয়ৎক্ষণ এদিক ওদিক বেড়াতে লাগলুম। মন্দিরের চকের বাহিরে একটা ক্ষুদ্র ঘরে ডাকঘর বসেছে। এটি সাময়িক পোস্টঅফিস ; যাত্রীর যাতায়াত বন্ধ হ'লে এ পোস্টঅফিসও বন্ধ হবে। ডাকঘরে টিকিট খাম পোস্টকার্ড প্রভৃতি দরকারী সকল জিনিসই পাওয়া যায়। পোস্টমাস্টারটি গাড়োয়ালী ; দিব্য গৌরবর্ণ গোলগাল চেহারা এবং মাথায় এক বিকট পাগড়ী। লোকটা লেখাপড়া অতি সামান্য জানে ; ইংরাজী নাম ও ঠিকানাগুলো কোন রকমে প'ড়তে পারে। আমি খানকতক পোস্টকার্ড কিনে দেশে চিঠি লিখতে প্রস্তুত হলুম। শীতে হিহি করে কাঁপছি, আর বহু কষ্টে অঙ্গুলির আগা বের ক'রে কোন রকমে কলম ধ'রে বাঙ্গালা দেশে এই পোস্টকার্ড ক'খানি লিখছি। এই কার্ডগুলি পাঁচ সাত দিন পরে হয় ত বঙ্গের একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে একটি সামান্য পরিবারে একজন প্রবাসীর সুস্থ সংবাদ ঘোষণা দ্বারা কিঞ্চিৎ সুস্থ শান্তি আনবে ; কিন্তু কেহ কি এক বারও ভাবছে কত অলিখিত প্রবাসকাহিনীতে ঐ পোস্টকার্ডের উভয় পৃষ্ঠা পূর্ণ হয়ে গেছে। প্রবাসীর মনে এ কথা অনেক সময় উদয় হলেও বোধ হয় গৃহজীবি তাঁর সংসারচিন্তার মধ্যে ও কথা ভাববার অবসর পান না।

পত্র লিখে যখন বাইরে এলুম, তখন শুনা গেল মন্দিরদ্বার উদ্‌ঘাটিত হ'য়েছে। স্বামীজি ও বৈদান্তিক আমার সঙ্গে আসেন নি, সুতরাং তাঁদের ডেকে এনে একসঙ্গে মন্দির-প্রবেশ ক'রবো ইচ্ছা ক'রলুম। কত দিন হলো এক অভীষ্ট লক্ষ্য করে আমরা কোন দূরবর্তী রাজ্য হ'তে যাত্রা করেছি, আমরা পরস্পরের জীবনের অবিচ্ছিন্ন অবলম্বন ; জীবনের উপর দিয়ে কত বিপদ চলে গেছে, সে স্রোতের বেগে আমরা বিভিন্ন হইনি। আজ এই পরম আনন্দের দিনেও একত্র হ'য়ে যাই। কিন্তু অধিক দূর যেতে হ'ল না, মন্দিরের কাছেই তাঁদের দু'জনের সঙ্গে দেখা হ'ল। তখন তিনজনে মহাহর্ষে মন্দিরে

www.pathagar.com

প্রবেশ করা গেল। আমার মনের মধ্যে কেমন একটা নূতন ভাবের সঞ্চার হ'ল।

চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্তি দৃষ্টিগোচর হলো। মূর্তি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পাথরের প্রস্তুত ; বিগ্রহের গায়ে বহুমূল্য অলঙ্কার। অলঙ্কার নারায়ণের আপাদমস্তক ঢেকে ফেলেছে। সেই মনিমুক্তাহীরকাদিজড়িত হেমাভরণের মধ্য হ'তে একটা উজ্জ্বল স্নিগ্ধ শ্যামকান্তি বিকশিত হ'চ্ছিল, তা দেখলে মনে বাস্তবিকই বড় আনন্দের সঞ্চার হয়। নারায়ণের শরীরস্থ মণিমুক্তাদির জ্যোতিতে গৃহ আলোকিত। পূর্বে গল্প শুনেছিলুম, ভাদ্র মাসে যে দিন মন্দিরদ্বার বন্ধ হয়, সেদিন মন্দিরমধ্যে যে প্রদীপ জ্বেলে রাখা হয়, বৈশাখ মাস পর্যন্ত অর্থাৎ এই নয় মাস কাল অনবরত তা জ্বলতে থাকে ; আর যে সমস্ত নৈবেদ্য ক'রে দেওয়া হয়, এ দীর্ঘকালেও তা নষ্ট হয় না, যেমন তেমনি থাকে। এই শেষের কথাটি সত্য হ'তে পারে, কারণ ঠিক নয় মাস বদরিনারায়ণের মন্দির বরফের তলে থাকে; বরফের মধ্যে নিহিত থাকাতে কিছু নষ্ট হয় না ; কিন্তু আগের কথাটির যথার্থতা সম্বন্ধে তেমন বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যায় না। যদি মনে করা যেত, সেই প্রদীপ এমন সুবৃহৎ যে তাতে নয় মাস দিনরাত্রি জ্বলবার উপযুক্ত তৈল দিয়ে রাখা হয়, তাই জ্বলবার পক্ষে আর কোন বাধা থাকে না ; কিন্তু তাতেও বিজ্ঞান প্রতিবাদী। বরফের দ্বারা এইরূপে বদ্ধ স্থানে আলোক অচিরাৎ নির্বাণ হয় ; দেবতা স্বয়ং চেষ্টা ক'রেও অগ্নির এই দৌর্বল্যটুকু বোধ করি দূর ক'রে দিতে পারেন না। যা হোক যখন সেই মন্দিরস্থিত ক্ষুদ্র প্রদীপটি দৃষ্টিগোচর হ'ল, তখন সমস্ত বিবাদ খণ্ডন হ'য়ে গেল। এ যুক্তির দিনে আমাদের অগত্যা বিশ্বাস ক'রতে হ'ল মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ মণিমুক্তা এবং হীরকস্তূপই মন্দিরের মধ্যভাগ দীপালোকের ন্যায় উজ্জ্বল রাখে। বিশেষ যেদিন নারায়ণের দ্বার বন্ধ হয়, সে দিন জ্যোতির্ময় অলঙ্কারগুলি নারায়ণের শরীরে পরাইয়া দেওয়া হয় ; তাদের আলোতেই মন্দিরের মধ্যভাগ অধিক আলোকিত হয়। তার পরে যেদিন প্রথম দ্বার খোলা হয় ; সেদিন অনেক সন্ন্যাসী উপস্থিত থাকে। দ্বার খোলামাত্র তারা মন্দিরের মধ্যে এই অলঙ্কারের জ্যোতিঃ দেখতে পায়, সুতরাং মনে করে প্রদীপ জ্বালা আছে। নারায়ণের দেহ পরশ-পাথরে নির্মিত ব'লে যে প্রবাদ আছে, বৈদান্তিকের মতে তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা থাকলেও আমার বোধ হ'ল নির্জন দেবালয়ের দেবতা যে বরফরাশির মধ্যে আপনার নিভৃত সিংহাসন স্থাপন ক'রেছেন, সেখানে এত হেমাভরণ, স্তূপাকার মণিমুক্তার উজ্জ্বল বিকাশ দেখে সাধারণে বিশ্বাস ক'রে নিয়েছে, দেবতার দেহ পরশমণি-নির্মিত!

যা হোক বদরিনারায়ণের এই বহু মূল্যবান অলঙ্কারপ্রাচুর্য দেখে আশ্চর্য হ'বার কোন কারণ নেই। আমাদের দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্য বিগ্রহদেরই কত লোকে কত মূল্যবান অলঙ্কারাদি উপহার দেয়। বদরিকাশ্রম ভারতের শ্রেষ্ঠতীর্থ ; বদরিকাশ্রমে নারায়ণের মহিমা নিখিল দেব-মহিমার উপরে, সুতরাং নানা দেশবিদেশের রাজগণ বদরিনাথকে কত মূল্যবান দ্রব্য উপহার দিয়েছেন, তার সংখ্যা নেই। তার উপর গাড়োয়াল যখন স্বাধীন ছিল, তখন গাড়োয়ালের রাজা প্রায় নারায়ণকে বহুমূল্য অলঙ্কারদি দান ক'রতেন।

মন্দিরমধ্যে দেখলুম, শুধু নারায়ণ একা নেই, আরো দু'চারটি অতিথি অভ্যাগত বিগ্রহ আছেন ; কিন্তু তাঁরা নারায়ণের উজ্জ্বল প্রভায় কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ হ'য়ে প'ড়েছেন। তাঁদের দিকে দৃষ্টিও সহসা আকৃষ্ট হয় না। আমাদের সঙ্গে আরো অনেক যাত্রী মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ ক'রেছিল। আমার হৃদয়ে যত ভক্তির না উদ্রেক হ'ক, এই সকল সমাগত

www.pathagar.com

যাত্রীর ভক্তি ও নিষ্ঠা দেখে আমি মোহিত হ'য়ে গেলুম, আমার হৃদয়ে এক স্বর্গীয় ভাবের উদয় হ'ল। আমার কাছে একটি বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে ছিল ; সে বড়কষ্টে নারায়ণ দর্শন ক'রতে এসেছে। পা একেবারে ফুলে গিয়েছে, দাঁড়াবার শক্তি নেই, তবুও প্রাণপণ শক্তিতে একবার দাঁড়িয়ে নারায়ণের শ্রীমুখ নিরীক্ষণ ক'রবে। তার মুখে এমন উজ্জ্বল প্রফুল্ল ভাব, চক্ষে এমন নিস্পন্দ সতৃষ্ণ দৃষ্টির একাগ্রতা যে, বোধ হ'ল শারীরিক যন্ত্রণার কথা একটুও তার মনে নেই। তার যেন মনের ভাব, তার সকল কষ্টদুঃখ এবার সার্থক হ'য়েছে। বৃদ্ধার সঙ্গে একটি বড় পুত্র ও একটি বিধবা কন্যা। আমরা যে দিন বদরিকাশ্রমে পৌঁছি, এরাও সে দিন এখানে এসেছিল। বৃদ্ধা অনেকক্ষণ নারায়ণ দর্শন ক'রে শেষে ভক্তিভরে প্রণাম ক'রলে। তারপর পুত্রটির দিকে চেয়ে ব'ললে, "বেটা, জনম সফল করলিয়া।" সেইকথা কয়টির মধ্যে যে কত আনন্দ তা বর্ণনাতীত। ছেলেটি মার কথায় ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে নতজানু হ'য়ে মায়ের পদধূলি গ্রহণ ক'ল্লে, মাও আস্তে-ব্যস্তে জীবনের অবলম্বন ছেলেটিকে বুকের মধ্যে টেনে নিলে। সে দৃশ্য স্বর্গীয় ; আমাদের সকলের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। পুত্র মায়ের প্রতি কর্তব্যের এক অংশ সম্পূর্ণ ক'রে অতুল আনন্দ বোধ ক'রলে এবং মায়ের স্নেহপূর্ণ বুকের মধুর প্রশান্তির মধ্যে স্থান পেয়ে হয় ত সে মনে ক'ল্লে, তার অপার্থিব পুরস্কার হ'য়ে গেল। হায় মাতৃহীন আমি—আমি মর্মে মর্মে মাতার অভাব অনুভব ক'ল্লুম।

তারপর আমরা ধীরে ধীরে মন্দির হ'তে "তপ্তকুণ্ড" দেখতে চ'ল্লুম। মন্দিরের বাহিরে একটু নীচেই একস্থলে পাথর দিয়ে বাঁধান জল রাখবার একটা অনতিবৃহৎ চৌবাচ্চা নির্মিত আছে ; তার গভীরতা বেশী নয়। নারায়ণের মন্দিরের নীচে দিয়ে তার এক পাশে একটা বৃহৎ ঝরণা এসে প'ড়েছে। এ ঝরণার জল ভারি গরম ; এত গরম যে তাতে স্নান চলে না। তাই পাণ্ডারা উক্ত চৌবাচ্চায় সেই ঝরণার জল এনে ফেলেছে, আর একদিক দিয়ে এক ঠাণ্ডা জলের ঝরণাও তার মধ্যে এসে মিশেছে, এবং এই দুই জল একত্র মিশে, স্নানের উপযুক্ত ঈষদুষ্ণ জলে পরিণত হ'য়েছে। এই স্থানটির চারিপাশে পাথরের স্তম্ভ দিয়ে উপরে ছাদ তৈয়েরি করা হ'য়েছে। অনেকেই এখানে স্নান ক'চ্ছেন দেখলুম, আমারও স্নান করবার বড় ইচ্ছা হ'ল। গায়ের কাপড়চোপড় খুলছি, স্বামীজি তাড়াতাড়ি আমাকে নিষেধ ক'রলেন। আমি তাঁকে ব'ললুম, এ গরম জলে স্নান করায় এমন কি আপত্তি হ'তে পারে? তিনি ব'ল্লেন, স্নান করায় ক্ষতি না হ'তে পারে, কিন্তু গায়ের কাপড় খুলে শরীর অনাবৃত করাতে বুকে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগতে পারে। তাঁর কঠোর শাসনে অগত্যা আমাকে স্নান বন্ধ ক'রতে হ'ল। কিন্তু বৈদান্তিক ভায়া নিরঙ্কুশ, তিনি, গায়ের কাপড় চোপড় খুলে দিব্য স্নান ক'রতে লাগলেন। তাঁর সেই সজোরে গাত্রমার্জন এবং মৃদুহাস্যের অর্থ আমি বুঝলাম যে, তোমরা কোন কাজের লোক নও। অতি সাবধান হ'য়ে সর্বত্র নিষেধ-বিধি মানলে জীবনের অনেক সুখভোগ হ'তে বঞ্চিত থাকতে হয়।

বৈদান্তিকের স্নান প্রায় শেষ হ'য়েছে এমন সময় মোহান্ত মহারাজা আমাকে ডেকে পাঠালেন। ইনি সেই যোশীমঠের মোহান্ত ; নারায়ণের সেবার ভার এখন ইহার উপর ন্যস্ত আছে। একটি কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। এই মন্দির বন্ধ হ'লে তার চাবি মোহান্তের কাছে থাকে না ; গাড়োয়ালের রাজার (এখন তিহরীর রাজা) এ মন্দির ; তাঁরই কর্মচারিগণ এসে মন্দিরের দ্বার খুলে জিনিসপত্র সব বুঝে পেড়ে দিয়ে যায়, আর বন্ধের পূর্বে এসে

www.pathagar.com

সমস্ত বুঝে নিয়ে চাবি বন্ধ ক'রে চ'লে যায়; অবশ্য জিনিসপত্র যে তারা স্থানান্তরিত করে তা নয়, সমস্তই মন্দিরের মধ্যে থাকে, তবে তারা একবার পরীক্ষা ক'রে দেখে মাত্র! এতদ্ভিন্ন বৎসর বৎসর যে লাভ হয় তা মোহান্তরই প্রাপ্য। মোহান্ত আমাকে কেন ডাকলেন, তা বুঝতে পাল্লুম না; স্বামীজিকে আমার সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ কল্লুম, কিন্তু তিনি কোথাও যাওয়া পছন্দ করেন না, সুতরাং আমি চল্লুম। একটা বড় ঘরের ভিতর একটা উঁচু গদীর উপর কতকগুলি তাকিয়ার মধ্যে স্থূলদেহ মধ্যবয়সী মোহান্ত-মহারাজ ব'সে আছেন, চারিদিকে ফরাসের উপর অন্যান্য লোক আছে; কেহ বাক্স সম্মুখে নিয়ে ব'সে আছে, কারও কাছে কতকগুলি খাতাপত্র, কেহ নিস্পরোয়া ভাবে ধূমপান ক'চ্ছে; দুই চার জন লোক এক পাশে ব'সে খোসগল্প আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। মনে করেছিলুম, বুঝি বিভূতিভূষিত-অঙ্গ, ব্যাঘ্রচর্মাসন, কমণ্ডলুধারী, রুদ্রাক্ষশোভিত যোগীবরকে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে উপবিষ্ট দেখবো, চারিদিকে পূজার্চানার দ্রব্য এবং সংযত ও ধর্মালোচনাতৎপর বিনীত শিষ্যমণ্ডলী দেখা যাবে। কিংবা ইনি নারায়ণের সেবাইত; বিভূতি ব্যাঘ্রচর্ম রুদ্রাক্ষ পরিবেষ্টিত যোগী না দেখি, বৈষ্ণবের মত একটা মানুষ নিশ্চয়ই দেখতে পাবো; কিন্তু দুঃখের সঙ্গে ব'লতে হচ্চে, সে আশায় ভারি নিরাশ হলুম। মোহান্তের আফিসে উপস্থিত হয়ে যে দৃশ্য দেখলুম, বড়বাজারের কুঠিয়াল কি মাড়োয়ারী মহাজনের গদীর সঙ্গেই তার তুলনা হ'তে পারে। একটু সম্ভ্রম, একটু বিনয়—কোন ভাব এখানে নেই; যেন ধর্ম শুধু ভান মাত্র, ব্যবসা করাই এ সমস্ত অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। দেবতার দ্বারে হৃদয়ের দেবভাব অপেক্ষা অর্থের খ্যাতি, অর্থের সম্মান, প্রেম ভক্তি বিনয় প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক অধিক। যেখানে অপার্থিব দেবমাহাত্ম্যের উপর তুচ্ছ সংসারের কোলাহল এবং হীনতা প্রতিষ্ঠিত, সেখানে দেবমর্যাদা বিড়ম্বিত।

আমি মোহান্তের সম্মুখে উপস্থিত হবামাত্র "আইয়ে বাবু সাব" ব'লে মোহান্ত অভিবাদন ক'ল্লেন। সকলেই সরে' সরে' আমার জন্য একটা জায়গা ক'রে দিলে। আমি মোহান্তের অনুমতিক্রমে একপাশে উপবেশন কল্লুম; মোহান্ত মহারাজ গল্প করতে লাগলেন। তাঁর গল্পে বাজে কথাই বেশী, ধর্মপ্রসঙ্গে তাঁর তেমন আগ্রহ দেখলুম না, বরং সে সম্বন্ধে কিছু ব'ল্লে তিনি কৌশলক্রমে কথাটা উল্টে দিতে চেষ্টা কল্লেন। সুতরাং অন্যান্য স্থানের মোহান্তেরা যে শ্রেণীর লোক, ইনিও যে সে শ্রেণীর বেশী উপরে, তা মনে করবার বিশেষ কোন কারণ দেখলুম না! যোশীমঠ সম্বন্ধে কথা হ'লে তিনি এই ব'ল্লেন, উক্ত মঠ শঙ্করাচার্য স্বামীজিরই প্রতিষ্ঠিত। যোশীমঠে দু'চারখানি পুস্তক আছে, তার কোন কোনখানি পাঠোপযুক্ত এবং তা হ'তে অনেক পুরাতন তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে; কিন্তু সে জন্য কষ্ট স্বীকার করে, এমন লোক প্রায়ই দেখা যায় না; সুতরাং পুস্তকগুলিতে যে সত্য সংগুপ্ত আছে, তা শীঘ্রই চিরবিলীন হ'য়ে যাবে। মোহান্তের কাছে যে বিশেষ কিছু প্রত্যাশা নেই, তা তাঁর কথার ভাবেই বুঝতে পাল্লুম।

এই সমস্ত কথাবার্তা শেষ হ'লে তিনি আমাকে ডাকবার কারণ ব'ল্লেন। তিনি ব'ল্লেন যে, মন্দিরটি জীর্ণ হ'য়ে গেছে; এখন হ'তে যদি জীর্ণ-সংস্কার না করা হয়, ত হিন্দুর একটি প্রধান কীর্তি লোপ হবে। তাই তিনি জীর্ণ সংস্কারের কাজ আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। কিন্তু এই কাজে বহু অর্থের প্রয়োজন, বিশেষ এদিকে তেমন বড়লোক বেশী আসেন না, অন্য লোকের দৃষ্টি নেই, সুতরাং মোহান্ত মহাশয়ের ইচ্ছা ছোট বড় সকলের কাছে

www.pathagar.com

চাঁদা সংগ্রহ ক'রে হিন্দুর এই তীর্থকে বজায় রাখেন। এ সমস্ত কথা মোহান্ত একা ব'ল্লেন না, তাঁর মোসাহেবরাও অনেক কথা ব'ল্লেন। সমস্ত কথা শেষ হ'লে মোহান্ত মহাশয় একখানি চাঁদার খাতা বের ক'রে আমার হাতে দিলেন। আমি খাতাটি উল্টে পাল্টে দেখে মোহান্তের হাতে ফেরত দিলুম, এবং দীনতা জানিয়ে ব'ল্লুম আমার অবস্থানুসারে যথাযোগ্য দিতে প্রস্তুত আমি ; কিন্তু আমাদের কাছে যে কিছু টাকাকড়ি আছে তা অতি সামান্য, তা এই দীর্ঘ পাথেয় হিসাবেই যথেষ্ট নয়,—সুতরাং তা হ'তে কিছু দান খয়রাত করা যায় না ; তবে শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরের একখানা পাথর গাঁথবার খরচের যদি সাহায্য করতে পারি, তা হ'লেও আমার অর্থ সার্থক! আমি পাঁচটি টাকা দিলুম। মোহান্ত মহাশয় বল্লেন, "ফরাসী হরফমে মৎ লিখিয়ে, আংরেজিমে দস্তখত কর দেনা", তিনি মনে ক'রেছিলেন, আমি যখন বাবু, তখন আমি ইংরাজী ফার্সি উভয় বিদ্যাতেই পারদর্শী। কিন্তু আমি ত আর ফার্সি জানিনে, আমি বল্লুম নাগরীতে দস্তখত করি ; কিন্তু এ কথা শুনে মোহান্ত ব্যস্তভাবে ব'ল্লেন "নেহি নেহি বাবু, আংরেজী লিখ্‌নেসে দস্তখৎ কি কদর যাস্তি হোগা।" বুঝলুম ইংরাজী দস্তখতের মান বেশী। মোহান্তের এই এক কথাতে আরও অনেক বিষয় বুঝতে পাল্লুম। ইংরাজীতেই নাম সহি ক'রে সেখান থেকে বের হ'লুম।

www.pathagar.com

৩০শে মে, শনিবার।—মন্দির মেরামতের জন্য পাঁচ টাকা দান ক'রে এবং সেই দানের কথা ইংরাজী অক্ষরে নাম সহি দ্বারা খাতাভুক্ত ক'রে বদরিনাথের প্রধান পাণ্ডা—মহাত্মা শঙ্করাচার্যের শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধির নিকট হ'তে বিদায় গ্রহণ কল্লুম। সে সময়ে মনে একটা বড় আক্ষেপ জেগে উঠেছিল। কোথায় সেই জ্ঞান এবং ধর্মের অবতার মহাপণ্ডিত, নরদেবতা শঙ্করাচার্য—আর কোথায় ঘোর সংসারী, বিষয়াসক্ত, পাণ্ডিত্যহীন, ব্যসননিরত এই সর্দার-পাণ্ডা। মহান হিমালয়ের অভ্রভেদী উচ্চতা হ'তেও সমুচ্চ মহত্ত্ব ও জ্ঞান একদিকে, আর ক্ষুদ্র ধূলিকণা হ'তেও ক্ষুদ্রতর এই পাণ্ডাপুত্রটির আত্মাভিমান এবং ক্ষমতা-দর্প আর একদিকে ; এ দুয়ের মধ্যে তুলনা হয় না, কিন্তু তবু উভয়ের অবস্থান তুলনার উপযোগী। বাস্তবিক যাঁর উৎসাহের তেজে পৃথিবীপ্লাবিত বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হ'তে নির্বাসিত হ'য়েছিল, হিন্দুধর্মের সংস্কারে বদ্ধপরিকর হ'য়ে যিনি সমস্ত হিন্দুজাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হ'য়ে গেছেন, এবং সকলের অশান্ত আকুল হৃদয় গভীর আশাভরে যাঁর উপর নির্ভর ক'রে শান্তিলাভ ক'রেছিল, সেই শঙ্কর ও তাঁর এই পাণ্ডা, এ উভয়ে এক জাতীয় জীব, তা বিশ্বাসই হয় না। শঙ্করাচার্যের দুর্ভাগ্য—এরা সকলে আসন কলঙ্কিত ক'রচে। এই স্থানের সম্বন্ধে পরে যে সকল কথা শুনেছি, তা আর কাগজে কলমে লেখা যায় না, এমনই অপবিত্র কথা! তীর্থস্থানের অধিনায়কগণের কথা অনেকেই শুনেছেন ; দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত অর্থ কিরূপে অযথা ব্যয়িত হয়, তার নূতন দৃষ্টান্ত প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন। চক্ষের সম্মুখে আজও কলিকাতার প্রধান বিচারালয়ে অকারণে রাশি রাশি অর্থ জলস্রোতের মত ভেসে যাচ্ছে। দুঃখ-পাপ-তাপক্লিষ্ট শত শত নরনারী তাহাদের বহু কষ্টে উপার্জিত অর্থের দুই একটি পয়সা বাঁচিয়ে তাই নিয়ে তীর্থদর্শন করতে যায়, দেবচরণে সেই কষ্টোপার্জিত অর্থ দিয়ে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে ; আর মঠের অধিকারী মহাশয়েরা বিলাস-লালসা তৃপ্তির জন্য সে অর্থ যা খুশী তাতে ব্যয় করেন।

বাইরে এসে দেখি স্বামীজি ও বাবাজি আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রছেন। এইবার আমাদের মধ্যে প্রথম কথা উঠলো, এখন কোথায় যাওয়া যায়? বাস্তবিকই এবার আমাদের নিরুদ্দেশ-যাত্রা। যেখানে ও যে পথে লোক যায়, এত দিনে আমরা তা শেষ কল্লুম ; এইবার হ'তে এক নূতন পথে যেতে হবে। সে পথে কখন লোক চলে না, এবং যাত্রী দলও সে পথে যেতে আগ্রহ করে না। এই নূতন পথ দিয়ে আমাদের ব্যাসগুহা দেখতে যেতে হবে। নূতন পথে চলতে একজন পাণ্ডার সাহায্য লওয়া ভাল, স্থির ক'রে একবার লছমীনারায়ণ পাণ্ডার খোঁজ করা গেল। সে পূর্বদিন রাত্রেই বদরিকাশ্রমে এসে সশরীরে হাজির হ'য়েছে। লছমীনারায়ণ দেবপ্রয়াগে আমাদের ভরসা দিয়েছিল যে শীঘ্রই সে নারায়ণ মন্দিরে এসে পৌঁছিবে ; কিন্তু, এত শীঘ্র আসবে তা একদিনও আমাদের মনে হয় নি! তার এত তাড়াতাড়ি আসবার কারণ জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পাল্লুম, নারায়ণ দর্শন জন্য যে ব্যাকুল হ'য়ে সে এসেছে তা নয়, কাশীনাথ জ্যোতিষী মহাশয় তার একজন সম্ভ্রান্ত যজমান ; তাঁর কাছে বিলক্ষণ দশ টাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা, কিন্তু "রামনাথ কি চাচীর" দ্বারা সে কাজটা যথাবিহিত সম্পন্ন হবে, লছমীনারায়ণের সে আশা ছিল না ; তাই সে প্রাণপণে হেঁটে এসেছে। জ্যোতিষী মহাশয় সেই রাত্রেই বদরিনাথ পৌঁছেছেন। আমরা

www.pathagar.com

তাঁকে পাণ্ডুকেশ্বরে রেখে এসেছিলুম ; তার পর আমরা ঘুরতে ঘুরতে আসছি, তিনি বাহকস্কন্ধে নির্ভাবনায় আসছিলেন ; সুতরাং আমাদের আগেই তাঁর এখানে পৌঁছিবার সম্ভাবনা বেশী ছিল।

আমাদের সঙ্গে ব্যাসগুহা পর্যন্ত যাইবার জন্য লছমীনারায়ণকে বলা গেল ; কিন্তু এ প্রস্তাব সে অস্বীকার ক'ল্লে ; ব'ল্লে, তার অনেক যাত্রী রাত্রে এসেছে, পরদিন সকালেও অনেকে এসে পৌঁছবে। এ রকম অবস্থায় তাদের নারায়ণ দর্শনের বন্দোবস্ত না ক'রে সে আমাদের সঙ্গে কি রকম ক'রে অতদূর যায়। এ ছাড়া ব্যাসগুহা তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ; এবং এ পর্যন্ত কোন যাত্রী সে পথে অগ্রসর হয় নি। বিশেষ ব্যাসগুহা একটা তীর্থ ব'লে গণ্যই নয়। তার কথায় মন কেমন দমে গেল। কিন্তু এখান থেকে ফিরে যাওয়া হ'চ্ছে না ; আর খানিকটা যেতেই হবে, সুতরাং এইপথেই যাওয়া ভাল। স্বামীজি ও আমি এই রকম সিদ্ধান্ত ক'রে ফেল্লুম। বৈদান্তিক ভায়ার সাংসারিক আকর্ষণ কিছু ছিল ব'লে বোধ হয় না, কিন্তু এ পথে অগ্রসর হ'তে তিনি বিষম নারাজ ; আমার ও স্বামীজির মতলব শুনে তিনি ভারি চটে উঠলেন ; ব'ল্লেন, পাণ্ডারা যে পথ চেনে না তীর্থযাত্রীরা যে স্থানকে তীর্থের হিসাবে নগণ্য মনে করে, সেখানে এত কষ্ট ক'রে যাবার কি দরকার? শরীরকে শুধু শুধু কষ্ট দেওয়াই যদি অভিপ্রেত হয়, তবে তার অনেক উপায় আছে। আমি ভায়ার উপর রাগ ক'রে ব'ল্লুম, "তুমি বৃথা তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্যে এতকাল অতিবাহিত ক'ল্লে। শুধু যাত্রীনির্দিষ্ট তীর্থে ঘুরে মন্দির এবং ঠাকুর দেখেই কি তুমি তোমার জীবনকে ধন্য এবং হৃদয়কে পরিতৃপ্ত বোধ কর? এই হিমালয়ের মহান গম্ভীর শান্তিপূর্ণ ক্রোড়ের মধ্যে কি এমন কোন তীর্থ নেই, যাকে যাত্রীদের দেবতা এবং দেবমন্দিরে পবিত্র ও বিখ্যাত না ব'ল্লেও প্রকৃতির বিচিত্র শোভা এবং শান্তির কোমল উৎসে তা সমলঙ্কৃত?" বক্তৃতার দ্বারা ভায়াকে বিলক্ষণ বাধ্য করা গেল সুতরাং অবিলম্বেই তিনি আপত্তি ত্যাগ ক'ল্লেন।

আমাদের যখন এইরকম তর্কবিতর্ক চলছিলো, সেই সময় সেখানে দু'চার জন প্রৌঢ় পাণ্ডা উপস্থিত ছিলেন। আমরা ব্যাসগুহা দেখবার জন্য উৎসুক হ'য়েছি শুনে তাঁরা সকলেই ভারি বিস্ময় প্রকাশ ক'রে ব'ল্লেন, সেখানে যাবার কোন রকম বন্দোবস্ত নেই ; অলকানন্দা পার হ'তে হবে, কিন্তু কোথাও সাঁকো নেই ; নদী জমে শক্ত হ'য়ে গিয়েছে ; তারই উপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে কোন রকমে পার হ'তে হবে। হঠাৎ একটা চাপ ব'সে গিয়ে সবশুদ্ধ ডুবে যাওয়ার কিছুমাত্র আটক নেই! একজন পাণ্ডা ব'ল্লেন, কিছু দিন আগে একজন অলকানন্দা পার হ'তে গিয়ে বরফ ভেঙে ডুবে গিয়েছিল। অতএব সেখানে যখন দেখবার যোগ্য কিছু নেই, তখন এত কষ্ট করে যাবার কি আবশ্যক? আমরা কিন্তু এ যুক্তিতে কর্ণপাত কল্লুম না, এবং বলা বাহুল্য এইরকম যুক্তি অনুসারে চ'ললে, আর এত দূর পর্যন্ত অগ্রসর হবার সম্ভাবনা থাকতো না। বরাবর এই একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখে আসা যাচ্ছে যে, যে সমস্ত যাত্রী তীর্থভ্রমণ ক'রতে আসে, তারা শুধু দেবমন্দির ও দেবতা ছাড়া আর কিছুতেই মনোনিবেশ করে না। হয়ত তারা সেটা বাহুল্য জ্ঞান করে ; না হয়, একমনে, একপ্রাণে অভীষ্ট দেবতার চিন্তাতেই তারা তন্ময় হ'য়ে থাকে, এবং তাতেই তারা এমন নিবিষ্টচিত্তে পথ চলে যে, চতুর্দিকে আর যা কিছু দেখবার আছে, তার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপের অবসর পায় না। এ পর্যন্ত কত তীর্থযাত্রীর সাথে দেখা হ'ল ;

www.pathagar.com

তারা বাহ্যপ্রকৃতির সৌন্দর্য, চতুর্দিকের অভিনব দৃশ্যরাজির বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কোন কথাই বলে না।

যাহা হউক, আপাততঃ ব্যাসগুহার উদ্দেশেই রওনা হওয়া গেল। বদরিকাশ্রম ত্যাগ ক'রে চ'লতে আরম্ভ কল্লুম। তিনটি প্রাণী পূর্ববৎ চলছি বটে, কিন্তু পথ অনির্দিষ্ট, অধিকতর দুর্গম এবং একান্ত নির্জন। চ'লতে চ'লতে ক্বচিৎ যদি কোন লোকের সঙ্গে দেখা হয় ত পথের কথা জিজ্ঞাসা ক'ল্লে সে একটু অবাক হ'য়ে আমাদের দিকে চেয়ে থাকে ; তার পর বলে, "ইস্ তরফ কৈ জায়গা পর হোগা, মালুম নেহি," সুতরাং অন্য লোকের কাছে পথের সন্ধান জানার আশায় নিরাশ হ'য়ে আমরা নির্বাক ভাবে এবং কতকটা সন্দিগ্ধচিত্তে অলকানন্দার ধারে ধারে চ'লতে লাগলুম। আগে পাছে সেই উন্নত পর্বতশ্রেণী তুষারাচ্ছন্ন, বন্ধুর, তরুতৃণহীণ ; পর্বতের অন্ত নেই ; মধ্যে শুধু সংকীর্ণ অধিত্যকা ভেদ ক'রে অলকানন্দা অস্ফুট শব্দে ছুটে চলেছে এবং তার কম্পিত জলপ্রবাহ কঠিন প্রস্তরভিত্তিতে এসে ধীরে ধীরে আঘাত ক'রচে। ক্রমে বরফের স্তূপ আবার দৃশ্যমান হ'য়ে পড়লো। অলকানন্দার জলধারা অদৃশ্য হ'য়ে এলো ; অবশেষে বরফের নদী ভিন্ন আর কিছুই দেখা গেল না। কঠিন বরফরাশিতে নদীগর্ভ সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন।

অনেকক্ষণ চলার পর আমরা তুষারাচ্ছন্ন নদীতীরে এসে দাঁড়ালুম। চারিদিকে শুধু ধূ ধূ ক'রছে। নিম্নে ঊর্ধ্বে যে দিকে চাই কেবল বরফ ; পথের চিহ্ন নেই, নদীর চিহ্ন নেই, গন্তব্য স্থান কোন্ দিকে ঠিক নেই, দিঙনির্ণয়ের পর্যন্ত উপায় নেই। আমরা তিনজনেই দিগ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে বরফনদীর তীরে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলুম। যে দিক থেকে আমরা এসেছি, সে দিক ঠিক আছে—এখনও ফিরে যেতে পারি। অনির্দিষ্ট বিপদের মুখে প্রবেশ করবার পূর্বে আর একবার ভেবে দেখলুম ; তারপর ভগবানের নাম স্মরণ ক'রে নদী পার হওয়াই স্থির ক'ল্লুম।

ব্যাসগুহা যে কোথায়, তা এখনও পর্যন্ত স্থির হয়নি। স্বামীজির বিশ্বাস, আমাদের সম্মুখের পর্বতের গায়েই নিশ্চয়ই ব্যাসগুহা দেখতে পাওয়া যাবে। স্বামীজির অনুমানের উপর নির্ভর ক'রেই নদী পার হ'তে প্রবৃত্ত হ'লুম। এখানে নদী পার হওয়া বড়ই দুঃসাহসের কাজ। আগেই ব'লেছি, নদীর উপর কোন সাঁকো নেই, তার উপর কোন স্থানে বরফ কি অবস্থায় আছে তা নির্ণয় করা দুরূহ। আমরা যে বরফরাশির উপর দাঁড়িয়ে আছি, তার নীচেই যে নদী নেই তারই বা ঠিক কি? অতএব আর বেশী চিন্তা না ক'রে তাড়াতাড়ি চ'লতে লাগলুম। বৈদান্তিক তার দীর্ঘ পার্বত্য-যষ্টি হস্তে পথিপ্রদর্শক হ'লেন। এক এক পা অগ্রসর হন, আর যষ্টিগাছটি বরফে বসিয়ে দিয়ে জমাট বরফের গভীরতা পরীক্ষা করেন। আমিও বৈদান্তিকের সঙ্গে সঙ্গে চ'লতে প্রস্তুত হ'লুম, কিন্তু স্বামীজি আমাকে ভারী ধমক দিয়ে হটিয়ে দিলেন, এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চ'লতে অনুমতি ক'ল্লেন ; আরো ব'ল্লেন, যদি আমি তাঁর কথার অবাধ্য হই, তবে তিনি তখনই সেখান হ'তে ফিরে যাবেন ; আমার মত উচ্ছৃঙ্খলমতি বালকের সঙ্গে তাঁর চলা পুষিয়ে উঠবে না। আমি হাস্যমুখে তাঁকে নির্ভয় হ'তে ব'ল্লুম। কিন্তু তিনি পুনশ্চ ভয় দেখিয়ে ব'ল্লেন, হঠাৎ আমার পা দু'টো আমার অজ্ঞাতসারে বরফের মধ্যে ব'সে যেতে পারে, তখন পা টেনে তোলা তাঁদের দু'জনের সাধ্যায়ত্ত হবে না। অগত্যা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চ'লতে লাগলুম, বুঝলুম স্বাধীনতা না থাকলে স্বর্গেও সুখ নেই, কিন্তু স্বামীজির স্নেহ-কোমল ভর্ৎসনায় মনে

www.pathagar.com

অধীনতার সন্তাপ স্থান পায় না। আসল কথাটা এই আমরা যে নদীর উপর দিয়ে চ'লে যাচ্ছি, সেই নদী যে কোন মুহূর্তে আমাদিগকে তার হৃদয়ে চিরদিনের জন্য আশ্রয় দিতে পারে। আমি আগে গেলে আমিই আগে মারা যাবো, এই ভয়ে স্বামীজি আগে গেলেন ; —নিজের জীবন সঙ্কটাপন্ন ক'রে তিনি আমাকে বাঁচাবেন ব'লেই তাঁর এই ভর্ৎসনা! হায় সন্ন্যাসী, কি মায়ার বাঁধনেই তুমি আটকে প'ড়েছ!

সেই তুষারাচ্ছন্ন নদীর পরিসর কতখানি তা জানা নেই, সুতরাং আমাদের সকলকে অতি সন্তর্পণে পদক্ষেপ ক'রতে হ'লো। অনেকক্ষণ হ'তে চলছি, এতক্ষণ হয় ত নদী পার হয়ে পর্বতের কঠিন প্রস্তরের উপর দিয়ে চলছি, কিন্তু তবু সতর্ক হ'য়ে যেতে হ'চ্ছে। আমি লক্ষ্য ক'রে দেখলুম বৈদান্তিক এবং স্বামীজি দু'জনেই বেশ স্বচ্ছন্দভাবে চ'লে যাচ্ছেন, তাঁদের আকারপ্রকারে এবং গতিতে ভয়ের কোন চিহ্ন দেখা গেল না ; কিন্তু স্বীকার ক'রতে লজ্জা নেই, আমার মনে বিলক্ষণ ভয়ের সঞ্চার হ'চ্ছিল। সংসারের বন্ধন কাটিয়েছি, সন্ন্যাস অবলম্বন করা গেছে, পৃথিবীতে সুখ নেই, এবং বেঁচে থাকবার যে কিছু প্রলোভন তাও দূর হ'য়েছে ; কিন্তু তবুও জীবনের মায়া বিসর্জন দিতে পারি নি। যার কোন কাজ নেই, সেও জীবনটাকে মূল্যবান মনে করে। জীবন বিসর্জন দেওয়া সহজ ব'লে মুখে যতই আস্ফালন করি না কেন, যখন বিপদের মেঘ চারিদিকে ঘন হ'য়ে আসে এবং সংসারের উন্মত্ত তরঙ্গ ফেনিল হ'য়ে উঠে, তখন আমরা নিরাশ্রয় হাত দু'খানি কৃতাঞ্জলিবদ্ধ ক'রে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি ; তখন আমরা বুঝতে পারি, আমরা শুধু কাপুরুষ নই, ভগবানের চিরমঙ্গল ইচ্ছার উপর নির্ভর ক'রতেও আমরা অশক্ত ; আমরা দুর্বল এবং বিশ্বাসহীন।

অনেকক্ষণ পরে একটা চড়াইয়ের উপর উঠা গেল, তখন নির্ভয় হলুম, কারণ সেটা আর নদীগর্ভ হ'তে পারে না। পাহাড়ের উপরে উঠে অনেক অনুসন্ধানেও ব্যাসগুহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। চারিদিকে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজতে লাগলুম, কিন্তু কোথাও গুহার নামও নেই। ছোট ছোট দু'একটি গুহা থাকলেও তা বরফে ঢাকা। পাহাড়ের পর পাহাড়, শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ, এই রকম বহুদূর চলে গেছে। অনেক অনুসন্ধানের পর একটা উঁচু জায়গা দেখা গেল ; পাহাড়ের অনেকখানি ঘুরে বহু কষ্টে সেই উঁচু জায়গাটাতে উঠলুম। স্বামীজি শুনেছিলেন, বরফাচ্ছন্ন পর্বতের মধ্যে ব্যাসগুহার সম্মুখে কিছুমাত্র বরফ নেই, সে জায়গাটা শৈবালদলে সমাচ্ছন্ন। এই স্থানে উপনীত হবামাত্র সেই দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে গেল, সুতরাং আমরা সহজেই বুঝতে পাল্লুম, এ জায়গাটাই ব্যাসগুহার সম্মুখভাগ। এত ভয়, উদ্বেগ এবং পরিশ্রমের পর আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু আবিষ্কৃত হ'লো দেখে আমরা অত্যন্ত আনন্দ বোধ কল্লুম। বাঙ্গালীর ছেলে লিভিংস্টোন, স্টানলের মত বিপদসঙ্কুল অনাবিষ্কৃত দেশ আবিষ্কার করিনি এবং জীবনে সে আশাও নেই, কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে অন্ধভাবে রাস্তা হাতড়ে ব্যাসগুহায় উপস্থিত হওয়াতে আমার মনে ভারি অহঙ্কারের সঞ্চার হ'লো। মনে ক'রতে লাগলুম, দায়ে প'ড়লে আমরাও লিভিংস্টোন, স্টানলের মত একা একটা বৃহৎ কাজ করে ফেলতে পারি। সমস্ত বিশ্ব-সংসারের লোক তখন বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে এই বঙ্গবীরের দিকে চেয়ে কি ভাবে, তা কল্পনা ক'রে বেশ আরাম বোধ হ'লো এবং অনেকখানি আত্ম-প্রসাদও ভোগ করা গেল।

ব্যাসগুহার সম্মুখের প্রাঙ্গণটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, একটা ছোট অনাবৃত উঠানের

www.pathagar.com

মত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এখানে বিন্দুমাত্র বরফ নেই, অথচ আশেপাশে স্তূপাকার বরফ। সেই ঋষিশ্রেষ্ঠের কোন্ মায়ামন্ত্রবলে চিরদিনের জন্যে এখান থেকে বরফরাশি তিরোহিত হ'য়েছে, তা আমাদের মত ক্ষুদ্র মানব-বুদ্ধির অগম্য। আমরা অবাক হ'য়ে তার কারণ খুঁজতে লাগলুম, কিন্তু কোন কারণই নির্দেশ করতে পাল্লুম না। এই বরফহীন গুহাপ্রাঙ্গণটি যে নীরস কালো পাথরমাত্র, তা নয় ; পাথরের উপর ক্রমাগত জল প'ড়লে যেমন একরকম সবুজ পাতলা শেওলা জন্মে, এখানে তেমনি জন্মিয়ে আছে। আর শৈবালদল পাতলা নয়, গালিচার আসনের মত পুরু ; তার রং বড় চক্ষুতৃপ্তিকর, বিশেষতঃ তার মধ্যে আবার ছোট ছোট লাল ও শাদা ফুল ফুটে প্রকৃতির হস্তনির্মিত সেই আসনখানিকে আরও সুন্দর এবং প্রীতিকর ক'রে তুলেছে।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমরা সেই মনোহর আসনখানির দিকে চেয়ে রইলুম। সেই পুরু শৈবালরাশির উপরে খুব ছোট ছোট লাল ও শাদা ফুল ফুটে রয়েছে, তাতে আসনখানিকে মণিমুক্তাখচিত ব'লে বোধ হচ্ছে। এমন আশ্চর্য দৃশ্য আর কখন দেখেছি ব'লে মনে হ'লো না। এরকম জিনিস আমার কাছে এই নূতন। আমার সঙ্গে কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত থাকলে হয়ত এই বরফরাজ্যে এ রকম প্রাকৃতিক-বৈচিত্র্যের কারণ অবগত হবার জন্যে চেষ্টা করতেন এবং হয়ত কৃতকার্যও হ'তে পারতেন ; কিন্তু আমরা কেহই বৈজ্ঞানিক নই ; কোন একটা সুন্দর জিনিস দেখলে তাকে বিশ্লেষণ না ক'রে তার সৌন্দর্য উপলব্ধি ক'রেই কেবল আমরা আনন্দিত হই। জ্যোৎস্না-পুলকিত শুভ্র শারদ যামিনীতে পূর্ণচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রে ক্ষুদ্র শিশু হ'তে প্রেমিক কবি পর্যন্ত সকলেই সুখ এবং তৃপ্তি অনুভব করে। চন্দ্র কি বস্তু, দূরবীক্ষণ যন্ত্রে তাকে পর্যবেক্ষণ ক'ল্লে তার মধ্যে কতকগুলি পর্বত, সাগর এবং মরুভূমি আবিষ্কার করা যায়, তা বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়, কিন্তু তাঁর এই গবেষণাজনিত আনন্দ, শিশু ও কবির আনন্দ অপেক্ষা অধিক কি না তা কে বলবে? ইদানীং বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করবার চেষ্টা ক'রছেন যে, মঙ্গলগ্রহে মনুষ্য অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর জীবের বাস আছে। সেই সকল অপার্থিব প্রাণী ক্রমাগত লাল আলো দেখিয়ে আমাদের পৃথিবীর মনুষ্যের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার চেষ্টা ক'রছে আর একজন কবি হয়ত সেই মঙ্গল গ্রহকে অনন্ত গগনোদ্যানের একটি লোহিতকুসুম ব'লে বিশ্বাস ক'রেই সন্তুষ্ট। হয় ত এ ভ্রম ; কিন্তু কত সময় আমরা ভ্রান্তিতেই সন্তুষ্ট থাকি। আমাদের মত উদ্দেশ্যহীন জীবনের সুদীর্ঘ যাত্রাটাই কি ভ্রম নয়? কিন্তু এ ভ্রম বিদূরিত করবার জন্য আমরা কিছুমাত্র ব্যস্ত নই, বরং যখন একটা ভ্রম দূর হ'য়ে যায়, আমরা স্বপ্ন হ'তে হঠাৎ জেগে উঠি এবং কঠোর সত্যের অতিপরিস্ফুট কঠিন শিলাতলে নিক্ষিপ্ত হই, তখন শান্তির আশায় আর একটা অভিনব ভ্রমের কুহক রচনার জন্য আমাদের প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠে।

যা হ'ক, এ দার্শনিক তত্ত্ব এখানে থাক। ব্যাসদেবের আসন দেখতে দেখতে মাথার মধ্যে এতখানি দার্শনিক ভাব জাগিয়ে তোলা অনেকেরই নিকট বাহুল্য বোধ হ'বে। আসন-দর্শন ত্যাগ ক'রে আমরা তিনজনেই গুহার মধ্যে প্রবেশ ক'ল্লুম। ব্যাসগুহার নাম শুনে ভেবেছিলুম, এ বুঝি একটা ছোট গুহা ; তার মধ্যে ব্যাসদেব এবং বড় জোর তাঁর লোটা কম্বল ধ'রতে পারে ; কিন্তু গুহায় প্রবেশ ক'রে দেখতে পেলুম সে এক প্রকাণ্ড গহ্বর, তার মধ্যে এক-শ দেড়-শ লোক অনায়াসে ব'সতে পারে ; তার মধ্যে বিস্তীর্ণ দেওয়াল,

www.pathagar.com

তাতে যুগান্তের কালী ও ধোঁয়ার দাগ লেগে আছে। ব্যাসদেবের গুহা, কাজেই এখানে যাগযজ্ঞের অভাব ছিল না, এ হয়ত তারই ধোঁয়ার চিহ্ন! আমি কল্পনাচক্ষে মহাভারতীয় যুগের হোম যজ্ঞ সমাকীর্ণ এই সুবিস্তীর্ণ আশ্রমে একটি শান্তিপূর্ণ পবিত্র তপোবনের চিত্র দেখতে পেলুম। শুনেছি থিয়োজফিস্ট মহাশয়েরা বলেন, এক একটা জায়গায় বৈদ্যুতিক হাওয়া খুব ভাল ; সেই সেই জায়গা হিন্দুদিগের তীর্থস্থান। এ কথাটা কতদূর সত্য তা জানি নে। এ জায়গাটা যদিও তীর্থের লিস্ট হ'তে নিজের নাম খারিজ করেছে, তবু যে শান্তি পবিত্রতা ও স্বর্গীয়ভাব এই গিরি-অন্তরালে সংগুপ্ত আছে, অনেক তীর্থে তা একান্তই দুর্লভ। আমরা গুহার মধ্যে অনেকক্ষণ ব'সে হইলুম, পৌরাণিক স্মৃতির তরঙ্গ আমাদের প্লাবিত ক'রতে লাগলো! এমন স্থানে এসে কি গান না ক'রে থাকা যায়? স্বামীজি আমাকে গান ক'রতে অনুরোধ ক'ল্লেন, এবং নিজেই আরম্ভ ক'ল্লেন—

"মিটিল সব ক্ষুধা, তাঁহারই প্রেমসুধা,
চল রে ঘরে লয়ে যাই।"

পথশ্রমে এই দারুণ ক্লান্তির পর ভাঙা গলাতে গুহা প্রতিধ্বনিত করে এই গানটি বার বার গাওয়া গেল ; এমন মিষ্টি লাগলো যে, নিজেরাই মোহিত হ'য়ে পড়লুম। যাঁরা ভাল গায়ক তাঁরা এখানে গান আরম্ভ ক'ল্লে বুঝি পৃথিবী স্বর্গ হ'য় যায়! আমি দুই এক পাল্টা গেয়ে ছেড়ে দিতে চাই, স্বামীজি আবার আর একটি গান আরম্ভ করেন। আমাকে আবার গাইতে হয়, তাঁর ক্ষুধা যেন আর মেটে না ; শেষটা তাঁকে দেখে বোধ হ'লো, তাঁর যেন কিছুতেই তৃষ্ণা মিটলো না।

আমরা এইভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিলুম। বেলা একটা বেজে গেল ; আর বেশী দেরি ক'রলে পথে কোন বিপদে প'ড়তে পারি মনে ক'রে আবার উঠে প'ড়লুম! তবু কি সেখান থেকে উঠতে ইচ্ছা করে? আর সেখানে আসবো সে আশা নেই ভেবে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে স্থান থেকে বিদায় নিলুম। এমন কত স্থান হ'তে বিদায় নিয়েছি, ভবিষ্যতে আরও কিছু সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাব, এই আশাতেই এমন সকল স্থানের প্রলোভন ছাড়তে পেরেছি, নতুবা হয়ত চিরজীবন এই সকল পুণ্যদৃশ্যের কাছে প'ড়ে থাকতুম।

গুহা ত্যাগ ক'রে তিন জনে নদীতীরে এলুম। যে রাস্তা দিয়ে নদী পার হ'য়েছিলুম, তার চিহ্ন মাত্র দেখা গেল না, সুতরাং আবার পূর্ববৎ সন্তর্পণ নদী পার হ'তে হ'ল, কিন্তু নদী পার হ'য়ে দেখি আমাদের পথ ভুল হয়ে গেছে। তখন ব্যাকুল হ'য়ে পথ খুঁজতে লাগলুম এবং তিন মাইলের জায়গায় সাত মাইল ঘুরে অপরাহ্ণ পাঁচটার পর বদরিকাশ্রমে পুনঃপ্রবেশ কল্লুম। আমাদের বিলম্ব দেখে পাণ্ডা বাবাজিরা আমাদের নামে খরচ লিখে বসেছিল ; আমাদের সশরীরে এবং সুস্থভাবে ফিরতে দেখে তারা খুব খুশী হ'লো এবং আমরা কি দেখলুম তা বলবার জন্য আমাদের অনুরোধ ক'ল্লে। লোকগুলো বুদ্ধিমান সন্দেহ নাই ; আমাদের এত কষ্টের অভিজ্ঞতা দু'টো বাহবা দিয়েই আয়ত্ত ক'রে নিতে চায়।

www.pathagar.com

বিশ্রাম

৩১ মে, রবিবার।—আজ ইংরেজী মাসের শেষ দিনে খৃস্টানদিগের বিশ্রামবারে ভগবানের অনুগ্রহে অখৃস্টান আমরাও বিশ্রাম গ্রহণ কল্লুম। এ পথে বদরিকাশ্রমই শেষ তীর্থ। তীর্থের তালিকার মধ্যে ব্যাসগুহার নাম নেই, তবুও আমরা সন্ধানে সন্ধানে সেখানে ঘুরে এলুম। এখন নিকটে বা দূরে আর কোন কাজ নেই। এতদিন কাজের মধ্যে ছিলুম ; ভাবনা চিন্তা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা কিছুতেই বড় ব্যাকুল ক'রতে পারে নি। যখন সঙ্কটাপন্ন বিপদরাশি পাষাণস্তূপের মত জীবনের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে, তখন সেই বিপদজাল হ'তে উদ্ধার হবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করা গিয়েছে। তারপর আর সে কথা মনে হয়নি। নূতন উৎসাহ নূতন বল এবং অপেক্ষাকৃত অধিকতর স্ফূর্তিতে নব নব পথে অগ্রসর হওয়া গেছে। ক্ষুধার সময় একমুষ্টি আহার জুটলো ভাল, না জুটলো পথ হতে দু'টো ফল মূল সংগ্রহ ক'রে আহার করা যেত, অথবা পরিপূর্ণ মাত্রায় উপবাস। নিদ্রার জন্যে কোন দিন কিছু আয়োজন করতে হয়নি, কিন্তু বিনা আয়োজনে, কি গিরিগুহা, কি অনাবৃত নদীতীর, কোথাও তাঁর শুভাগমনের ব্যাঘাত জন্মেনি। আজ একমাসেরও অধিক পূর্বে যে ব্রত মাথায় নিয়ে বদরিনাথের এই তুষার শৈলমণ্ডিত সুপবিত্র পীঠতল দেখতে অগ্রসর হ'য়েছিলুম—আজ তার শেষ। তাই আজ শ্রান্তিভরে হৃদয় ভেঙে পড়েছে, এতদিনে ঘুরে বেড়ালুম—যে আশায় এত দেশভ্রমণ, তার কিছুই পূর্ণ হ'লো না। প্রকৃতির দৃশ্য বৈচিত্র্যে সাধকের একান্ত সাধনায় শত শত ভক্ত-হৃদয়ের নিষ্ঠা ও ভক্তিতে যে মহান ভাব, যে পবিত্রতা যে একটা অব্যক্ত মাধুর্যের পরিচয় পেয়েছি, তা প্রকৃতই শান্তিপ্রদ ; কিন্তু সে শান্তি ক্ষণস্থায়ী ; হৃদয়ের অসীম পিপাসা তাতে প্রশমিত হয় না ; প্রাণের কঙ্কালসার জীর্ণ আবরণ ভেদ ক'রে একটা দুর্দমনীয় অতৃপ্তি এখনও হাহাকার ক'রছে। বিশ্বের সমস্ত সুন্দর জিনিস তাকে এনে দিচ্ছি সে একবার আগ্রহের সঙ্গে হাতে ক'রে নিচ্ছে, তার পর তুচ্ছ জিনিসের মত দূরে ফেলে দিচ্ছে। কতবার হয়ত পরশমণি এনে তার হাতে সমর্পণ ক'রে দিয়েছি, কিন্তু কাচখণ্ডের মত সে তা দূরে ফেলে দিয়েছে! হায় যদি সে একবার চিন্তে পারতো তা হ'লে হয় ত তার এই তৃষিত ক্রন্দন, এই জীবনব্যাপী দীর্ঘনিঃশ্বাস থেমে যেত।

আজ আর কোন কাজ নেই, আজ শুধু বিশ্রাম ক'রবো ভেবে বদরিকাশ্রমের শুভ্র তুষারমণ্ডিত ক্ষুদ্র উপত্যকার একখানি ছোট ঘরে কম্বল জড়িয়ে বেশ গরম হ'য়ে বসা গেল। কিন্তু চিন্তার আর বিরাম নেই ; আজ আবার পুরাতন সমস্ত কথা নূতন ক'রে মনে হ'তে লাগলো। বোধ হলো, জীবনটা আগাগোড়া একটা নাটক ; এক অংশের সঙ্গে আর এক অংশের কোন সংস্রব নেই ; যবনিকা প'ড়ছে এবং উঠছে ; আর আমি তারই মধ্যে কখন ছাত্র, কখন শিক্ষক, কখন সংসারী, কখন বৈরাগীর অভিনয় ক'রে যাচ্ছি। কেউ করতালি দিচ্ছে, কারও বা বুকে বেদনা এবং চোখে অশ্রুর সঞ্চার হ'চ্ছে ; জিজ্ঞাসা ক'রছে আর কত দূর? এ জীবন ট্রাজিডিতে আমিই পরিশ্রান্ত হ'য়ে প'ড়েছি, অন্যের ত দূরের কথা ; এখন এ পর্বতের প্রান্ত হ'তে দেহের বৃন্তটুকু থেকে জীবন খসে প'ড়লেই বুঝি নাটকাভিনয়ের অবসান হবে। জানি না কোথায় এর শেষ অঙ্কের সমাপ্তি। যেখানেই হ'ক আমার কিন্তু বিশ্রাম নিতান্ত দরকার হ'য়ে প'ড়েছে।

www.pathagar.com

শৈশবের কথা যৌবনের কথা একবার সেই রাজ্যের সুখ-কুঞ্জ পল্লীগ্রাম একবার যৌবনের কর্মবৈচিত্র্য-পূর্ণ কলিকাতা, ঘুরে ফিরে সেইগুলিই এই পাষাণ প্রাচীরবেষ্টিত হিমালয়ের উপত্যাকার মধ্যে আমার কর্মশ্রান্ত ক্লান্তহৃদয়কে আন্দোলিত ক'রতে লাগল। এই লোটা, কম্বল এবং সন্ন্যাস শুধু বিড়ম্বনা। হৃদয়ের সুখ দুঃখ লোটা-কম্বলে নিয়ন্ত্রিত হবার নয় ; যা ফেলে এসেছি, তাদের আসক্তি ও আকর্ষণ এখনও চিরনবীন। বাল্যকালে কোনদিন গৃহপ্রান্তে একটা খেজুর গাছ পুঁতে এসেছিলুম সে আজ শাখাবাহু বিস্তার ক'রে এখনও যেন আমাকে আহ্বান ক'রছে ; বাড়ির অদূরবর্তী গৌরী নদী—সকালে সূর্য উঠবার সময় তার চড়ার উপর বালিগুলি চিকচিক ক'রতো ; ছোট ছোট সঙ্গীদের সঙ্গে তারই উপর লাফালাফি ক'রে বেড়াতুম, সে যেন সে দিন! আবার বর্ষাকালে যখন সমস্ত চড়া ডুবে যেত, চড়ার উপরের বনঝাউগুলিকে নত ক'রে নদীর স্রোত চ'লতো তখন আমরা কতবার সেখানে সাঁতার কেটেছি ; পরিশ্রান্ত হ'লেই ঝাউগাছের আগা ধ'রে বিশ্রাম ক'রতুম এবং কদাচিৎ দূর থেকে মার গলার সাড়া পেলেই বাবলা গাছের সারের ভিতর দিয়ে বাণের জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত কচুবনকে পদদলিত ক'রে সরকারদের গোয়ালঘরের ভিতর গিয়ে লুকিয়ে থাকতুম। একদিন পায়ে একটা বাবলার কাঁটা বিঁধেছিল ; এখনো মনে ক'রতে চোখে জল আসে—মা আমার সেই কোমল পা'খানি কোলের উপর নিয়ে ছুঁচ দিয়ে কত যত্নে সেই কাঁটাটা তুলে দিয়েছিলেন। সামান্য একটা কাঁটা বের করবেন, তাতে কত যত্ন, কত ভয় সাবধানতা,—যেন তাঁর প্রাণের সমস্ত আগ্রহ সেই ক্ষুদ্র ছুঁচ-বৃন্তে ভর ক'রেছিল। কথাটা সামান্য এবং সেদিন বহুকাল চ'লে গেছে, কিন্তু জীবনের এই মরুপ্রান্তে শৈশবসুখের সেই ক্ষুদ্র ইতিহাসটুকু এখনো ভুলি নি।

সমস্ত সকাল-বেলাটা সেই গৃহকোণে ব'সে এই রকম চিন্তায় কেটে গেল। স্বামীজি কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলেন ; বৈদান্তিক ভায়া বোধ করি কোন জায়গায় তর্কের গন্ধ পেয়েছিলেন ; তিনি অনেকক্ষণ হ'তে এ অঞ্চল ছাড়া। বেলা প্রায় দশটা সাড়ে-দশটার সময় স্বামীজি কুটিরে এসে উপস্থিত হ'লেন। আমাকে চিন্তামগ্ন দেখে তিনি কিছু শঙ্কিত হ'লেন, স্নেহপূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন, "তোমার কি কিছু অসুখ হ'য়েছে?" তাঁর সেই কোমল স্নেহের স্বরে আমি অনেকটা তৃপ্তি অনুভব ক'ল্লুম, ব'ল্লুম, "না, আমার অসুখ হয় নি, আমি আজ বিশ্রাম ক'চ্ছি।—" তিনি হাঁফ ছেড়ে ব'ল্লেন, "তবু ভাল!" আমি যে তখন কি গুরুতর বিশ্রামে প্রবৃত্ত তা তিনি বোধ করি বুঝতে পারেন নি। যা হোক ক্রমাগত এই পথশ্রম দুশ্চিন্তা এবং ক্লান্তিতে আমি একেবারে অবসন্ন হ'য়ে প'ড়েছি, তা তিনি কতকটা অনুমান করতে পাল্লেন,—সুতরাং আমাকে একটু প্রফুল্ল করবার জন্য অনেক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা ক'ল্লেন। সবই পুরাণ কথা—সেই সংসার অসার, জীবন মায়াময়, আসক্তি সকল দুঃখের মূল, সুখ দুঃখ হ'তে হৃদয়কে অব্যাহত রাখাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের প্রধান উপায়। পাঁজি পুঁথিতে এবং ধর্মপ্রচারকদিগের মুখে এই বাঁধি বোল বহুকাল হ'তে শুনে আসা যাচ্ছে, সুতরাং এ সকল কথা শুনতে আর তত আগ্রহ বোধ হ'লো না। তখন তিনি তাঁর যৌবনকালের ভ্রমণ বৃত্তান্ত আমাকে ব'লতে আরম্ভ ক'ল্লেন ; আসামের পাহাড়ে পাহাড়ে কেমন তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন ভগবৎকৃপায়, কতবার তিনি আসন্ন বিপদের হাত থেকে কেমন ক'রে রক্ষা পেয়েছেন, সেই কথা ব'লতে লাগলেন ; কিন্তু আমার সে নিস্তেজ ভাব কিছুতেই দূর হ'লো না।

www.pathagar.com

দুপুরের সময় একাই বেড়াতে বেরুলুম। ভিড় অনেক কম, যাত্রীরা প্রায় সকলেই বাসায় গেছে—এখনো পথিপ্রান্তে তীর্থযাত্রার কতক কতক নিদর্শন আছে ; রাস্তা জনহীন, মধ্যাহ্নের রৌদ্রে আরো নিরালা ব'লে বোধ হ'তে লাগলো ; রোদ ঝাঁ-ঝাঁ ক'রছে ; উপরে পর্বতশৃঙ্গে গলিত তুষার চিক চিক ক'রছে ; দূরে একটা গাছে পাতা নড়ছে এবং তুষারনির্মুক্ত ধূসর গাত্র উঁচু নীচু ফাটল সংযুক্ত, দেখতে মোটেই ভাল লাগছে না। রাস্তা দিয়ে যেতে মনে হলো আমাদের সেই বঙ্গের সমতল ক্ষেত্রের খানিকটা শস্য-শ্যামল খোলা মাঠ, অবাধ বায়ুর মধুর হিল্লোল, নিকটে একটা ছোট খাল, জেলেরা তাতে বাসজাল ফেলে মাছ ধ'রছে, বটতলায় রাখালেরা মিলে জটলা ক'রছে—আর শস্যক্ষেত্রের দিকে একটা গরুকে ছুটতে দেখে দৌড়ে এসে তাকে ঠেঙাচ্ছে ; বুঝি এইরকম প্রাচীন এবং অভ্যস্ত দৃশ্যের মধ্যে গেলে আমার প্রাণ জুড়িয়ে যায়। বাঙালীর ছেলে ক্রমাগত এই রকম লোটা-কম্বল ঘাড়ে ক'রে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতে আর কিছুতেই ভাল লাগছে না। এ পাহাড় প্রকৃতির সঙ্গে আমার প্রকৃতির কোন রকম মিশ খাচ্ছে না ; সুখ চেয়ে স্বস্তি ভাল অতএব এখন মনে ক'রছি একবার বাড়ি ফিরে যাব ; এই সন্ন্যাস অথবা তার চেয়েও অতিরিক্ত কিছু আমার আর পুষিয়ে উঠছে না ভাবছি—

"এখন ঘরের ছেলে বাঁচি ঘরে ফিরে গেলে,
দু'দণ্ড সময় পেলে নাবার খাবার।"

যারা আমার এই ভ্রমণবৃত্তান্ত একটু ঔৎসুক্যের সঙ্গে পড়েছিলেন, এবং প্রতি মুহূর্তে আমাকে একটা দিগ্‌গজ সাধুরূপে পরিণত হওয়া দেখবার আশায় ধৈর্যাবলম্বন ক'রেছিলেন, তাঁরা হয় ত এতদিনের পরে আমার এই লোটা কম্বল এবং বক্তৃতার মধ্যে থেকে আমার স্বরূপ নিরীক্ষণ ক'রে ভারি নিরুৎসাহ হ'য়ে প'ড়বেন, কারো কারো মুখ দিয়ে দু'চারিটি কটুকাটব্যও বের হ'তে পারে। আমার তাতে আপত্তি নাই ; এ ছদ্মবেশের চেয়ে সে বরং ভাল।

আমার মন ধাউস ঘুড়ীর মত অনন্ত বিস্তৃত কল্পনারাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু আমি বাজারের পথ ছাড়িনি। ঘুরতে ঘুরতে বাজারের মধ্যে এসে দেখলুম, একটা জায়গায় অনেকগুলো লোক জড় হ'য়েছে। প্রথমেই মনে হ'লো হয় ত কোন সাধুর কিঞ্চিৎ গাঁজার দরকার হ'য়েছে ; তাই সে কোন রকম বুজরুকী দেখিয়ে গাঁজার অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় আছে। ব্যাপারটা কি দেখবার জন্যে আমিও ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলুম। দেখলুম সাধু সন্ন্যাসী আমার সেই পূর্বপরিচিত পণ্ডিত কাশীনাথ জ্যোতিষী। জ্যোতিষী মশাই সেই সমবেত ক্ষুৎকাতর পাহাড়ীদের খাদ্যসামগ্রী বিতরণ ক'চ্ছেন ; কাকেও পয়সা কাকেও কাপড় দান ক'চ্ছেন, তাঁর মিঠে কথায় সকলেই সন্তুষ্ট হ'চ্ছে। এই রকম ব্যবহারে তিনি অনেক জায়গায় লোকের উপর আধিপত্য স্থাপন ক'রে নিয়েছেন। তাঁর হৃদয়টা স্বভাবতই দয়ালু, চিত্ত উদার ব'লে বোধ হয় ; দোষের মধ্যে তিনি একটু প্রশংসাপ্রিয়। নির্দোষ ক'টা লোক? সেজন্যে তাঁকে বড় নিন্দা করা যায় না। পূর্বেই ব'লেছি একবার তাঁহার অনুগ্রহের উৎপাতে আমি বিষম বিব্রত হ'য়ে পড়েছিলুম ; আজ তাঁর সঙ্গে দেখা হ'তেই তিনি আগ্রহে আমায় কাছে ডাকলেন ; আমার কুশল জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন, পথে আর কোন অসুখ হ'য়েছিল কি না, তারও খোঁজ নিলেন। তাঁর সমস্ত কথার উত্তর দিয়ে শান্ত অপরাধীর মত তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমাকে ব'সতে বলে তাঁর ভৃত্যকে তিনি তাঁর বাক্সটা

www.pathagar.com

আনতে আদেশ দিলেন। আবার বাক্স! সর্বনাশ! এখনি হয়ত তিনি হরেক রকম ভাষায় লেখা একতাড়া সার্টিফিকেট খুলে ব'সবেন আর এই সব পাহাড়ীদের সম্মুখে আমাকে তার ব্যাখ্যা করতে হবে? কি কুক্ষণেই আজ বাজারে পা দিয়েছিলুম! মনে বিলক্ষণ অনুতাপের উদয় হ'লো ; কিন্তু সে জন্য জ্যোতিষী মহাশয়ের বাক্সের শুভাগমন বন্ধ রইল না।

যা হোক শীঘ্রই আমার ভয় দূর হল ; দেখলুম এবার আর তিনি সার্টিফিকেটের তাড়ায় হাত দিলেন না, বাক্সের মধ্য হ'তে একখানা খাম বের ক'রে হাস্যপূর্ণ মুখে আমার দিকে চাইলেন এবং সেই খামখানি আমার হাতে দিলেন। খামখানি চতুষ্কোণ, সুন্দর মসৃণ এবং পুরু, ডাকহরকরাদের ময়লা হাতের সংস্পর্শে কিঞ্চিৎ শ্রীভ্রষ্ট। খামের সম্মুখে সুন্দর ইংরাজী অক্ষরে জ্যোতিষী মহাশয়ের নাম লেখা, অপর দিকে স্বর্ণবর্ণে অঙ্কিত একটা মনোগ্রাম ; মনোগ্রামটি দেখে লেখকের নাম ঠিক ধ'রতে পাল্লুম না ; ডাকঘরের মোহর দেখে বুঝলুম, এ চিঠি কলিকাতা থেকে আসছে। চিঠিখানা হাতে ক'রে কি কর্তব্য ভাবছি ; তখন জ্যোতিষী মহাশয় চিঠিখানা প'ড়তে আমায় অনুমতি ক'ল্লেন। পত্র খুলে দেখলুম, কলিকাতা হ'তে মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর জ্যোতিষী মহাশয়কে এই পত্রখানি লিখেছেন! হিন্দি ভাষায় লেখা মহারাজের স্বাক্ষর ইংরাজীতে। জানিনে পত্রখানির রচনা কার, কিন্তু যারই রচনা হ'ক ভাষাটি অতি সুন্দর, হিন্দি ভাল লিখতে না পারি, বহুদিন যাবৎ এ হিন্দিভাষার দেশে থেকে ভাষার ভালমন্দ বুঝবার একটু ক্ষমতা হ'য়েছিল। বহুদূরদেশ-প্রবাসী একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের জন্য মহারাজ বাহাদুরের এরূপ যত্ন প্রশংসনীয়। জ্যোতিষী মহাশয়ের শরীর ভাল নয় তাই মহারাজ তাঁকে দেশভ্রমণ ত্যাগ ক'রে শীঘ্রই দেশে অথবা কলিকাতায় প্রত্যাগমনের জন্য বারবার অনুরোধ ক'রে পত্র লিখেছেন। জ্যোতিষী মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন আমার সঙ্গে মহারাজের আলাপ আছে কিনা। মহারাজের অনেক মহৎ গুণের কথা আমাকে ব'ল্লেন, তিনি যে অনেক বড় বড় রাজা ও মহারাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাও দু'চারটি উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ ক'ল্লেন। প্রশংসাভাজন লোকের প্রশংসা করাই কর্তব্য কিন্তু আমার সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দের বিষয় এই যে কতকগুলি বিদেশী লোক একত্র হ'য়ে এই দূরবর্তী হিমালয়ের অন্তরালে আমার একজন স্বদেশী এবং স্বজাতীয় এমন প্রশংসা ক'ল্লেন। স্বজাতীয় সমস্ত লোকের মধ্যে পরস্পর যে একটা হৃদয়ের গভীর টান আছে সেদিন তা আমি বেশ বুঝেছিলাম ; বুঝি শতলক্ষ বাঙালীর মধ্যে দাঁড়িয়ে বাঙালীর প্রশংসা শুন্‌লে মনে এমন আনন্দের সঞ্চার হ'ত না ; কিন্তু এখানে বাঙালী আমি একা—স্বদেশ আমার বহু পশ্চাতে ; সেই প্রাতঃসূর্যের স্নিগ্ধ মধুর কিরণোজ্জ্বল আমার মাতৃভূমি সেই নদীমেখলা শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশ—আমার মা বাবা ভাই বোনের পবিত্র স্মৃতিভূষিত চিরবাঞ্ছিত ভূস্বর্গ আমার তৃষিত হৃদয়ের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার ধন! এখানে প্রত্যেক বাঙালীর স্মৃতিই আমার কাছে পরম আদরের বস্তু, আমার বোধ হ'তে লাগলো, জ্যোতিষী মহাশয়ের নিকট আমার একজন প্রিয়তম পরমাত্মীয়ের গল্প শুনছি।

জ্যোতিষী মহাশয়ের একটা বাহাদুরী এই যে, তিনি গল্প ক'রে কখন ক্লান্ত হন না। ছেলেবেলায় বর্ষাকালে কতদিন সন্ধ্যাবেলা ঘরের মধ্যে মাদুর বিছিয়ে শুয়েছি, আর স্তিমিত প্রদীপের কাছে ব'সে পিসিমা তাঁর দৈত্যদানব রাক্ষস-রাক্ষসীর রূপকথা বলতেন।

www.pathagar.com

আষাঢ়ের সেই দীর্ঘ দিনের অবসানে খেলা-শ্রান্ত, ক্লান্ত শিশু-শরীরটি নিতান্ত আলস্য-বিজড়িত হ'য়ে উঠতো ; তার পর মেঘখণ্ডিত রাত্রি, মেঘের ডাক, বৃষ্টির ঝম্ ঝম্ শব্দ, সেই শব্দে বিশ্বের সমস্ত নিদ্রা একত্র জড় হ'য়ে কোমল নয়ন-পল্লব ঢেকে ফেলতো। পিসিমার অসম্ভব আষাঢ়ে গল্পের অসম্ভব নায়কটি, তার প্রেয়সীর অনুরোধে যখন অতল মহাসমুদ্রে ডুব দিয়ে অঞ্জলি পুরে পদ্মরাগমণি তুলেছে, ঠিক সেই সময় আমাদের "হু" বলা বন্ধ হ'য়ে যেত ; পিসিমাও তাঁর শ্রোতাদিগকে নিদ্রাকাতর দেখে দুঃখিত মনে হরিনামের মালায় অধিক ক'রে মনঃসংযোগ ক'রতেন। কিন্তু জ্যোতিষী মশাই গল্প করবার সময় পিসিমায়ের চেয়েও বাড়িয়ে তোলেন। কেউ তাঁহার কথায় "হু" বলুক আর না বলুক, শুনুক আর না শুনুক, তিনি অনর্গল ব'লে যান, এবং বোধ করি তাতে তাঁর তৃপ্তির অভাব হয় না। তবে সৌভাগ্যবশতঃ তাঁর নিবিষ্টচিত্ত সহিষ্ণু শ্রোতা প্রায়ই দেখা যায়। আজ গল্পের অনুরোধে বেলা একটা পর্যন্ত জ্যোতিষী মহাশয়ের স্নানাহার হয় নি ; আমি তাঁকে সে বেলার মত সভাভঙ্গ করতে অনুরোধ ক'ল্লুম। তিনি উঠে গেলেন, আমি সে স্থান পরিত্যাগ কল্লুম।

বাজারের দিক ছেড়ে যে দিক দিয়ে বদরিকাশ্রম যেতে হয়, সেইদিকে খানিক দূর গেলুম। কিছু দূর গিয়ে দেখি, একদল সাধু আসছে। পাঠকগণের হয় ত মনে আছে, আমরা যখন এই পথে আসি, তখন দ্বিতীয় দিনে একদল উদাসী সাধুর সঙ্গে আমাদের দেখা হ'য়েছিল—এ সেই দল ; কেদারনাথ দর্শন ক'রে আজ এখানে এসেছে। সাধুদের কাহারও কাহারও সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় হয়েছিল। তাদের সঙ্গে যথারীতি অভিবাদন ও প্রত্যাভিবাদন শেষ হ'তে না হ'তেই আমার সেই পূর্বপরিচিত বাঙালী সাধুটি এসে উপস্থিত হ'লেন, এবং আনন্দের সঙ্গে আমাকে আলিঙ্গন ক'ল্লেন ; পরিষ্কার বাঙ্গালায় ব'ল্লেন, "ভাই, আর যে তোমার সঙ্গে দেখা হবে এ আশা ছিল না"—সেই সকল সাধুকে পেয়ে আমার বড়ই আনন্দ হ'লো। আজ আমার মনের অবস্থা অতি খারাপ ; এ অবস্থায় আমার সহধর্মী একজন স্বদেশী লাভ বিধাতার বিশেষ অনুগ্রহ ব'লে মনে হ'লো! সাধুকে সঙ্গে নিয়ে আড্ডার দিকে চ'ল্লুম। তাঁর সঙ্গে খান দুই পুঁথি, একটা কমণ্ডলু, আর একখানি ছেঁড়া কম্বল। তাঁর তখনও আহারাদি হয় নি। আমি বাজার হ'তে তাঁকে খাদ্যসামগ্রী কিনে দিতে চাইলুম, কিন্তু তিনি তাতে নিষেধ ক'ল্লেন, ব'ল্লেন সঙ্গীদের কারও খাওয়া দাওয়া হয় নি, এ অবস্থায় তাঁর আহারাদি শেষ করা নিয়ম-বহির্ভূত। কোনদিনই বেলা চারিটার আগে তাঁর আহার হয় না, কারণ দলে লোক অনেক, তার উপর গ্রন্থ সাহেবের পূজা আছে ; পূজা ও ভোগের পর ইহারা আগে অতিথি অভ্যাগতদিগের আহার করায়, পরে নিজেদের ব্যবস্থা।

আমরা ঘুরতে ঘুরতে বেলা তিনটার সময় বাসায় ফিরে এলুম। স্বামীজি ও শ্রীমান অচ্যুতানন্দ বাসাতেই ছিলেন। আমরা চারিজন গল্প আরম্ভ ক'ল্লুম। কিন্তু সংসারে অবিশ্রান্ত সুখ কোথায়? গল্পের আরম্ভেই অচ্যুত ভায়া আগন্তুক সাধুর সঙ্গে তর্ক করবার এক বিপুল আয়োজন ক'রে ব'সলেন। সাধুটির তখনও আহার হয় নাই এবং পথশ্রমে তিনি নিতান্ত ক্লান্ত, সুতরাং তিনি তর্কের সুবিধা সত্ত্বেও তাহাতে মনোযোগ দিলেন না। বেলা প্রায় চারটে বাজে দেখে আগন্তুক সাধু উঠে গেলেন, ব'ল্লেন শীঘ্রই আবার ফিরে আসবেন। আসন্ন তর্কের আশা বিলুপ্ত হওয়াতে বৈদান্তিক নিরুৎসাহ চিত্তে নিশ্চলদাসের বেদান্তদর্শন

www.pathagar.com

খুলে ব'সলেন। আমি দেখলুম, বেচারা নিতান্ত অসুবিধায় পড়েছে, অতএব প্রস্তাব কল্লুম, "এস এই তীর্থস্থানে ব'সে আমরা একটু শাস্ত্রালোচনা করি।" এই রকম শাস্ত্রালোচনা যে তর্কযুদ্ধের ভূমিকা, তা স্বামীজির বুঝতে বাকী রইল না। তিনি ব'ল্লেন, "তোমরা বাপু শাস্ত্রচর্চা কর, আমি একটু বাহিরে যাই।" স্বামীজি রণে ভঙ্গ দিলেন, আমরা মায়াবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিবর্তনবাদ প্রভৃতি নিয়ে এক ঘোর দার্শনিক তর্ক জুড়ে দিলুম। আমার উদ্দেশ্য অচ্যুতভায়াকে কিছু জব্দ করা, সুতরাং যত তর্ক করি না করি, ক্রমাগতই বলি, "আরে ভাই, তুমি এ সোজা কথাটা বুঝতে পাচ্ছ না ; এটা যার মাথায় না আসে, তার পক্ষে তর্ক না করাই নিরাপদ।" বুদ্ধির উপর দোষারোপ ক'ল্লে, অতি ভালমানুষেরও রাগ হয়। বৈদান্তিক আরও অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠলেন, এবং অধিক উৎসাহের সঙ্গে নানা রকমের শ্লোক আওড়াতে লাগলেন, আমি বলি, "হ'ল না,—হ'ল না, ও শ্লোক ঠিক এখানে খাটবে না।" "কেন খাটবে না" ব'লে তিনি আবার সেই সকল শ্লোকের ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন, কোন্ টীকাকার কি ব'লে গেছেন তা পর্যন্ত বাদ গেল না।

ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত। স্বামীজির সঙ্গে সাধু কুটিরে প্রবেশ ক'ল্লেন ; তখনও আমাদের তর্ক সমান ভাবে চ'লছে। স্বামীজি বৈদান্তিককে ডেকে ব'ল্লেন, "রাত্রি হ'য়ে এল, শুধু তর্কতে ক্ষুধা-নিবৃত্তির কোন সম্ভাবনা নেই, এখন তর্ক ছেড়ে আহারের বন্দোবস্তে মন দিলে হয় না কি?" প্রবল যুদ্ধের মধ্যে সন্ধির শ্বেত নিশান দেখালে যেমন অর্ধপথে যুদ্ধনিবৃত্তি হয়, তেমনই স্বামীজির এই কথায় তর্কযুদ্ধ হঠাৎ থেমে গেল। পৃথিবীর অনেক তর্ক অন্নচিন্তায় নিষ্পত্তি হয়ে যায় ; আমাদেরও তাই হ'লো। সেই সন্ধ্যাকালে দিবা ও রাত্রি, আলো ও অন্ধকারের মধুর মিলনক্ষণে স্বামীজি ও আগন্তুক সাধু সংযত হৃদয়ে পুরাণের শান্ত-গম্ভীর বিষয় আলোচনা করতে লাগলেন ; তখন দূরে মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনিত হ'চ্ছিল, দূরে সন্ন্যাসীর দল সমস্বরে ভজন আরম্ভ ক'রেছিল। তাঁদের সেই ভজনের সুরে আমার একটি পরিচিত ভজন মনের মধ্যে জেগে উঠল ; আমার প্রাণের মধ্য হ'তে একটা ব্যাকুল স্বর নিতান্ত কাতর ভাবে যেন গাহিতে লাগিল—

"কি-করিলি মোহের ছলনে।
গৃহ তেয়াগিয়া, প্রবাসে ভ্রমিলি,
পথ হারাইলি গহনে।
(ঐ) সময় চলে গেল, আঁধার হ'য়ে এল
মেঘ ছাইল গগনে।
শ্রান্ত দেহ আর চলিতে চাহে না,
বিঁধিছে কণ্টক চরণে।"

অনেক রাত্রি পর্যন্ত এই গানটি পুনঃ পুনঃ আমার মনে ধ্বনিত হ'তে লাগল। কেবলই মনে হ'তে লাগল, "শ্রান্ত দেহ আর চলিতে চাহে না,—বিঁধিছে কণ্টক চরণে!" নানকের কথা ও কবিরের দোঁহা আবৃত্তি ক'রে অনেক রাত্রে আগন্তুক সাধু ও স্বামীজি শয়ন ক'ল্লেন, আমি কুটিরের এক প্রান্তে কম্বলশায়ী হ'লুম। এবারের মত আমাদের তীর্থযাত্রা শেষ হ'লো। সকালে আমরা দেশে ফিরব,—দেখি নূতন পথ নূতন দেশ দিয়ে ফিরে যেতে যদি কোন রত্নের সন্ধান পাই।

www.pathagar.com

২৯শে মে, শুক্রবার।—অপরাহ্নে বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হই। শনি, রবিবারে সেই পবিত্র তীর্থে-ই কাটান গেল। আমাদের হিন্দুদিগের মধ্যে একটা নিয়ম আছে, প্রত্যেক তীর্থস্থানেই তে-রাত্রি বাস ক'রতে হয়। আমরাও হিন্দুধর্মের সকল নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন না ক'ল্লেও তীর্থস্থানে তে-রাত্রি বাসের পুণ্য অর্জন করা গেল।

তিন দিন কাটান গেল, তবু এখান হ'তে ফিরতে ইচ্ছা হয় না, এমন সুন্দর স্থান! ভারতে সুন্দর অনেক স্থানই দেখা গিয়াছে, কিন্তু এমন শান্তিলাভ আর কোথাও হয়নি। অনন্ত সুন্দরের পরিপূর্ণ সত্তায় আত্মাকে বিসর্জন দিয়ে যে তৃপ্তি, তা এখানেই পাওয়া যায়। তৃষিত পান্থের জীবনব্যাপী পিপাসা নিবৃত্তি হয়। কিন্তু হায়, তথাপি চপল চঞ্চল চিত্ত অধীর হয়ে উঠে এবং সূর্যের উজ্জ্বল আলো, চন্দ্রের সুবিমল স্নিগ্ধ হাসি, নীল আকাশ ও আমাদের মাতৃস্বরূপিণী, ফলপুষ্প শোভিনী বসুন্ধরা সমস্ত অন্ধকার ব'লে প্রতীয়মান হয়।

তাই এই নিভৃত পার্বত্য-কুঞ্জে শান্তির আলয়ে এসেও মধ্যে মধ্যে প্রাণটা দূরদেশে ছুটে যেত চায়! যখন পথভ্রমণে পা দু'টি অসাড় হ'য়ে এসেছে এবং মন আর কোথাও যেতে রাজি হচ্ছে না, তখন একটা বদখেয়াল দুরন্ত স্কুল-মাস্টারের মত কানটা ধরে নাড়া দিচ্ছে, আর ব'লছে "আর কাজ কি এখানে, কম্বল ঘাড়ে ক'রে বেরিয়ে পড়া যাক।" ইচ্ছা না থাকলেও মন এ কথার বিরুদ্ধে কাজ করতে সমর্থ নয়। সুতরাং নীচের দিকেই ফিরতে হ'চ্ছে।

কিন্তু আর এক মুস্কিল। আমি একা নই ; আমার ন্যায় বাধাহীন, বন্ধন-শূন্য, উদ্দাম, অসংযত প্রাণীর কণ্ঠরজ্জু আর দুইজন পথিকের করলগ্ন, তাঁরা হ'চ্ছেন বৈদান্তিক ভায়া ও স্বামীজি। এমন সাদৃশ্যহীন তিনটি মনুষ্য একসূত্রে গাঁথা কতকটা বিস্ময়কর বটে। কিন্তু আর বুঝি শেষরক্ষা হয় না। বৈদান্তিক এখানে আহার ক'চ্চেন, আর মহাস্ফূর্তিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বহুদিন পরে ইচ্ছামত সময়ে আহার এবং উপযুক্ত কালে নিদ্রালাভ ক'রতে পেরে ভায়া আপন খেয়ালেই ঘুরে বেড়ান কাকেও গ্রাহ্য করেন না। দেশে ফিরবার কথা তুললেই গম্ভীরভাবে বলেন, "গৃহধর্মে বিরক্ত সন্ন্যাসীর এ উপযুক্ত কথা বটে!" কথাটা ঠিক কিভাবে আমার কানে প্রবেশ ক'ল্লে, তা জান? আমার বোধ হ'লো নিশীথ রাত্রে কারারুদ্ধ জগৎসিংহের কাছে আয়েসাকে দেখে শ্লেষরুদ্ধকণ্ঠে ওসমান যখন ব'লেছেন "নবাবপুত্রীর পক্ষে এ উপযুক্ত বটে!" কি বলবো, হৃদয়ে আয়েসার মত আবেগ ছিল না, থাকলে বৈদান্তিককে ব'লতুম,—কি ব'লতুম এখন সে কথা বলা ভারি শক্ত ; তবে তাকে কখনই পল্লীমাতার অজস্র স্নেহ-রস-পুষ্ট মা-হারা আর্ত সন্তান ব'লে অভিহিত করতুম না।

বৈদান্তিকের কথায় নিরুৎসাহ হ'য়ে স্বামীজির কাছে বদরিকাশ্রম ত্যাগের প্রস্তাব ক'ল্লুম। তিনি বল্লেন, "আরও দিনকতক থাকা যাক। চিরদিনই ত ঘুরছি, এখন দিনকতক বিশ্রাম করা মন্দ কি?" আমি মনে কল্লুম বৃদ্ধ পথশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন। তাঁর অপরাধ কি? তাঁর জীবনে পথশ্রম অল্প হয় নি। আমি জীবনের মধ্যাহ্নকালে তাঁকে সংসারযুদ্ধে পরাভূত, অক্ষম, বৃদ্ধ মনে ক'রেছিলুম ; কিন্তু এরূপ মনে করার আমার কোন অধিকার

www.pathagar.com

নাই। যে বয়সে লোক পৌত্রপৌত্রী-পরিবেষ্টিত হ'য়ে আরাম উপভোগ করে, সে বয়সে তিনি অসুরের মত পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! এরূপ অবস্থায় দু'দিন বিশ্রামের জন্য তাঁর হৃদয় ব্যগ্র হবে, তার আর আশ্চর্য কি? আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি আজ হঠাৎ আমাকে উপদেশ দিতে আরম্ভ ক'ল্লেন। শুষ্ক কঠোর উপদেশের উপর আমার বড় শ্রদ্ধা নেই, তাও তিনি জানতেন; তবুও স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হ'য়ে তাঁর এ কষ্ট স্বীকারের আবশ্যকতা বুঝলুম না। শুধু মাথার উপর অবিরলধারে উপদেশস্রোত বর্ষণ হ'তে লাগল। ক্রমে তাঁর আসাম-ভ্রমণের কথা; কুলি-কাহিনী হ'তে আরম্ভ করে—কবীর, নানক ও তুলসীদাসের দোঁহা পর্যন্ত কিছুই বাদ গেল না। স্বামীজি যখন দেখলেন যে তাঁর উপদেশে কোনই ফল হবার সম্ভাবনা নেই, আমার সংকল্প আমি ছাড়ছিনে, এবং এই রকমে চিরজীবনটা দেশে দেশে ঘুরে কাটানই আমার অভিপ্রেত—তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে বল্লেন, "তবে কালই বেরিয়ে পড়া যাক!" সুতরাং বৈদান্তিককে হাত করা আর কঠিন হলো না। তিনজনে পরামর্শ ক'রে স্থির করা গেল—কালই প্রাতঃকালে বদরিনাথ পরিত্যাগ করতে হবে।

অপরাহ্ণে পাণ্ডা লছমীনারায়ণ আমাদের আড্ডায় আহারের কোন রকম আয়োজন ক'রতে নিষেধ ক'ল্লে! বুঝলুম তার বাড়িতে আয়োজন হ'চ্ছে। সন্ধ্যাকালে আর কোন কাজ নেই, শেষবারের জন্য বদরিনাথ প্রদক্ষিণ ক'রতে বের হলুম।

বাজারের মধ্যে উপস্থিত হ'য়ে দেখলুম কাশীনাথ জ্যোতিষী মহাশয় অনেকগুলি পাণ্ডা সন্ন্যাসী পরিবৃত হ'য়ে একটা ঘরে ব'সে আছেন। আমাকে নিকটে ডাকলেন। এ সময় আমার মনটা বড় ভাল ছিল না, কিন্তু তাঁর কথা অগ্রাহ্য ক'রতে পাল্লুম না। তাঁর নিকটে উপস্থিত হ'লে তাঁর ইংরাজী সার্টিফিকেট আমাকে দিয়ে তর্জমা করিয়ে নিলেন; তার পর আমার প্রশংসা আরম্ভ হ'লো; ভবিষ্যতে আমার যে মঙ্গল হবে, তিনি সেই দৈববাণীও ক'ল্লেন, এবং আমরা শীঘ্রই বদরিনাথ ছাড়ছি শুনে আমাকে পথখরচের সাহায্য ক'রতে চাইলেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ ক'রে এবং তাঁর এই অযাচিত অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সেখান হতে বিদায় হ'লুম। বিদায়কালে তিনি আমাকে বিশেষ অনুরোধ ক'ল্লেন, যেন কলিকাতাতে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আমার দুর্ভাগ্য, বঙ্গদেশে ফিরে আর তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি।

এখানকার পোস্ট-আফিসে গেলুম। পোস্টমাস্টারের সঙ্গে খানিক আলাপ ক'রে নারায়ণের মন্দিরের দিকে যাচ্ছিলুম, পথের মধ্যে শুনলুম মন্দির-দ্বার বন্ধ হয়ে গেছে সুতরাং আর নারায়ণ দর্শন হ'লো না। যখন বাসায় ফিরে এলুম তখন ঘণ্টাখানেক রাত্রি হ'য়েছিল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই পাণ্ডা লছমীনারায়ণ আর তার কর্মচারী পাণ্ডা বেণীপ্রসাদ এক হাঁড়ি উৎকৃষ্ট খিচুড়ী ও একটা থালে খানিক তরকারী, তিনচারি রকমের চাটনি, আর কতকগুলো পেঁড়া নিয়ে উপস্থিত হ'লো। রসনেন্দ্রিয় এ সকলের আস্বাদন সুখ বহুকাল অনুভব করে নি। আমি যথেষ্ট আশ্বস্ত হ'লুম। স্বামীজি একবার বৈদান্তিকের দিকে চেয়ে দেখলেন, এই আশাতিরিক্ত ভোজনদ্রব্য দেখে ভায়ার কি আনন্দ! তাঁর সেই লুব্ধ ব্যগ্রদৃষ্টির কথা অনেককাল মনে থাকবে! আহারবিষয়ে আমিও পশ্চাৎপদ নহি, এখন পর্বতের মধ্যে কঠোর সন্ন্যাসে আমার আহারপ্রবৃত্তিটা কিছু খর্ব হ'য়ে প'ড়েছিল। আজ পূর্ণ

www.pathagar.com

উৎসাহে লছমীনারায়ণের আনীত দ্রব্যগুলির সদ্ব্যবহার করা গেল। স্বামীজি ব'ল্লেন, "অচ্যুত, এবার আমাদের যাত্রা ভাল, রাস্তায় আহারের কষ্ট হবে না।" স্বামীজির এই ভবিষ্যৎ-বাণী পূর্ণ হয়েছিল—কিন্তু অচ্যুত ভায়ার অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য ঘটেনি—কয়েকদিন পরেই তিনি আমাদের সঙ্গ ছেড়ে চ'লে গিয়েছিলেন।

আহারান্তে পাণ্ডাদের কিছু দান করা গেল—পরিমাণে অধিক নয়। ভবিষ্যতে আরও কিছু দান করবার আশা দেওয়া গিয়েছিল ; কিন্তু তা আর পূর্ণ হবার কোন সম্ভাবনা নেই। রাত্রেই পাণ্ডাদের কাছে বিদায় নিলুম। সে সময় লছমীনারায়ণ আমাকে একটা অনুরোধ ক'রেছিলেন,—তা এই যে আমরা বদরিকাশ্রমে এসে যতদিন এখানে ছিলুম,—ততদিন আমাদের কোন অসুবিধা ভোগ ক'রতে হয় নি, পাণ্ডা লছমীনারায়ণ ভারি 'জবর' পাণ্ডা, সে আমাদের খুব যত্ন ক'রে রেখেছিল ; এই কথা ক'টা খবরের কাগজে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ ক'রতে হবে। তার বিশ্বাস আমাদের মত বড় (?) লোকে যদি ছাপার অক্ষরে তার জন্যে দু'কথা লেখে, তা হ'লে তা অব্যর্থ ; তার পসার অনতিবিলম্বেই ভারি জেঁকে উঠবে। আমি সেই সরল-প্রকৃতি, উপকারী পাণ্ডার অনুরোধ রক্ষা ক'রেছিলুম। আমার জনৈক বন্ধু দ্বারা পশ্চিমদেশের দুই একখানি হিন্দি সংবাদপত্রে লছমীনারায়ণের গুণের কথা, বিশেষতঃ সে দেবপ্রয়াগে যে রকম কষ্ট স্বীকার ক'রে দক্ষতার সঙ্গে আমার হৃতসর্বস্ব উদ্ধার করেছিল, তা সেই পত্রের মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখ করা গিয়েছিল। এই প্রশংসাপত্র প্রকাশ করাতে লছমীনারায়ণের কোন উপকার হ'য়েছে কিনা এবং তার পসার কিরূপ বৃদ্ধি পেয়েছে, তা জানতে পারিনি, তবে এ কথা স্পষ্ট বুঝতে পারা গিয়েছিল যে, সর্বত্রই মানবহৃদয়ের প্রবৃত্তি একই রকম। খবরের কাগজে নাম প্রকাশের জন্য আমরা সুসভ্য মানব-সন্তানগুলি কি নিদারুণ আয়াস স্বীকারই না করি? পর্বতবাসী অশিক্ষিত পাণ্ডাপুত্রের নিকটও এ প্রলোভন সামান্য নয়। নারায়ণক্ষেত্রে রাত্রি কেটে গেল।

১লা জুন, সোমবার।—অতি ভোরে যাত্রা করা গেল। আজ আমাদের নূতন রকমের ' প্রোগ্রাম'। আমি প্রস্তাবকারী, আর স্বামীজি সমর্থনকারী ; কাজেই অচ্যুতানন্দ আমাদের মতেই বাধ্য হ'লেন। আমরা স্থির ক'ল্লুম— গতরাত্রের মত হনুমান চটিতে অল্পকাল বিশ্রাম ক'রে এবং সম্ভব হ'লে সেখান হ'তে জলযোগ শেষ করে রওনা হব। পাণ্ডুকেশ্বরে সেবার শিরঃপীড়ায় অত্যন্ত কাতর হ'য়ে পড়েছিলুম,—জীবনের আশা বেশী ছিল না ; সেই কথা মনে হওয়াতে পাণ্ডুকেশ্বরের প্রতি সহানুভূতি নিতান্ত হ্রাস হ'য়েছিল। জানি যে তাতে পাণ্ডুকেশ্বরের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, তথাপি স্থির কল্লুম—সেখানে এক মুহূর্তও অপেক্ষা করা হবে না। পাণ্ডুকেশ্বরে যদি সে দিন না থাকি—তা হ'লে আমাদের একেবারে বিষ্ণুপ্রয়াগে আড্ডা নিতে হবে। নারায়ণ হ'তে বিষ্ণুপ্রয়াগ আঠারো মাইল ; সমতলক্ষেত্রে আটারো মাইল পথ পদব্রজে চলা তেমন কিছু কঠিন কাজ নয়—অনেকেই চ'লেছেন। কিন্তু এই পার্বত্য পথে আটারো মাইলের মধ্যে যে চড়াই ও উৎরাই, এ রকম অতি কমই দেখা যায়। ইহা একদিনে হেঁটে শেষ করা প্রচুর সামর্থ্যের কাজ। স্বামীজি বৃদ্ধ বয়সেও এই দুর্গম পথ অনায়াসে অতিক্রম ক'রতে প্রস্তুত, শুনে আমার মনে অত্যন্ত আনন্দ হ'লো।

নির্জন, সঙ্কীর্ণ, পার্বত্য-পথ দিয়ে তিন জনে চ'লছি। কারো মুখে কথা নেই, সকলেই নিজ নিজ চিন্তায় ব্যস্ত। মনটা ভারি উৎক্ষিপ্ত—চিরদিনের জন্য বদরিকাশ্রম ছাড়বার পূর্বে

www.pathagar.com

সুন্দর পথ, ঘাট, পরিচিত অপরিচিত প্রত্যেক লোকের বাড়ি—তুষারাচ্ছন্ন বঙ্কিম গিরি-নদী—ঊর্ধ্বে অগণ্য তুঙ্গশৃঙ্গ এবং পর্বতের মধ্যদেশে সমুন্নত সুন্দর বৃক্ষরাজী দেখতে দেখতে অগ্রসর হলুম। অনেকখানি বেলা হ'লো, আমরা হনুমান চটিতে উপস্থিত হ'য়ে জলযোগের যোগাড়ে মনোনিবেশ কল্লুম। অধিক বিলম্ব হ'লো না—প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আবার চ'লতে আরম্ভ করা গেল। প্রায় আধ মাইল যাবার পর পথিমধ্যে দেখি—একজন বাঙালী ভদ্রলোক আমাদের দিকে আসছেন। পোশাক আধা-সন্ন্যাসী আধা-গৃহস্থ রকমের, গৈরিক বসন, আর পায়ে জুতো, মাথায় ছাতা আছে ; বর্ণ গৌর ; চেহারা দেখে মনে হ'লো ভদ্রলোকটি সম্ভ্রান্তবংশাদ্ভব ; বয়স চল্লিশ বিয়াল্লিশ বৎসর হবে। আমি ও স্বামীজি একত্রই চ'লছিলুম। পথিক স্বামীজিকে দেখে "নমস্কার মশায়" ব'লে অভিবাদন ক'ল্লেন। স্বামীজি কিন্তু তাঁকে চিনতে না পারায় তিনি কিছু বেশী সঙ্কুচিত হ'য়ে প'ড়লেন। পথিক বদরিকাশ্রম সম্বন্ধে দুই চারিটা জ্ঞাতব্য কথা জিজ্ঞাসা ক'রে চ'লে গেলেন, নিজের কোন পরিচয়ই দিলেন না। তাঁর পরিচয় জানবার জন্যে আমার ভারি কৌতূহল হ'য়েছিল, কিন্তু স্বামীজিকে নীরব দেখে আমার কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে সাহস হ'ল না ; কারণ এ পর্যন্ত তাঁর যা কিছু আলাপ তা স্বামীজির সঙ্গেই হ'চ্ছিল, আমি মধ্যে থেকে দু' কথা জিজ্ঞাসা ক'রে কেন নিজের বর্বরতার পরিচয় দিই।

লোকটি বদরিকাশ্রমের উদ্দেশে চ'লে গেলেন। আমরাও গন্তব্য পথে চ'ল্লুম। স্বামীজি বার বার ব'লতে লাগলেন, আমি যেন পাণ্ডুকেশ্বর হ'তে বিষ্ণুপ্রয়াগ পর্যন্ত ভয়ানক রাস্তাটা খুব আস্তে আস্তে চলি। এদিকে প্রত্যেক কাজে তাঁর উপদেশের বিরুদ্ধাচারণ করা অভ্যাস হ'য়ে গেলেও আমি অতি সাবধানে এবং আস্তে আস্তে চ'লতে কৃতসঙ্কল্প হ'লুম। কিন্তু তবু চ'লতে চ'লতে সহসা গতিবৃদ্ধি হ'য়ে যায়—স্বামীজি অনেক পেছনে পড়েন,—আবার তাঁর জন্য খানিক অপেক্ষা করি।

ক্রমে পাণ্ডুকেশ্বরের বাজারের মধ্যে উপস্থিত হলুম। বেলা তখন প্রায় দুটো ; সূর্য পশ্চিম আকাশে একটু ঢ'লে প'ড়েছেন ; রোদ ঝাঁঝাঁ ক'রছে ; ভয়ানক রৌদ্র, পাহাড়গুলো অগ্নিময়—জলহীন, ধূসর, উলঙ্গ। বাজারের মধ্যে কদাচিৎ এক আধ জন লোক দেখা যাচ্চে। একখানা দোকান খোলা। দোকানদার সেখানে নেই ; আর একখানা দোকান—যে দোকানে আমি গতবারে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ ক'রেছিলুম, সেখানা বন্ধ ; বোধ করি দোকানী গ্রামান্তরে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহের চেষ্টায় গিয়েছে। আমি একবার ঘৃণাভরে সে দিকে অবজ্ঞা-পূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'ল্লুম। বড় ক্লান্তি বোধ হ'য়েছিল—এক একবার ইচ্ছা হচ্ছিল, একটু বিশ্রাম করা যাক। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কল্লুম না। যেমন সবেগে আসছিলুম, তেমনই চ'লতে লাগলুম। দূর পাহাড়ের গায়ে বহুদূরবিস্তৃত বৃক্ষশ্রেণী, তার নীচে দিয়ে যদি আমাদের গন্তব্য পথ হ'তো, তবে সেই স্নিগ্ধ ছায়াযুক্ত অরণ্য উপত্যকার শ্যামল আভা দেখতে দেখতে বেশ আরামের সঙ্গে পথ অতিক্রম করা যেত।

আরাম ভোগের কল্পনা ক'চ্ছি, দেবতার বুঝি তা সহ্য হ'লো না। চেয়ে দেখি সম্মুখে এক প্রকাণ্ড চড়াই। এতক্ষণে চড়াই উৎরাইএর আরম্ভ হ'লো ; সুতরাং বিনা প্রতিবাদে অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে চ'লতে আরম্ভ কল্লুম। পদদ্বয় অবসন্ন হ'য়ে এল, কিন্তু বিরাম নাই। বেলা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, বিষ্ণুপ্রয়াগ ভিন্ন এ পথে আর কোথাও 'আড্ডা' পাওয়া যাবে না। বৃদ্ধ স্বামীজিকেও গতিবৃদ্ধি ক'রতে হ'লো।

www.pathagar.com

বেলা ঘণ্টাখানেক থাকতে আমরা বিষ্ণুপ্রয়াগে এসে উপস্থিত হ'লুন। পূর্বের সেই মন্দিরে এবারও বাসা করা গেল। যে দোকানদারের জিম্মায় মন্দির ছিল, সে আমাদের দেখে বিশেষ উল্লাস প্রকাশ ক'ল্লে। আমরা কেমন ছিলুম, পথে কোন কষ্ট হয় নাই ত, ইত্যাদি অনেক কথা জিজ্ঞাসা ক'ল্ল। আমি একা দোকানে বসে। যেদিন এখান থেকে বদরিনাথ যাই, সেই দিনের সঙ্গে আজকার প্রভেদ অনুভব করতে লাগলুম। সে দিন কতখানি উদ্যম, উৎসাহ, একটা সুগভীর আকাঙ্ক্ষা এবং একাগ্রতা হৃদয়ের সমস্ত অভাব ও কষ্ট দূর ক'রেছিল। আমরা একটা উদ্দেশ্য একটা ব্রত ধারণ করে চ'লেছিলুম। সে ব্রত শেষ হ'য়েছে ; এখন হৃদয় শূন্য! এই সকল কথা ভাবছি, এমন সময়ে স্বামীজি এবং পশ্চাতে বৈদান্তিক ভায়া পরম স্মিতমুখে দর্শন দিলেন। বৈদান্তিককে সহসা ওষ্ঠমূলে হাস্যরসের অবতারণার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর দিলেন, "আজ খুব প্রতিজ্ঞা-পালন করা গেছে। একদমে আটারো মাইল, এই পাহাড়ে রাস্তা। এর চেয়ে জঙ্গলে ব'সে আনাহারে চক্ষু মুদে তপস্যা করা সহজ।" দোকানদারের পুত্র তার ক্ষুদ্র দেবতাটিকে মন্দিরের মধ্যে জাঁকিয়ে বসাল। আমরা সে রাত্রে প্রচুর অর্থ ব্যয় ক'রে অপ্রচুর আহার্য সংগ্রহপূর্বক কোন রকমে উদর-দেবতাকে পরিতৃপ্ত ক'ল্লুম। অনুষ্ঠানের যেটুকু ত্রুটি হ'লো, তা নিদ্রাতেই পুষিয়ে গেল। বহুকাল এমন নিদ্রাসুখ অনুভব করা যায়নি।

২রা জুন, মঙ্গলবার।—এবার ফেরৎ পথ ; কাজেই কবে কতদূর গিয়ে কোথায় আড্ডা নিতে হবে, তা পূর্বেই স্থির ক'রতে পারতুম। বিষ্ণুপ্রয়াগ হ'তে স্থির করা গেল, সকালে নয় মাইল চলে দ্বিপ্রহরে কুমারচটিতে থাকা যাবে। পূর্বদিন আঠারো মাইল চ'লে আমাদের শরীর কিছু বেশী শ্রান্ত হ'য়ে প'ড়েছে ; কাজেই গতি কিছু মন্থর। তার উপর আর এক বিপদ ; শেষরাত্রি থেকে ভারি মেঘ হ'য়েছিল। আমরা যখন রওনা হই, তখন অল্প অল্প বৃষ্টি প'ড়ছিল, কিন্তু অপেক্ষা না ক'রে বেরিয়ে পড়া গেল। খানিক পথ অতিক্রম ক'রতে না ক'রতেই বৃষ্টি ভয়ানক চেপে এল। সর্ব শরীর ভিজে গেল, তার উপর কম্বল ভিজে এমন ভারি হ'য়ে প'ড়লো যে, তা আর সঙ্গে নেওয়া যায় না। নিকটে তেমন কোন আড্ডা নেই যে বিশ্রাম করি। অগত্যা ভিজতে ভিজতেই চ'লতে হ'লো। যদি একবার ঝুপঝাপ ক'রে বৃষ্টি হ'য়ে থেমে যায়, তাকে পারা যায় ; কিন্তু এ পার্বত্য বৃষ্টি, সে রকম নয় ত! খানিকক্ষণ বৃষ্টি হ'য়ে গেল—চারিদিকে বেশ ফরসা হ'লো, একটু একটু রোদও উঠলো। কোথা থেকে হঠাৎ একখানা ঘোলা মেঘ এসে আবার খানিক বর্ষণ ক'রে গেল। যেন সোহাগের অশ্রু। সে বেশ হাসছে ; হঠাৎ কি একটা কারণ ঘটলো কি ঘটলো না —অমনি প্রবল অশ্রুবর্ষণ আরম্ভ হ'লো, সকলেই ব্যতিব্যস্ত। সকালে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে আমরা আট দশবার ভিজলুম ; ভারি বিরক্তি বোধ হ'তে লাগলো ; দুই তিনটি চড়াই উৎরাই পার হবার সময় পা পিছলে দুই একবার পদস্খলনের সম্ভাবনাও বড় প্রবল হ'য়ে উঠেছিল! সুখের বিষয় খুব সামলানো গেছে!

আজ সকাল হ'তে আমাদের নূতন পথ। কুমারচটি থেকে বের হ'য়ে যারা যোশীমঠে যায়, তারা খানিক দূর অগ্রসর হ'য়ে উপরের পথে যোশীমঠে প্রবেশ করে ; আর যারা বরাবর বিষ্ণুপ্রয়াগে আসে তাদের পথ নীচের দিক দিয়ে। আমরা বদরিনাথ দর্শনে আসবার সময় উপরের পথে যোশীমঠে গিয়েছিলুম এবং সেখান হ'তে একটা প্রকাণ্ড উৎরাই দিয়ে বিষ্ণুপ্রয়াগে নেমেছিলুম। এবার বিষ্ণুপ্রয়াগের টানা সাঁকো পার হ'য়ে আর চড়াইয়ে

www.pathagar.com

উঠলুম না ; নীচের পথে ধীরে ধীরে উঠতে লাগলুম। এ পথটা মন্দ নয়। খানিক দূর পর্যন্ত অলকানন্দার খুব নিকট দিয়ে গিয়েছে ; তারপর যোশীমঠের পথের সঙ্গে মিশবার জন্যে আস্তে আস্তে উপরে উঠেছে।

এ পথে একটা অতি সুন্দর দৃশ্য দেখলুম। বেলা প্রায় এগারটা ; মেঘ কেটে গিয়েছে এবং সূর্য পাহাড়ের অন্তরাল ছেড়ে ঊর্ধ্বে অনেক দূর উঠেছে ; কিন্তু তখনও সমস্ত প্রকৃতি সিক্ত ; তাতেই বোধ হচ্ছে, এখনও বেলা বেশী হয় নি। আমরা ধীরে ধীরে গ্রাম্যপথে প্রবেশ ক'রে দেখলুম, একটি গৃহস্থের মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে ; বিবাহের পর এই তার প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাত্রা। তখন আমোদে উৎসাহের মধ্যে গিয়ে শ্বশুরালয়ে দুই একদিন ছিল, আর আজ কতদিনের মত ঘরকন্না ক'রতে যাচ্ছে। তাই তার মা, মাসী, বোন এবং নিতান্ত আপনার জনের ন্যায় পাড়াপড়শীরা এসে রাস্তার ধারে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বিদায় দিচ্ছে। মেয়েদের কারও চোখ দিয়ে জল প'ড়ছে, কেউ তার হাতখান ধ'রে কত স্নেহের কথা ব'লছে। কিন্তু একটা ব্যাপার আমার সব চেয়ে মধুর বোধ হ'লো। যে মেয়েটি শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, তার কোলে একটি বছর দুইয়ের ছোট ছেলে ; অনুমান ক'ল্লুম সে তার ছোট ভাই। ভাইটি কিছুতেই তার শ্বশুরবাড়ি-গমনোন্মুখ দিদির কোল ছাড়বে না। যতই সকলে তাকে সাগ্রহে ডাকছে, ততই সে তার দিদির ঘাড়টি দু'হাতে ধ'রে বারে বারে মুখ ফিরুচ্ছে, বুঝি সে কত কালের মত তার দিদির স্নেহময় ক্রোড় হ'তে নির্বাসিত হ'তে বসেছে, তা বুঝতে পেরেই শিশু তার আজন্মের স্নেহাধিকার ত্যাগ ক'রতে অনিচ্ছা প্রকাশ ক'চ্ছে এবং অন্যান্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা একটা আসন্ন বিপদের কল্পনা ক'রে ডাগর চক্ষু মেলে চেয়ে রয়েছে।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখতে লাগলুম। এই পর্বতের উপরে পাহড়ে মেয়ের বিদায় দৃশ্য ; কিন্তু এই দৃশ্য আমাদের প্রীতিরসসিক্ত মাতৃভূমি, বহুদূরবর্তী বঙ্গের একটা মৃদুস্মৃতি মনের মধ্যে জাগিয়ে দিলে। সে যে বাঙলা, আর এ যে পশ্চিমদেশ, তা আমি ভুলে গেলাম ; শুধু মনে হ'লো সেখানেও যেমন মা ভাই, এখানেও তেমনি। দুই দেশের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর, কিন্তু হৃদয় ও স্নেহের মধ্যে সর্বত্রই অমর সম্বন্ধ সংস্থাপিত। বৈদান্তিক ভায়া বোধ করি, এ সমস্ত বিষয়ে এমন গভীরভাবে চিন্তা করেন না, সুতরাং মুগ্ধ হৃদয়ে এই বিদায় দৃশ্য দেখছি দেখে তিনি বিদ্রূপ ক'রে ব'ল্লেন, "আবার ভাব লাগলো বুঝি। পথে ঘাটে এ রকম ক'রে ভাব লাগলে চলা যায় না।" আমি তাঁর কথার কোন উত্তর দিলুম না—শুধু কঠোর দৃষ্টিতে একবার তাঁর দিকে চেয়ে চ'লতে লাগলুম।

আমার সঙ্গে জামাইটিও অগ্রসর হ'লো, সেই মেয়েটি আমার আগে আগে যেতে লাগলো। যুবক স্ত্রী নিয়ে ঘরে যাচ্ছে ; তার চিন্তা, তার কল্পনা ও সুখ প্রেমস্বর্গচ্যুত সন্ন্যাসীর আয়ত্তাধীন নয়। সংসারের এই মোহবন্ধনই সোনার বাঁধন!

কুমারচটির কাছেই যুবকের বাড়ি। সে সস্ত্রীক বাড়ির দিকে গেল, আমরা চটিতে প্রবেশ ক'ল্লুম। এখনও অনেক বেলা আছে, কিন্তু আজ শরীর বড় অবসন্ন ; তার উপর আবার দুর্যোগ আরম্ভ হ'লো। কতক্ষণ আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল, ভয়ানক মেঘ ক'রে পুনর্বার বৃষ্টি আরম্ভ হ'লো। পর্বত-প্রান্তে এক অন্ধকার কোণে একা পড়ে কত কথাই মনে আসতে লাগলো ; শুধুই বোধ হ'তে লাগলো,—

www.pathagar.com

"সংসার-স্রোত জাহ্নবীসম বহু দূরে গেছে সরিয়া,
এ শুধু ঊষর বালুকা ধূসর মরুরূপে আছে মরিয়া!
নাহি কোন গতি, নাহি কোন গান,
নাহি কোন কাজ, নাহি কোন প্রাণ,
ব'সে আছে এক মহানির্বাণ আঁধার মুকুট পরিয়া!"

২রা জুন, মঙ্গলবার।—অনেক বেলা থাকতে কুমারচটিতে পৌঁছান গিয়াছিল। চারিদিকে মেঘ খুব আঁধার ক'রে এসেছিল ব'লে বোধ হচ্ছিল বুঝি আর বেলা নাই। খানিকক্ষণ ঝুপঝাপ বৃষ্টি-বর্ষণের পরই মেঘ কেটে গেল, আকাশ পরিষ্কার হ'লো, রোদ উঠলো। তখন মনে হ'লো এখনও অনেক বেলা আছে। যদি বেরিয়ে পড়া যায় ত অনেক পথ এগিয়ে থাকা যাবে। স্বামীজির কাছে এই প্রস্তাব কল্লুম, তাতে তিনি রাজি হ'লেন। আর দেরী কি? অমনি লাঠি হাতে, ভিজে কম্বল ঘাড়ে নিয়ে চটি হ'তে রওনা হওয়া গেল ; কিন্তু সে পাহাড়ে রাস্তায় বেশী দূরে যাওয়া হ'লো না। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়লো ; পাহাড়ের অন্তরাল হ'তে অস্তমিত তপনের আলোতে যতক্ষণ বেশ পথ দেখা গেল, আমরা চ'লতে লাগলুম।। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে খুব মেঘ ক'রে এল। আমরাও একটা ক্ষুদ্র চটিতে রাত্রির মত আশ্রয় নিলুম। চটির নাম "পাতালগঙ্গা"। বদরিনাথে যাবার সময় আমরা এ চটিতে ছিলুম না, এমন কি এটা তখন আমাদের নজরেই পড়ে নি ; হয়ত তখন এ চটির জন্ম হয় নি! চটির নীচে দিয়ে যে ক্ষুদ্রকায়া ঝরণাটি ব'য়ে যাচ্ছিল, তারই নাম অনুসারে এর নাম পাতালগঙ্গা হ'য়েছে। পাতালগঙ্গা সত্যসত্যই পাতালগঙ্গা ; রাস্তা থেকে অনেক নীচে নেমে তবে নদীর কাছে যাওয়া যায়। কিন্তু চটিওয়ালাদের জলের সন্ধানে নদীতীর পর্যন্ত যেতে হয় না ; চটির গায়েই একটা ঝরণা আছে, তাতেই জল-কষ্ট নিবারণ হয়। এ দেশের চটি সকল দূরত্ব হিসাবে নির্মিত হয় না। যেখানে ঘর বাঁধবার সুবিধা, ঝরণা খুব নিকটে এবং জায়গাটা চটিওয়ালার বাড়ির যথাসম্ভব কাছে, সেইখানেই একটা চটি খোলা হয়। আমরা লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, কোন জায়গায় সাত আট মাইল তফাতে একটা চটি, আবার কোথাও মাইল মাইল চটি। আর সে সকল চটিরই বা কি শোভা। তা নির্মাণ করবার জন্যে চটিওয়ালাকে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না, খরচপত্রও কিছু নেই বল্লেই হয়। গিরিরাজ হিমালয়ের কোলের মধ্যে হাজার হাজার গাছ র'য়েছে, তার তলে প্রচুর লম্বা লম্বা ঘাস। গোটাকতক গাছের ডাল, আর বোঝাকতক ঘাস কেটে আনলে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে একখানা চটির ঘর তৈয়েরি হয়ে যায়। আর সেই পর্ণকুটীরে আশ্রয় নেবার জন্য কত ঝড়বৃষ্টিময়ী অন্ধকার রাত্রিতে আমরা ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছি ; তাও সব দিন অদৃষ্টে জুটে ওঠে নি। সেই পর্ণকুটীরে এলে আমরা যে রকম অকাতরে নিদ্রা যেতুম, তা মনে হলে এখনও কাতর হ'য়ে পড়ি। তখন কোন ভাবনা-চিন্তা ছিল না ; কেমন করে যে দিনপাত হবে, সে কথাও মনে আসতো না ; ভগবানের নাম নিয়ে সমস্ত দিন ঘুরে দারুণ পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে চটিতে এসে প'ড়তুম, খাওয়া হোক না হোক, কম্বল গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়া যেতো, আর কোথা থেকে হাটের ঘুম, মাঠের ঘুম, জঙ্গলের ঘুম এসে চোখের পাতা আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতো। ক্বচিৎ সেই সুখসুপ্তির মধ্যে বাল্যের নিশ্চিত জীবনের যৌবনের আবেগপূর্ণ সুখ-স্বপ্নের কথা মনে পড়তো। কখন মনে হ'তো, পাঠ্যাবস্থায় কলিকাতার সেই ক্ষুদ্র বাসাটিতে একখানি সতরঞ্চ বিছানো তক্তাপোষের

www.pathagar.com

উপর শুয়ে নবীন বিরাট দেহ দু-ভলুম ওয়েবষ্টারের ডিক্সনারীতে মাথা রেখে নিদ্রা যাচ্ছি। ও হরি! জেগে দেখলুম হিমালয়ের মধ্যে এক ভাঙা চটিতে ছেঁড়া কম্বল জড়িয়ে দিব্বি আরামে শুয়ে আছি, মাথার নীচে একটা ঘাসের আঁটি। বৈসাদৃশ্যটা বড় কম নয় ভেবে মনে মনে ভারি হাসি আসতো।

পাতালগঙ্গা চটিতে ঘর বেশী নেই, যাত্রীর সংখ্যাও নিতান্ত অল্প! যাত্রীর মধ্যে আপাততঃ আমরা তিনটি প্রাণী এবং একটা বিপুলকায় পাহাড়ী। আমরা যে ঘরে বাসা নিলুম, সেই ঘরের মধ্যে এক কোণে একটা লোক একখানা কম্বলে মাথা হ'তে পা পর্যন্ত সর্ব শরীর ঢেকে প'ড়ে রয়েছে দেখলুম। মনে হ'লো হয় ত কোন পথশ্রান্ত সন্ন্যাসী এই নির্জন কুটীরে সাধন-ভজনের পরিবর্তে নিদ্রাদেবীর উপাসনা ক'চ্ছেন; আমরা ঘরের মধ্যে সোরগোল কল্লেই বিরক্ত হ'য়ে তিনি হুহুঙ্কারে উঠে ব'সবেন। বাস্তবিক আমাদের কথাবার্তায় লোকটা উঠে ব'সলো; কিন্তু সে কোন সন্ন্যাসী নয়, ষোল সতের বৎসর বয়সের একটি বালক। ষোল সতের বৎসর বয়স হ'লে অনেকে দেখতে যুবকের মত হয়, কিন্তু ছেলেটিকে অনেক ছোট ব'লে বোধ হ'লো; শরীর ভারি রোগা। বোধ হ'লো, এখনও সে রোগভোগ কচ্ছে। আমরা তার সঙ্গে আলাপ করতে লাগলুম, স্বামীজি তার কাছে ব'সে গেলেন; আমাদের সঙ্গী পাহাড়ী আহারের জোগাড় করতে গেল।

আলাপ ক'রে দেখলুম, ছেলেটি অল্প-বিস্তর বাঙলা কথাও জানে, তবে বেশী বাঙলা বকে না, কিন্তু সে যেটুকু বাঙলা বলে তা বাঙালীর উচ্চারিত বাঙলার মত, খোট্টাই ধরণের নহে। তার উচ্চারণ আমাদের মতই সহজ এবং সরল কণ্ঠস্বর কোমল বিষাদাপ্লুত। আমার মনে ঘোর সন্দেহ হ'লো, এ হয় ত বাঙালী; হয়ত কোন কারণে মা বাপের উপর রাগ ক'রে, কি বাপ নেই, পরের কাছে উপেক্ষা বা অনাদর পেয়ে অভিমান ক'রে কোন যাত্রীর দলের সঙ্গে এ অঞ্চলে এসে প'ড়েছে। তার পর অনাহারে, পথশ্রমে এবং রোগে ক্লান্ত ও জর্জরিত হ'য়ে এই নির্জন পর্বতের নির্জনতার প্রান্তে জীবনমধ্যাহ্নের পূর্বেই অতর্কিত সন্ধ্যায় জীবন বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছে। একবার আমার জীবনের সঙ্গে তার জীবনের তুলনা ক'রে দেখলুম। সংসারে আমি সকল বন্ধনশূন্য, এরও কি তাই? চলতে চলতে পথিপ্রান্তে মৃত্যুকেই কি সে জীবনের শেষ ব্রত মনে ক'রেছে? আমার ন্যায় জীবনের সমস্ত বাসনা, সমস্ত আশা এবং আকাঙ্ক্ষাগুলিকে হৃদয় হ'তে একে একে খুলে নিয়ে নদীস্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে ত শূন্যমনে তাকে সংসার ত্যাগ করতে হয় নি? তার পথ ও আমার পথ কখন এক হ'তে পারে না; তার এই নবীন জীবনের নূতন উৎসাহ, অভিনব আশা, জাগ্রত আকাঙ্ক্ষা এবং প্রাণব্যাপী উচ্চাভিলায়, সমস্ত পরিত্যাগ ক'রে সে জীর্ণ চীর গ্রহণপূর্বক এক অনির্দিষ্ট জীবনপথে অন্ধের ন্যায় চ'লতে আরম্ভ ক'রেছে? এমন অতি কমই দেখতে পাওয়া যায়। আর যদি তার মা বাপ থাকে, তবে তাঁদের আজ কি কষ্ট! অভিমানী বালক হয় ত আজ এই রোগশয্যায় গভীর যাতনার মধ্যে বুঝতে পাচ্ছে, এ পৃথিবীতে যাদের কেউ নাই, তাদের কি দুর্ভাগ্য! জ্বর ও উদরাময়ে কষ্ট পাচ্ছে, এমন সময় যদি স্নেহময়ী মা এসে একটু গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন, কোমলহৃদয়া ছোট ভগিনীটি এসে যদি তার পাণ্ডুর শীর্ণ মুখখানির উপর দুটি করুণ চক্ষুর কোমল দৃষ্টি স্থাপন ক'রে ব'লতো "দাদা, এখন কেমন আছ" তা হ'লে হয় ত

www.pathagar.com

তার রোগযন্ত্রণা অর্ধেক কমে যেত। কিন্তু তার দিকে ফিরে চেয়ে যে একবার আহা বলে, এমন লোকটি নাই। পৃথিবীর এমন আলো তার কাছে অন্ধকার এবং জীবজগতের হর্ষকাকলী বোধ করি তার কাছে একটা বিকট আর্তনাদের মত বোধ হচ্ছে। বালকের কথা ভেবে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো। তন্ন তন্ন ক'রে তার সম্বন্ধে কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলুম। সব কথার ঠিক উত্তর পেলুম না। তবে জানতে পাল্লুম, আজ দু'দিন হ'তে এখানে সে প'ড়ে আছে ; কত লোক যাচ্ছে আসছে, কিন্তু তাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে না ; সঙ্গে দু' তিনটি টাকা ও আনা কয়েক পয়সা আছে ; যখন একটু ভাল থাকে, দু পয়সার বুট ভাজা না হয় বহুকালের প্রস্তুত ধূলিপূর্ণ দুর্গন্ধময় পচা প্যাড়া কিনে ক্ষুধাশান্তি করে। উদরাময় ও জ্বরের চমৎকার পথ্য! অন্য সম্বলের মধ্যে একখানি ছেঁড়া কম্বল, একটা কমণ্ডলু, আর একটা ছোট ঝুলি ; তার মধ্যে হয়ত দু' চারখানি ছেঁড়া কাপড় থাকতে পারে? সেটা আর অনুসন্ধান করা দরকার মনে হ'লো না। ছেলেটি ইংরাজীও জানে ; শুনলুম সে আম্বালা স্কুলে এনট্রেন্স পর্যন্ত প'ড়েছিল, পরীক্ষাও দিয়েছিল, কিন্তু পাশ করতে পারে নি। আমি একবার সন্দেহাকুল চক্ষে তার দিকে চেয়ে দেখলুম। এনট্রেন্স ফেল হ'য়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসে নি ত? আমি তাকে এনট্রেন্সের পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে প্রশ্ন কল্লুম ; তাতে সে যে সকল বইএর নাম ক'ল্লে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের তা পাঠ্য কিনা তা আমি তখন ঠিক জানতুম না ; তবে সে সকল বই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত বটে। The Book Worthies কখন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রেন্সের পাঠ্য ছিল ব'লে আমার মনে হয় না ; তবে ১৮৮৮ সালে ঐ বই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রেন্সের জন্য নির্বাচিত হ'য়েছিল ; সুতরাং বালকটি বাঙালী ব'লে আমার সন্দেহ দৃঢ়তর হ'লো! এমন সময় সে কি কাজের জন্য কুটীরের বাহিরে গেল। আমি স্বামীজিকে আমার সন্দেহের কথা জ্ঞাপন ক'ল্লুম। তিনি কিঞ্চিৎ আবেগের সঙ্গে উত্তর ক'ল্লেন, "ঠিক ও বাঙালী, তাতে আর সন্দেহ নেই। আমাদের কাছে নিশ্চয়ই সমস্ত কথা গোপন কচ্ছে।" ছেলেটি বাহির হ'তে আবার ভিতরে এসে বসলো। স্বামীজি তার নাড়ী পরীক্ষা ক'রে ব'ল্লেন, তখনও খুব জ্বর আছে, উত্তাপ ১০৩ ডিগ্রীর কম নয়। স্বামীজি বালকের মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি রেখে তাকে আমাদের সন্দেহের কথা ব'ল্লেন। কিন্তু সে যে বাঙালী, তা কিছুতেই স্বীকার ক'ল্লে না। সে ব'ল্লে আম্বালাতেই তার বাড়ি ; মা বাপ কলেরায় মারা গেছে, একটি মাত্র ভগিনী আছে, সেও শ্বশুরগৃহে। মনের দুঃখে সে গৃহত্যাগ করেছে। তার বাড়িতে যখন কেউ নেই, তখন পাহাড় পর্বতই তার বাড়ি ; তার কাছে ঘর বাড়ি, জঙ্গল সব সমান। সে বাঙালী নয়, একথা প্রমাণের জন্যে সে বিস্তর চেষ্টা ক'ল্লে, এবং তার সেই চেষ্টা দেখে আমাদর আরও মনে হ'লো, সে নিশ্চয়ই বাঙালী, কোন বিশেষ কারণে আত্মগোপন ক'চ্চে। আমি শেষে তাকে বল্লুম সে যদি বাড়ি থেকে রাগ ক'রে এসে থাকে, তবে আমরা তাকে আবার বাড়ি পৌঁছিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি ; আর যদি সে একান্তই বাড়ি ফিরে যেতে না চায় তা হ'লে সে আমাদের সঙ্গে যেতে পারে। দেরাদুনে ফিরে গিয়ে তার জন্যে যা হয় করা যাবে। সে আমার এ কথার কোন স্পষ্ট উত্তর না দিয়ে ব'ল্লে, "আপনারা কেন আমাকে বাঙালী মনে ক'চ্ছেন। আম্বালায় যে সকল বাঙালী বাবু আছেন, তাঁদের কাছে আমি বাংলা শিখেছি!" তার এ কথার উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে কল্লুম না। আমাদের পাহাড়ী সঙ্গী

www.pathagar.com

এমন সময় এসে খবর দিলে যে, আমাদের খাবার প্রস্তুত। বালকটিকে জিজ্ঞাসা করায় সে ব'ল্লে, তাহার অত্যন্ত ক্ষুধা হ'য়েছে, কাজেই আমাদের জন্যে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যের অংশ তাকে দেওয়া গেল। সে খাদ্যটা কি শুনবেন? মোটা আধপোড়া রুটি, আর খোসাওয়ালা কলায়ের ডাল। ১০৩ ডিগ্রী জ্বর ও উদরাময়গ্রস্ত রোগীকে যদি দেশে এই রকম পথ্য দেওয়া হ'তো তা হ'লে আমরা Culpable homicide not amounting to murder এই অভিযোগে শেষে দায়রা সোপর্দ হ'তুম; কিন্তু এই পর্বতের মধ্যে এ ছাড়া অন্য পথ্য কোথায় মিলবে? রাত্রে বালকটি দু'তিনবার উঠে বাইরে গেল, আমাদের ভয় হ'লো বুঝি আজই সে পেটের ব্যারামে মারা যায়। যে পথ্যের ব্যবস্থা, তাতে ভয় হবারই কথা; কিন্তু ছেলেটি ব'ল্লে, তার অবস্থা অনেক ভাল, এমন পরিপক্ক ডাল রুটী বহুদিন তার অদৃষ্টে জোটে নি। নিজে কষ্টেসৃষ্টে যা পারতো তাই বানিয়ে নিতো। আমরা বুঝলুম, এ "বিষস্য বিষমৌষধম" অর্থাৎ ইংরেজি কথায় হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা হ'য়েছে। ভরসা করি আমার ডাক্তার বন্ধুরা এ ঔষধের সমর্থন ক'রবেন। নিদ্রায় অনিদ্রায় কোন রকমে রাত্রি কেটে গেল।

৩রা জুন, বুধবার।—খুব ভোরে পাতালগঙ্গা চটি ত্যাগ ক'ল্লুম। ছেলেটি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চ'লতে লাগলো। তাকে নিয়ে আমাদের কিছু অসুবিধা হ'লো; কিন্তু সে দিকে দৃকপাত না ক'রে তার সঙ্গে অতি আস্তে আস্তে চ'লতে লাগলুম। তার শরীর মোটেই চলবার মত নয়; এদিকে তার জন্য পাতালগঙ্গায় দু-তিন দিন ব'সে থাকাও অসম্ভব, সুতরাং ধরে ধরে অগ্রসর হওয়াই সঙ্গত ব'লে বোধ হ'লো। চটি ত্যাগ করবার আগে স্থির করা গেল যে, আজ যে রকমেই হ'ক দুপুরের সময় পিপুলকুঠিতে পৌঁছে আহারাদি করতে হবে।

দুপুরের সময় পিপুলকুঠিতে পৌঁছান গেল। ছেলেটি সঙ্গে না থাকলে আমরা বোধহয় বেলা দশটার মধ্যেই এখানে এসে উপস্থিত হ'তে পারতুম; কিন্তু তা আর ঘটে ওঠে নি। আধ মাইল চলি, আর একটা গাছের ছায়ায়, কি ঝরণার কাছে এসে বসি; ঝরণা দেখলেই ছেলেটি ব'সতে চায়, অঞ্জলি পুরে জলপান করে; একটু বিশ্রাম করবার পর উঠে ধীরে ধীরে চ'লতে আরম্ভ করে।

পিপুলকুঠিতে আমাদের সেই পূর্বেকার চটিতে বাসা করা গেল। কিন্তু আজ পিপুলকুঠির ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত দেখলুম। গতরাত্রে এখানকার এক বেণিয়ার দোকানে চুরি হ'য়ে গিয়েছে। নগদ টাকা এবং সোনারূপার গহনা প্রভৃতিতে অনেক টাকা গিয়েছে। চোর মশায় কি উপায়ে গৃহপ্রবেশ ক'রে এই সাধু অনুষ্ঠানে কৃতকার্য হ'য়েছেন, তা কেউ ঠিক করতে পারেনি, কিন্তু তিনি যে বমাল সমেত দরজা খুলে বেরিয়ে গেছেন, তা স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল। লালসাঙ্গার থানায় খবর পাঠান হ'য়েছে; দু এক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিসের লোক এসে উপস্থিত হবে; সুতরাং বাজারের লোক কিছু ভীত ও ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। আমরা পূর্ববারে যে দোকানঘরে আড্ডা নিয়েছিলুম, তার সম্মুখেই এই বেণিয়ার দোকান। কারো প্রতি সন্দেহ হয় কি না জিজ্ঞাসা করায় সে ব'ল্লে, কাকে সে সন্দেহ ক'রবে? তার ত কোন 'দুষমন' নেই; কারো সে কখন অনিষ্ট করে নাই; কেন যে তার সর্বনাশ হ'লো, বিধাতাই জানে, এই ব'লে বেচারী কাঁদতে লাগলো। দোকানে কোন চাকর আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় জানতে পাল্লুম, দুইজন চাকর দোকনের মধ্যেই থাকে;

www.pathagar.com

বেণিয়া নিজে থাকে না, সপরিবারে উপরতলায় থাকে। বেণিয়ার আর কোন ভাই নেই, ছেলেপিলেগুলি সকলেই ছোট।

বেলা প্রায় একটার সময় দুই তিন জন লালপাগড়ি কনেষ্টবল সঙ্গে নিয়ে পুলিসের জমাদার সাহেব সেখানে এসে উপস্থিত হ'লেন। আমরা আমাদের চটির মধ্যে ব'সে জানালা দিয়ে জমাদার সাহবের কাণ্ড-কারখান দেখতে লাগলুম। মনে করেছিলুম, জমাদার এসেই চুরির তদারক আরম্ভ ক'রবেন ; কিন্তু তাঁর সে রকম ভাব কিছুই দেখা গেল না। ঘোড়া হ'তে নেমেই জিজ্ঞাসা করা হোলো, কোথায় তাঁর বাসা দেওয়া হ'য়েছে এবং তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিনা। কথার ভাবে বোধ হ'লো, মেজাজটা বড় গরম! জমাদার সাহেব একে সরকারী লোক, তার উপর সরকারী কাজে এসেছেন সুতরাং তাঁর কার্দানীতে ক্ষুদ্র পার্বত্য বাজার সশঙ্কিত হ'য়ে উঠলো ; কখন কার মাথা যায় তার ঠিক নেই।

যে বাসাটা জমাদার সাহেবের জন্য ঠিক করা হ'য়েছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে তা তাঁর পছন্দ হ'লো না। তিনি গম্ভীর মুখে এবং ভারি রাগ ক'রে আমাদের চটির পাশে আর একটা বাড়ির বারাণ্ডার একটা চারপায়ার উপর ব'সে প'ড়লেন। বেণিয়া তার সকল কষ্ট ভুলে হাস্যমুখে প্রচুর উপহারের সঙ্গে জমাদার মহাশয়ের অভ্যর্থনা করতে পারে নি, এই তার অপরাধ, এবং এই অপরাধের জন্যে তিনি কনেষ্টবল বেষ্টিত হ'য়ে তর্জন গর্জন পূর্বক ব'লতে লাগলেন যে, চুরির কথা সমস্ত মিথ্যা, এই শঠ বেণিয়া অনর্থক সরকারকে হয়রাণ করবার জন্য চুরির এজাহার দিয়েছে, বাজারের লোকেরও এতে যোগ আছে। শুনে বাজারের লোক আতঙ্কে আড়ষ্ট হ'য়ে প'ড়লো। জমাদারকে শান্ত করবার জন্যে অবিলম্বে তাঁর সম্মুখে স্তূপাকার খাদ্যদ্রব্যের অর্ঘ্য এনে হাজির করা হ'লো। নানা রকমের জিনিস। সে সকল এতই বেশী যে, জমাদার সাহেব সগোষ্ঠী মিলে তিন দিনেও তা উদরস্থ করতে পারেন না। এই উপহারস্তূপ দেখে হাকিম সাহেবের মেজাজটা একটু নরম হ'লো ; তিনি আয়াস স্বীকার ক'রে তখন ধূমপানে মনোনিবেশ ক'ল্লেন। ধূমপান শেষ হ'লে বোধ করি চুরির কথাটা তাঁর মনে পড়লো। তিনি নিকটস্থ লোকগুলির দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন, "কোন দোকানে চুরি হ'য়েছে?"—দশ বারজন লোক একসঙ্গে তাঁর কথার জবাব দিল। বেণিয়া কাঁদতে কাঁদতে এসে তার সর্বনাশ হ'য়েছে এই কথা 'আরজ' ক'রতে যাচ্ছিল, এমন সময় জমাদার সাহেব হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "ব্যস, চুপ।"—হতভাগ্য বেণিয়া সঙ্গে সঙ্গে সাত আট জন দোকানী এই হুঙ্কার শব্দে বিচলিত হয়ে দশ হাত তফাতে সরে দাঁড়ালো। হায়! এই দূর পার্বত্যপ্রদেশে এখানেও সেই বঙ্গীয় পুলিসের অভিন্ন মূর্তি ; তেমনই কর্কশ এবং কঠোর। ইহারাই আবার দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনকর্তা! বুঝি পুলিস সর্বত্রই সমান।

হঠাৎ একটা কঠিন হুকুম জারি হ'লো। জমাদার সাহেব হুকুম দিলেন যে, আজ বাজারের দোকানদার কি 'মুসাফির' লোক যত আছে, চুরির তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেহই স্থানান্তরে যেতে পারবে না। আমাদের চটিওয়ালা মনে করেছিল আমরা বুঝি জমাদার সাহেবের এই কঠিন আদেশ শুনতে পাই নি, তাই সে আমাদের কাছে এসে সংবাদ দিলে যে আজ আমাদের পিপুলকুঠিতে থাকতে হবে ; চুরির তদন্ত শেষ না হলে আমরা স্থানান্তরে যেতে পাচ্ছিনে। স্বামীজি বললেন, "সুসংবাদ বটে! একেই বলে, "উদোর ঘাড়ে বুদোর বোঝা।" যে ভাবে জমাদার সাহেব তদন্ত আরম্ভ ক'রেছেন, তাতে

www.pathagar.com

তদন্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত যদি এখানে অপেক্ষা ক'রতে হয় ত ইংরেজী মাসের এ ক'টা দিন এখানেই কাটিয়ে যেতে হবে। যা হোক, যা হয় করা যাবে ভেবে আমরা আহারাদিতে মনঃসংযোগ কল্লুম। এদিকে জমাদার সাহেব ষোড়শ উপচারে আহার সম্পন্ন ক'রে নিদ্রাদেবীর উপাসনায় প্রবৃত্ত হ'লেন। বেলা তিনটের পর আমরা চটি ত্যাগ করা মনস্থ কল্লুম ; কিন্তু জমাদার সাহেবের কঠোর হুকুম লঙ্ঘন করলে পাছে বিপদে পড়তে হয়, এই ভেবে একটা উপায় স্থির করা অবশ্যক ব'লে বোধ হ'লো।

জমাদার সাহেব তখন নিশ্চিন্তমনে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ; দোকানদারেরা কেহ কেহ দ্বারপ্রান্তে বসে হুজুরের নিদ্রাভঙ্গের প্রতীক্ষা কচ্ছে। আমরা কি করি, তাই ভাবতে লাগলুম। স্বামীজি বললেন, জমাদার সাহেবকে বলে চলে যাওয়াই ভাল। কিন্তু সে ভারটা কে গ্রহণ করবে? একটু গুছিয়ে কথাগুলো বলা চাই, এবং আবশ্যক হ'লে ভয় দেখানও কর্তব্য হবে। এই রকম অভিনয়ে আমা অপেক্ষা স্বামীজি পটু নহেন, সুতরাং আমি এই কার্যভার গ্রহণে সম্মত হলুম।

জমাদার সাহেবের আড্ডায় হাজির হয়ে দেখলুম, সাহেব ঘোরতর নাসিকা গর্জন ক'রে নিদ্রা যাচ্ছেন, কনেষ্টবলেরা নিকটেই বসে আছে। আমি একজন কনেষ্টবলকে বল্লুম যে, প্রভুকে একবার জাগান দরকার—বিশেষ কাজ আছে। কনেষ্টবলের কানে বোধ করি এ রকম অদ্ভুত কথা আর কখনও প্রবেশ করেনি ; ঘুমন্ত জমাদারকে জাগান, আর ঘুমন্ত বাঘের গায়ে খোঁচা মারা, এ তারা একই রকম দুঃসাহসের কাজ বলে মনে করে ; সুতরাং অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি নাছোড়াবান্দা ; পুনর্বার তাকে এ কথা বলা হ'লো। এবার কনেষ্টবল সাহেব ভ্রূকুটিভঙ্গে আমার দিকে চাইলেন, পাছে হুজুরের নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই ভয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠতে পাল্লেন না। আমি দেখলুম এ এক বিষম সমস্যা। শেষে খুব চেঁচিয়ে কথা কইতে লাগলুম, অভিপ্রায় আমার গলার আওয়াজে জমাদার সাহেবের নিদ্রাভঙ্গ হ'ক। ফলেও তাই হলো। আমার কণ্ঠস্বরে প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হলো ; তিনি চক্ষু রক্তবর্ণ করে বল্লেন, "কোন চিল্লাতা হ্যায়?" সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলেন। সম্মুখেই আমাকে দেখে ভারি গরম হয়ে কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "ক্যা মাঙ্গাতা"? অনেকদিন এদেশে থেকে পুলিসের লোকের চরিত্র সম্বন্ধে আমার অনেকখানি অভিজ্ঞতা জন্মেছে। এরা প্রবলের কাছে মেষশাবক, কিন্তু দুর্বলের বাঘ! সুতরাং জমাদার সাহেব "ক্যা মাঙ্গাতা" বলবামাত্র আমিও তেমনি সুরে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন কল্লুম। আমরা যে তখনই চলে যেতে চাই, কোথা হতে এসেছি, কোথা যাব, আমরা ক'জন আছি, সমস্ত তাঁকে খুলে বলা হলো। তিনি "আবি নেহি হোগা" বলে ফরসীর নলে মুখ লাগালেন। আমি দেখলুম, সহজে কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা নেই ; তখন আর একটু চড়া মেজাজে ইংরেজী ও হিন্দুস্থানীতে মিশিয়ে কথা ব'লতে আরম্ভ কল্লুম। তাকে সোজাসুজি জানিয়ে দিলুম যে, সে যদি আর এক দণ্ডও আমাদের আটকে রাখে, তবে তার মস্তক ভক্ষণের সুব্যবস্থা করবো। রাস্তার কোথাও কোন পুলিসের লোক কোনরকম কুব্যবহার করলে তখনই ইনস্পেক্টরকে জানাবার ভার আমার উপর আছে। ইনস্পেক্টরের সঙ্গে যে আমার বন্ধুতা আছে, সে কথা তাকে জানিয়ে দিলুম, এবং আজ কয় দিন হলো, কর্ণপ্রয়াগে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, তাও বল্লুম। জমাদার যে ভাবে চুরির তদন্ত কচ্ছেন, আমি তা দেখে যাচ্ছি ; এ কথা গোপন থাকবে না।

www.pathagar.com

আমার কথা শুনে লোকটা একদম নরম হয়ে গেল। কাপুরুষদের বিশেষত্ব এই যে, তারা প্রথমে মুখে যতই তর্জন করুক না কেন, কিন্তু ভয়ের কোন কারণ উপস্থিত হলেই একেবারে পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়। এ ক্ষেত্রেও তা হলো। জমাদার সাহেব ফরসি ছেড়ে আমার সঙ্গে ভদ্রালাপ আরম্ভ করলেন এবং আমাদের প্রতি আদেশ দিলেন যে, আমরা যখন ইনস্পেক্টরের জানিত লোক এবং ইনস্পেক্টরের সঙ্গে বন্ধুতাও আছে, তখন আমরা "চোট্টা কি ডাকু" হ'তেই পারিনে ; আমরা যখন ইচ্ছা চটি ত্যাগ করতে পারি ; অনেকেই সন্ন্যাসীর সাজ নিয়ে চুরি-ডাকাতি ক'রে বেড়ায় বলে, সকলের প্রতি তাঁকে পুলিসোচিত সন্দিগ্ধ ভাব প্রকাশ করতে হয় এবং ইহা তাদের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফল। আমরা যদি খানিক আগে আত্মপ্রকাশ করতুম, তা হলে তাঁকে বাধ্য হয়ে এ রকম রূঢ়তা প্রকাশ করতে হতো না। তিনি আরও প্রকাশ করলেন যে, চুরির তদন্ত তিনি অনেক আগেই আরম্ভ করতেন, কিন্তু আজ তাঁর "তবিয়ত আচ্ছা নেই" তাই কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর তদন্ত আরম্ভ করা মনস্থ করেছেন ; এতে সরকারী কাজের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। আর আমি এ সকল কথা যেন ইনস্পেক্টরের গোচর না করি। হাস্যমুখে তাকে অভয়দান ক'রে চটি ত্যাগ করবার উদ্‌যোগ করতে লাগলুম ; জমাদার সাহেবও তদন্ত আরম্ভ ক'রলেন।

সেই এক বাজার পাহাড়ী লোকের মধ্যে দারোগা সাহেবকে খুব খানিকটে অপদস্থ ক'রে আমরা চটি ত্যাগ ক'ল্লুম। বলা বাহুল্য তখন মনে মনে প্রচুর আত্মপ্রসাদ লাভ করা গিয়েছিল ; এবং দারোগার দর্প চূর্ণ করবার দরুণ তার পরেও কিছু ক্ষোভের কারণ জন্মায় নি, তবে মনটা বিশেষ প্রসন্ন ছিল না। থানার দারোগা মফঃস্বলের সর্বত্রই যমের এক একটি আধুনিক সংস্করণ ; কনেষ্টবলগুলি যমদূত ; কিন্তু সেকালের যম ও যমদূতের সঙ্গে একালের দারোগা এবং কনেষ্টবলদের অনেক বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। দারোগা সাহেবদের হাতে যমের ন্যায় কোন রকম দণ্ড না থাকলেও তাঁদের দোর্দণ্ডপ্রতাপে মফঃস্বলবাসীদিগের সশঙ্কিত থাকতে হয়, এবং যদিও যমদূতদিগের শেল, মুষল, মুদগর ও পাশ একালে লৌহনির্মিত হাতকড়া ও রুল নামক অনতিদীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ডে পরিণত হয়েছে, তথাপি সাহসপূর্বক বলা যায় যে, যম ও যমদূতের হাতে অন্ততঃ সাধুদিগের কোন আশঙ্কা ছিল না, কিন্তু পুলিসের হাতে সাধু অসাধু কারও রক্ষা নেই। অতএব এ রকম ক্ষমতাশালী দারোগা সাহেব তাঁর হাতার মধ্যে একজন নগ্নপদ রুক্ষকেশ, কম্বলধারী মুসাফির সন্ন্যাসীর কাছে এরূপভাবে অপদস্থ হয়ে তাঁর অমোঘ হুকুম ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়ে সাধারণের সম্মুখে যে গৌরব হতে বঞ্চিত হলেন, তাঁর সেই হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে তাঁকে অনেক হয়রাণ হতে হবে এবং আমাদের দোষে হয় ত অনেক নিরপরাধ বেচারা তাঁর হাতে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করবে। অনেক অসাধু লোকের এ রকম স্বভাব যে, যদি তারা নিজের কুকর্মের জন্য কারও কাছে নিগ্রহ ভোগ করে, তা হলে আর পাঁচটা নিরীহ লোককে নিগৃহীত করতে না পারলে তারা কিছুতেই শান্তি পায় না ; যতক্ষণ সে রকম কোন সুবিধা না পায় ততক্ষণ মনে করে তার অপমানটা সুদ সমেত অনাদায় থেকে গেল।

এই সকল কথা ভাবতে ভাবতে এবং তৎসম্বন্ধে বৈদান্তিক ভায়া ও স্বামীজির সঙ্গে রহস্যালাপ করতে করতে আমরা অপরাহ্ণে পর্বতগাত্রস্থ সঙ্কীর্ণ পথ ধরে চলতে লাগলুম। তখনও সূর্য অস্ত যায় নি। সূর্য ধূসর পাহাড়ের অন্তরালে খানিকটে ঢলে পড়েছিল, এবং

www.pathagar.com

তার লাল আভা পার্বত্য গাছপালার উপর দিয়ে আকাশের অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। অল্পক্ষণ পরে আকাশের পশ্চিম দিগন্তে একটু মেঘ দেখতে পেলুম ; সূর্যাস্তের পূর্বে নীল আকাশের লোহিতাভ প্রদেশের অতি ঊর্ধ্বে দুই একটা কালো পাখী যেমন ছোট দেখায় তেমনি ক্ষুদ্র একখণ্ড মেঘ ;—ক্রমে মেঘখানি বড় হতে লাগলো ; শেষে মোড় ঘুরে দেখি সম্মুখে পাহাড়ের উপর মেঘের দল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে ; বোধ হল যেন তারা পরামর্শবদ্ধ হয়ে কোন আগন্তুক শত্রুর প্রতীক্ষা কচ্ছে। আমরা বৃষ্টির জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুর্গম দীর্ঘ পথের উপর সহসা এরকম ঘনঘটা দেখে মনটা বড় অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো ; ভাবলুম আর যাই হোক, দারোগার শাপটা হাতে হাতে ফলে গেল। দেখছি কলিযুগেও কিছু মাহাত্ম্য আছে ; সত্যযুগে শুনেছি ব্রাহ্মণ যোগী-ঋষির শাপে অগ্নিবর্ষণ হতো, ব্রহ্মতেজে অভিশপ্ত ব্যক্তি দগ্ধ হয়ে যেত, আর এই কলির শেষ মুসলমান দারোগার শাপে বুঝি অজস্র বৃষ্টিধারায় আমরা ভেসে যাই। এখন কোথায় আশ্রয় নেওয়া যায়, এই চিন্তায় মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

কিন্তু এখানে আশ্রয় জুটানও বড় সহজ কথা নয়। এ সহর অঞ্চলের পথ নয় যে, ঝড়বৃষ্টির উপক্রম দেখলে কোন বাড়ির দ্বারে আশ্রয় নেব। একবার পথে বেরুলে সহজে গ্রাম নজরে পড়ে না ; যদিও দুই বা চারি ক্রোশ অন্তর এক আধখানা গ্রাম দেখা যায়, সে গ্রাম আর কিছুই নয়, পাঁচ সাত কি বড় জোর দশখানি কুটিরের সমষ্টি মাত্র। গোটাকতক মহিষ ছাগল আর জনকতক স্ত্রী পুরুষ এবং তাহাদের ছেলে মেয়ে এই গ্রামের অধিবাসী। যে কয়খানা কুটির, তা হয়ত তাদের নিজের ব্যবহারের জন্যই যথেষ্ট নয়। এই পথে চ'লতে চ'লতে অনেক সময় বিপদে প'ড়ে এ রকম গ্রামে গৃহস্থের ঘরে আশ্রয় নিতে হ'য়েছে, কিন্তু ঘরে আশ্রয় নিয়ে সমস্ত রাত্রি বাহিরেই কাটিয়েছি। আমাদের দেশে একটা কথা আছে ; একবার একজন লোককে জিজ্ঞাসা করা হ'য়েছিল যে, সে এতটা পথ কি রকম ক'রে এল, তাতে সে লোকটা উত্তর ক'রেছিল যে "নৌকাতেই এসেছি, তবে সমস্ত রাস্তাটা গুণ-টেনে।" আমাদের এ পার্বত্য আশ্রয়ও ঠিক সেই রকমের ; গৃহস্থের ঘরে আশ্রয় পাওয়া গিয়েছিল বটে কিন্তু সমস্ত রাত্রি অনাবৃত আকাশতলেই কাটাতে হ'য়েছে। কেউ মনে ক'রবেন না যে, আমি গ্রামবাসীদের আতিথেয়তার দোষ দিচ্ছি ; তারা বাস্তবিকই অত্যন্ত আতিথেয়। পার্বত্য গৃহস্থ দুর্গম হিমালয়ের নিভৃত বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়, তাই অনেক যাত্রীর প্রাণরক্ষা হয়। বাস্তবিক যদিও তারা গরীব এবং কায়ক্লেশে পর্বত বিদীর্ণ ক'রে যে মুষ্টিমেয় গম বা ভুট্টা সংগ্রহ করে, তারই তিনখানা রুটির একখানা ক্ষুধিত অতিথিকে দিতে কিছুমাত্র কাতর হয় না ; এবং অতিথির প্রতি তাদের যে যত্ন আগ্রহ, তা অপার্থিব। কিন্তু পরের জন্য নূতন ক'রে ঘর বেঁধে রাখতে পারে না। পাহাড়ের গায়ে বৈঠকখানা তৈয়েরি করবার মত জমি মেলে না। অনেক খুঁজে পাহাড়ের যেখানে সামান্য একটু চাষের উপযুক্ত জায়গা পায়, তারই এক কোণে দুই পাঁচ ঘর গৃহস্থ ছোট ছোট কুটির তৈয়েরি করে, বাকি জমিটা চাষ করে। কাজেই অতিথির মাথা রাখবার মত স্থান কখন মেলে, কখন মেলে না।

যা হোক আমাদের সম্মুখে ত আপাততঃ বৃষ্টি উপস্থিত, ঝড় হওয়াও আশ্চর্য নয়। তিনটি প্রাণী ঘোর তুফান মাথায় ক'রে চ'লেছি, এক একবার আকাশের দিকে চাচ্ছি, আর অগ্রসর হ'চ্ছি। কিছু লক্ষ্য নেই তবু ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে ছুটে চলছি,—কথাটা আশ্চর্য

www.pathagar.com

বটে, কিন্তু আমরা কেউ নির্বাক হ'য়ে চলছি নে। দারোগার সঙ্গে আমার যে কথান্তর হ'য়েছিল, তাহা লক্ষ্য ক'রে বৈদান্তিক ভায়া উল্লেখ কল্লেন যে, লোকের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করা সাধুসন্ন্যাসী মানুষের উচিত নয়, তাতে প্রত্যবায় আছে। তাঁর মত নৈয়ায়িক-প্রবর যে এই শব্দবিন্যাসের মধ্য হইতে অকারণ কথাটা অনায়াসে বাদ দিলেন, সে জন্যে তাঁর সঙ্গে তর্ক করবার প্রলোভনটা সংবরণ করা দায় হ'লো। আমি সবে গৌরচন্দ্রিকা ফেঁদে বিষম একটা তর্কজাল বিস্তার ক'রবো এবং সেই অবসরে অনেক দূর নির্ভাবনায় যাওয়া যাবে ঠিক ক'রেছি, এমন সময় স্বামীজি আমাদের ডেকে বল্লেন সম্মুখে একটা ভয়ানক ঝড় উঠেছে ; সময় থাকতে আমাদের সাবধান হওয়া দরকার, আর তর্ক করবার সময় নাই। স্বামীজি আমাদের আগে আগে যাচ্ছিলেন। এক মিনিটের মধ্যে ঝড় আমাদের উপর এসে পড়লো। স্বামীজি তৎক্ষণাৎ পাহাড়ে ঠেস দিয়ে ব'সে প'ড়লেন। প্রবল বাতাসে কতকগুলা পাতা উড়ে স্বামীজিকে ছেয়ে ফেল্লে, তিনি ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে প'ড়লেন, কিন্তু দেখলুম বৈদান্তিক ভায়া তর্ক ক'রতে বিশেষ মজবুদ হ'লেও তাঁর উপস্থিত-বুদ্ধিটা আমার চেয়ে অনেক বেশী। তিনি অন্য উপায় না দেখে এবং বেশী কিছু বিবেচনা না ক'রে আমাকে কোলের মধ্যে চেপে ধ'রে রাস্তার পাশে উবু হয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি তাঁর শরীরের নীচে প'ড়ে রইলুম ; তিনি তাঁর বিপুল শরীর দিয়ে আমাকে ঢেকে রাখলেন। বাতাসটা আমাদের উপর দিয়ে এত জোরে ব'য়ে গেল, এবং আমাদের এমন নাড়া দিলে যে, বোধ হ'লো যেন সেই দণ্ডেই আমাদের দু'জনকে উড়িয়ে নিয়ে পথের পাশে গভীর খাদের মধ্যে ফেলে দেবে ; কিন্তু দেখলুম বৈদান্তিকের শরীরে অসাধারণ বল। সেই প্রবল ঝঞ্ঝাবাতটা তিনি অকাতরে সহ্য ক'ল্লেন। আমাদের নাকমুখের ভিতরে যে কত ছাইভস্ম প্রবেশ ক'রলো তার শেষ নাই। বাতাস চ'লে গেলে আমরা চেয়ে দেখলুম, গাছের পাতা ধূলো কাঁকর আর রাস্তার ছোট ছোট পাথরের মধ্যে আমরা সমাহিত হ'য়েছি ; দু'জনেই গা-ঝেড়ে উঠলুম ; উঠে দেখি বৈদান্তিক ভায়ার পিঠ জায়গায় জায়গায় কেটে গেছে, এবং সেখান হ'তে অল্প অল্প রক্ত প'ড়ছে ; পাঁচ সাত জায়গায় ছড়ে গিয়েছে। বড় বড় কাঁকর খুব জোরে এসে পিঠে লাগতেই এ রকম হ'য়েছে। আমার কোন ক্ষতি হয় নি, শুধু একবার দম আটকে গিয়েছিল। ঝড়বৃষ্টির সময় পক্ষীমাতা যেমন তার ক্ষুদ্র, অসহায় শিশুটিকে বুকের মধ্যে নিয়ে তার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ও যত্ন এবং সুকোমল প্রসারিত পক্ষপুট দিয়ে ব্যাকুল আবেগের সঙ্গে ঢেকে রাখে, আজ এই ঘোর ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে বৈদান্তিক তেমনি নিজের শারীরিক কষ্ট উপেক্ষা ক'রে শরীর দিয়ে আমাকে রক্ষা ক'রেছেন ; নিজের যে কষ্ট হ'য়েছে, সে দিকে একটুও লক্ষ্য নেই। আমার শরীরে যে আঘাত লাগেনি এতেই তাঁর মহা আনন্দ। বৈদান্তিকের সহৃদয়তা, মহত্ত্ব এবং আমার প্রতি করুণ স্নেহ দেখে স্বতঃই আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতা-রসে ভিজে গেল। বিপদের সময় ভিন্ন যে মানুষ চেনা যায় না, বিপদই মানুষের কষ্টিপাথর, তা তখন বুঝতে পারলুম। এই সংসারবিরাগী, শুষ্কহৃদয়, তর্কপ্রিয় পুরুষভাষী বৈদান্তিকের সঙ্গে অনেক দিন হ'তেই একত্র ঘুরে বেড়াচ্ছি। শরীর শক্ত, মানুষ প্রকাণ্ড উঁচু, মাথার চুলগুলো আবড়া-খাবড়া, ঠিক খেজুর গাছের মত ; মনে হ'তো এর মধ্যে শুধু তর্কেরই ইন্ধন সঞ্চিত আছে ; এতে আর কিছু পদার্থ নেই ; কিন্তু আজ বুঝতে পাল্লুম. এই কঠিন দেহের মধ্যে এতখানি অতি সুকোমল স্নেহার্দ্র হৃদয় আছে, এবং তার ঐ অতিবিশাল

www.pathagar.com

বক্ষ আর্তের স্নেহনীড়। কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে আমার চক্ষে জল এলো। আমরা উঠে দাঁড়ালে স্বামীজি তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে ছুটে এলেন ; আমরা কেমন ক'রে রক্ষা পেয়েছি শুনে তিনি বৈদান্তিকের গায়ে তাঁর স্নেহাশীর্বাদপূর্ণ হাতখানি বুলিয়ে দিলেন। স্বামীজির ভাবে বোধ হ'লো, আমাকে এমন করে রক্ষা ক'রছেন ব'লে বৈদান্তিককে তিনি তাঁর প্রাণের মধ্য হ'তে নীরব আশীর্বাদ প্রেরণ ক'রেছিলেন। দুই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর এ কি ব্যবহার? বৈদান্তিক বিপদের সময় আমার কাছে ছিলেন, ধর্মশাস্ত্র অনুসারে তিনি না হয় নিজের প্রাণ দিয়ে পরের প্রাণ রক্ষা ক'রেছেন ; কিন্তু স্বামীজি সংসারের উপর বীতস্পৃহ হ'য়ে লোটা কম্বল মাত্র সার ক'রে বেরিয়ে প'ড়েছেন ; তাঁর এ আসক্তি, মায়াবন্ধন, এ বিড়ম্বনা কেন? কোথায় ভগবানের নামে বিভোর হয়ে তিনি সময় কাটাবেন, না শুধু আমার সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য তিনি ব্যস্ত। এই পর্বতের মধ্যে শত কার্যে আমার প্রতি তাঁর স্নেহের পরিচয় পেয়েছি। আজ দেখলুম আমার জন্য তাঁর আগ্রহ, উৎকণ্ঠা —স্নেহবন্ধনে বদ্ধ গৃহীর আগ্রহ, উৎকণ্ঠা অপেক্ষা অল্প আসক্তি বর্জিত নয়। তাই একবার আমার ইচ্ছে হ'লো তাঁকে চেঁচিয়ে বলি, সাধু সন্ন্যাসী, এই কি তোমার সংসার ত্যাগ, ইহারই নাম কি মায়ার বন্ধন ছেদন? সমস্ত ছেড়ে হিমালয়ের মধ্যে এসেও তোমার আসক্তি বিদূরিত হ'লো না। শেষে কি ব'লবে যে, "এই লেড়কা হামকো বিগাড় দিয়া" —কিন্তু এত কথা মুখ দিয়ে বাহির হ'লো না ; শুধু বল্লুম, "আমার প্রতি আপনার মায়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্চে, এটা কিন্তু ভাল নয়।" তিনি এবার জবাবে আমাকে যা ব'লেছিলেন, তেমন দেববাণী আমি আর কখন শুনি নি ; তিনি ব'ল্লেন, "আমি সংসার ছেড়ে এসেছি, সংসারে আমার কেহ নাই, তোমার সঙ্গেও আমার কোন সম্বন্ধ নেই। তোমার উপর আমার হৃদয়ের নিঃস্বার্থ স্নেহবর্ষণ ক'রে আমি প্রেমময়ের প্রেম-মন্দিরে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত ক'রচি। তুমি আমার কে?"

আমি নিরুত্তর রইলুম। অল্প অল্প বৃষ্টি প'ড়তে আরম্ভ হ'লো, তাতে পথ আরো পিচ্ছিল এবং দুরারোহ হ'য়ে উঠলো। আমরা তিনটি প্রাণী নীরবেই চ'লছি, কিন্তু বোধ করি মন চিন্তাশূন্য নয়! চারিদিকে ঘোর মেঘ, দূরে পাহাড়ের কোলে বড় বড় গাছগুলোতে বাতাস বেধে একটা অস্পষ্ট বিকট শব্দ উঠচে, যেন বহুদূরে উন্মত্ত দৈত্যদল দুর্ভেদ্য পর্বতদুর্গ বিদীর্ণ করবার জন্যে প্রবল আস্ফালন ক'রচে। আমরা কখন অতি ধীরে, কখন দ্রুতপদে চ'লে অনেক বিলম্বে নারায়ণচটি নামক একটা খুব ছোট চটিতে উপস্থিত। শুনলুম এ জায়গাটা পিপুলকুঠি হতে সবে দু মাইল। শুনে আমার বিশ্বাস হ'লো না, আমাদের দেশে দু মাইল তফাৎ ব'ল্লে এ-পাড়া ও-পাড়া বুঝায় ; বৌবাজার হ'তে শ্যামবাজার দু মাইলের বেশী নয় ; কিন্তু এ কি রকম গজের দু' মাইল তা বুঝতে পাল্লুম না ; এ যদি দু'মাইল রাস্তা হয়, তা হ'লে স্বীকার করতে হবে, এর সঙ্গে আরো পাঁচ সাত মাইল 'ফাউ' যোগ করা ছিল।

ইতঃপূর্বে আমাদের সঙ্গেকার যে রোগা ছেলেটির কথা ব'লেছি, আমরা তাকে কাতর দেখে আহারান্তেই আগে রওনা ক'রেছিলুম, কারণ সে যেরকম রোগা, তাতে সে যে আমাদের সঙ্গে চ'লতে পারবে, সে ভরসা ছিল না ; তার উপর যদি তাকে আগে রওনা না করা যেতো তা হ'লে দেখছি, পথে এই দৈব-দুর্যোগের মধ্যে সে নিশ্চয়ই মারা পড়'তো। যাহোক দারোগা সাহেব আমাদের চটি ত্যাগ করবার নিষেধবার্তা জারী

www.pathagar.com

করবার পূর্বেই সে বেরিয়ে প'ড়েছিল। কথা ছিল সে সম্মুখের চটিতে এসে আমাদের জন্যে অপেক্ষা ক'রবে ; আমরা নারায়ণচটিতে পৌঁছে দেখলুম, সে আমাদের অপেক্ষায় ব'সে আছে। পথে জল ঝড়ে আমাদের কি দুরবস্থা হ'চ্ছে ভেবে বেচারী বড়ই চিন্তিত ও বিমর্ষ হ'য়ে ব'সেছিল। আমরা ভিজতে ভিজতে নারায়ণচটিতে উপস্থিত হ'লুম ; আমাদের দেখতে পেয়ে তার রোগক্লিষ্ট শুষ্কমুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো, আমরাও তাকে সুস্থদেহে সেখানে উপস্থিত দেখে খুব আনন্দিত হ'লুম।

নারায়ণচটিতে যখন পৌঁছান গেল, তখনও দেখলুম বেলা আছে। পাতলা মেঘের দল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হ'য়ে চারিদিকে উড়ে যাচ্ছে ; রোদ একটুও নেই ; গাছের ডালে নানা রকম পাখী ব'সে তাদের সিক্ত পাখা ঝাড়চে, আর কলরব ক'রচে। এখানে দু'পাঁচজন মানুষের মুখ দেখে আমরা অনেকটা আশ্বস্ত হলুম। এ চটিও পাহাড়ের এক অতি নির্জন নেপথ্যে ; লোকালয় নেই বল্লেও অত্যুক্তি হয় না ; তবু এখানে এসে মনে হ'লো, আমরা জনমানবশূন্য নির্জন প্রান্তর ছেড়ে যেন একটা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ ক'রেছি। পুরুষেরা নিশ্চিন্ত মনে গল্প ব'লছে ; মেয়েরা দু তিন জন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাসছে, কথাবার্তা ব'লছে, অপরিচিত কয়েকজন সন্ন্যাসীকে দেখে কৌতুক-বিস্ফারিত চোখে আমাদের দিকে চেয়ে জনান্তিকে কি বলা-কহা ক'রছে ; আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এদিকে ওদিকে দৌড়ে বেড়াচ্ছে ; পথের উপরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রাশীকৃত ভিজে কাঁকর জড় ক'রছে, কিম্বা অদূরবর্তী গাছের তলা হ'তে রাশি রাশি শুকনো পাতা কুড়িয়ে আনছে। চারিদিকে বেশ একটা জীবনের হিল্লোল ; এবং সজীবতার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে।

এই চটিতে দু'খানা ঘর। ঘর দু'খানা নিতান্ত চটির মতন নয়, একটু বড় বড়। আমরা বদরিনারায়ণে যাবার সময় এ চটিটা দেখতে পাই নি। এই রাস্তা দিয়েই গিয়েছি, তাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু তখনও বোধ হয় এ চটি খোলা হয় নি, কি হয়ত কোন গৃহস্থের বাড়ি ভেবে এদিকে না তাকিয়েই চ'লে গিয়েছি। সম্ভবতঃ তখন বিশেষ দরকার হয় নি ব'লেই এ বিষয়ে উপেক্ষা ক'রেছিলুম, এখন ফিরবার সময় এই চটির সম্ভাবনার কথা একবারও আমাদের মনে হয় নি বলেই আমরা মেঘ দেখে ভারি ভয় পেয়েছিলুম ; কারণ আমাদের মনে হ'য়েছিল, এত নিকটে বুঝি আর চটি পাওয়া যাবে না। যাহোক, এই চটিতে আজ আমরা কয়জন মাত্র যাত্রী। অন্য কোন যাত্রী নেই দেখে আমাদের মনে বড়ই ভরসা হ'লো, কারণ যদি আমাদের আগে কোন যাত্রীর দল আসতো, তা হলে চটিতে যে সামান্য খাদ্যসামগ্রী পাবার সম্ভাবনা, তা তারা পঙ্গপালের মত সমস্ত নিঃশেষ ক'রে চটির দোকানখানিকে গজভুক্ত কপিত্থবৎ নিতান্ত অসার ক'রে রাখত ; আমরা দারুণ পথশ্রমে, এবং তা অপেক্ষাও নিদারুণ ক্ষুধা নিয়ে অনাহারেই প'ড়ে থাকতুম। যৎকিঞ্চিৎ পানাহার হ'তে বঞ্চিত হ'তে হবে না ভেবে, আমরা অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত এবং আনন্দিত হ'লুম। বৈদান্তিক ভায়া পেটের চিন্তাতে এতই বিভোর হ'য়ে প'ড়েছেন যে, তাঁহার পিঠের বেদনার দিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। চটিতে যাত্রীর ভীড় নেই দেখে তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁর সেই দীর্ঘ নিঃশ্বাসকে ভাষায় তর্জমা করতে হ'লে এই ভাবনাখানা দাঁড়ায় যে "রাম, বাঁচা গেল, একটা বাজে লোকও এখানে আসেনি দেখচি, তা হ'লে এখানে দু'টো খাবার এবং একটু মাথা রেখে আরাম করবার অসুবিধা হবে না।"

www.pathagar.com

চটিতেই দোকানদারকে দেখতে পেলুম। তার বাড়িও এই চটির নিতান্ত কাছে, একেবারে লাগাও বল্লেই হয়। রাস্তার বাঁ-ধারে পাহাড়ের ঢালুর দিকে দু'খানা দোকানঘর, আর ডানপাশে একটু উঁচু জমিতে তার বসতবাড়ি। দোকানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে একটু উপর দিকে নজর ক'ল্লেই তার বাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। আজ এতদিন পরে তার সেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট চটিখানার কথা লিখছি, এখনও যেন সেই ঘর, দ্বার, বাড়ি আমার চক্ষুর সম্মুকে চিত্রের মত ভাসচে। তার বাড়িখানিও বেশ সুন্দর। আমাদের বঙ্গদেশের সমভূমিতে পল্লীগ্রামের সাধারণ গৃহস্থ-বাড়ি যে রকমের, ঠিক সেই রকমের নয় বটে, কিন্তু তার সেই পার্বত্য-পল্লীর সামান্য বাড়িটাতে আমাদের পল্লীগ্রামের অনেকটা ভাব পরিস্ফুট দেখা গেল, তেমনই জাঁকজমকহীন পরিষ্কার সরল মাধুর্যমণ্ডিত, রাঙামাটির দেওয়ালের উপর নানা রকমের ফল ফুল লতা-পাতা-কাটা, পল্লীগ্রামের অজ্ঞাতনামা, রবিবর্মার হাতে তৈয়েরি অদ্ভুত রকমের পাখীর ছবি; ছবিগুলিতে যে পরিমাণেই শিল্পচাতুর্যের অভাব থাকুক, কিন্তু সেই শিক্ষিত হস্তের অঙ্কনভঙ্গীর মধ্যে একটা আগ্রহের ভাব ফুটে উঠেছিল। সুন্দর ক'রে আঁকবার জন্যে একটা ব্যাকুলতা, আর তাতে স্থায়িত্ব স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা তার প্রত্যেক রেখার মধ্যে দেখা যাচ্ছিল, সেইটিই সকলের চেয়ে আমার কাছে সজীব এবং সুন্দর ব'লে বোধ হ'চ্ছিল। পৃথিবীতে সকলে সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করে না, কিন্তু যারা সিদ্ধিলাভের জন্যে চেষ্টা করে, অসিদ্ধ হ'লেও তাদের প্রাণপণ চেষ্টাটা উপেক্ষার বস্তু নয়।

দোকানদারের বাড়িতে দুখানা ঘর ; একখানা বেশ বড়, তাতেই সে সপরিবারে বাস করে, আর একখানা ছোট কুঁড়ে—বোধ হ'লো গোয়াল, কিন্তু তখন সে ঘরের মধ্যে গরু ছিল না। একটা মাঝারি গোছ বেলগাছতলাতে দু'তিনটে গরু বাঁধা ছিল, এবং একটা ছোট বাছুর পাহাড়ের একধারে ছুটাছুটি ক'রে বেড়াচ্ছিল। বাছুরটা এক-একবার তাহার মায়ের দৃষ্টির বাহিরে গেলেই তার পয়স্বিনী মাতা মাথা উঁচু ক'রে প্রসারিত চক্ষে ঘন ঘন সে দিকে তাকিয়ে দেখচে, যেন সেই রজ্জু-বদ্ধ গাভীটির সকরুণ মাতৃস্নেহ অক্ষয় কবচ হ'য়ে তার চঞ্চল বৎসটিকে কোন অনিশ্চিত বিপদ হ'তে রক্ষা ক'রতে চায়। এই বেলগাছের অদূরে আরও একটা বেলগাছ এবং দু'টো পেয়ারা গাছ। এখন পূর্বাভাস মাত্র, ফুল এবং ছোট ছোট ফলে পেয়ারা গাছ দু'টি ভ'রে গিয়েছে। গোয়ালের পাশে এক ঝাড় কলাগাছ, তেমন সবল নয় এবং পাতাগুলো ছোট ছোট, যেন পাহাড়ের শুষ্ক নীরস জমি হ'তে তারা যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যরস সংগ্রহ ক'রতে পাচ্ছে না। দোকানদারের বাড়ির ঠিক নীচে দিয়ে একটা ঝরণা ব'য়ে যাচ্ছে ; জল গভীর নয়, কিন্তু অতি নির্মল, এবং এই ক্ষুদ্র গ্রামখানির প্রাণস্বরূপিণী। দোকানদারের বাড়ির সম্মুখে একটুখানি সমতল জমি আছে, মাঝখানে একটা মধ্য-আকৃতির বটগাছ ; গোড়াটা পাথর দিয়ে বাঁধান ; আমাদের দেশের কোন কোন গাছের তলা যেমন ইঁট পাথর দিয়ে বাঁধান হয়, সে রকম নয় ; কতকগুলো বড় বড় পাথর গোল ক'রে গাছের গোড়ায় দেওয়া। পাথরগুলি সমস্তই আলগা তবে তার উপর ব'সলে ধোসে পড়বার কোন সম্ভাবনা নেই। সকালে অনেকেই এই গাছের তলায় ব'সে গল্পগুজবে দু'দণ্ড কাটিয়ে দেয় ; ধ'রতে গেলে এই গাছতলাই দোকানদারটির বৈঠকখানা। আমরা এই দোকানদারের দোকানে রাত্রির মত আশ্রয় নিলুম।

আমরা যে দোকানে আশ্রয় নিয়েছিলুম, সেই দোকানদারের বাড়ি ও দোকান খুব

www.pathagar.com

কাছাকাছি ব'লে সে দোকান এবং ঘরের দু'জায়গার কাজই চালাতে পারে। তার ক'টি ছেলে মেয়ে তা জানি নে, তবে একটি একটু বড় মেয়ে দোকানে এসে আমাদের জিনিসপত্র এনে দিয়েছিল।

আমরা আজ সত্যসত্যই একটা প্রকাণ্ড ভোজের আয়োজন ক'রে ফেল্লুম। দোকানে চাউল মিললো না, এ পাহাড়ে রাস্তায় অতি কম জায়গাতেই চাউল পাওয়া যায়, অনেকদিন পরে পিপুলকুঠিতে একদিন পাওয়া গিয়েছিল। চাউল না পাবার কারণ এই যে ভাতভক্ত বাঙালী এদিকে প্রায়ই তীর্থ ক'রতে আসে না ; যে দু-পাঁচজন আসে, তারা অল্পদিনের মধ্যে অগত্যা ডাল-রুটিতে অভ্যস্ত হ'য়ে পড়ে। দোকানদারের মেয়ে আমাদের জন্যে আটা নিয়ে এল। আটার চেহারার বর্ণনাটা এখানে দিতে পাল্লুম না ; সেটা আমার দোষ নয়, বঙ্গভাষায় তার উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করবার চেষ্টায় একেবারে হয়রাণ হয়ে গিয়েছি ; তবে কাব্যরসবঞ্চিত বৈদান্তিকের মুখে একটা উপমার কথা শুনা গিয়েছিল। তিনি আটার রং দেখে বলেছিলেন "এ কি আটা? তবু ভাল ; আমি ভাবছি বুঝি খোল পিষে এনে দিয়েছে।"—কথাটা শুনে আমার মনে একটা তত্ত্বকথার উদয় হ'লো। ; আমি ব'ল্লুম, "আমাদের মনরূপ গাড়োয়ান এই দেহরূপ গুরুগুলোর নাকে দড়ি দিয়ে ক্রমাগত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে ; কাঁধের জোয়ালও নামচে না, যাত্রার অবসান নেই। শুধু মহাপ্রাণীটাকে কোন রকমে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে সন্ধ্যাবেলা এই রকম চারিটি খোল বিচালীর বন্দোবস্ত হ'লো।" স্বামীজি সকল অবস্থাতেই অটল ; তিনি ব'ল্লেন, "অচ্যুত, আজ তুমি যেমন পিঠে খেয়েছ, তেমনি এই আটা দিয়ে লুচি তৈয়েরি ক'রে তোমাকে পেটে খাওয়াতে পারতুম ত বড় আনন্দ হ'তো।"—"সে ত আর কঠিন কথা নয়" ব'লে আমি দোকানদারের দোকানে প্রবেশ ক'ল্লুম এবং তার ঘিয়ের ভাঁড়টা বাদ সমস্ত ঘিটুকু নিয়ে এলুম। দোকানদার আমাদের এই ভোজন ব্যাপারে স্বয়ং পরিশ্রম দ্বারা সাহায্য ক'রতে অঙ্গীকার ক'রলে। সে তার বাড়ি হ'তে জিনিসপত্র এনে আমাদের যোগাড় ক'রে দিলে, তার মেয়েটি আমাদের কাছেই বসে রইল। উনুন জ্বলছে, আটা মাখা হ'চ্ছে, একটি ছোট প্রদীপে ছোট ঘরখানি আলোকিত হ'য়েছে, আর মেয়েটি যুক্তাসনে ব'সে তিনটি অপরিচিত অতিথির কাণ্ডকারখানা দেখছে ; একবার বা আমাদের দিকে চাইতেই আমাদের সঙ্গে যেমন চোখোচোখি হোচ্ছে, অমনি মুখ নামিয়ে দু'হাতের দশটা অঙ্গুলী নিয়ে খেলা করচে। আমি বারবার তার মুখের দিকে চেয়ে দেখছিলুম ; মুখখানি যে খুব সুন্দর তা নয়, তবে ভারি সরলতাপূর্ণ। চোখের উপর কালো ভ্রূ ; সমস্ত মুখখানি এবং রুক্ষ অপরিচ্ছন্ন চুলের উপর প্রদীপের আলো প'ড়ে তাকে একটি পবিত্র আরণ্য-ফুলের মত দেখাচ্ছিল ; সুন্দর না হোক কিন্তু তার সুবাস ঢাকা থাকে না। এই মেয়েটি তার ক্ষুদ্র-জীবনের কয়েক বৎসর মধ্যে আমাদের মত কত অপরিচিত পথিক দেখেছে, কতদিন কত লোকের সুখ দুঃখের সঙ্গে তার জীবনের একদিনের সুখ দুঃখ আনন্দ মিশিয়ে দিয়েছে। সংসারের সকল বন্ধন কেটে যারা সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়েছে, পুত্রকন্যার স্নেহের টান এই দূর হিমালয়শৃঙ্গেও যাদের হৃদয়কে সবলে আকর্ষণ ক'রেছে—এমন কত লোক এমনি সন্ধ্যাবেলা এই কুটীরে প্রদীপের আলোতে এই মেয়েটির কচি মুখখানি দেখে চিরবিদায়-ক্লিষ্ট হৃদয়ে আপনার একটি সুন্দর ছোট মেয়ের করুণ আহ্বান অনুভব ক'রেছে, হঠাৎ একটা অব্যক্ত মধুর ব্যথায় তাদের বুকের শিরাগুলো টনটন ক'রে উঠেছে। এই

www.pathagar.com

সকল কথা ভাবতে ভাবতে আমি কুটীরের এক কোণে শুয়ে ঘুমিয়ে প'ড়েছিলুম। বৃষ্টি ও ঝড়ে আমার শরীরটেও বড় কাতর হ'য়েছিল, কাজেই আমাকে ঘুমুতে দেখে কেউ জাগিয়ে দেন নি। শেষে কতক্ষণ পরে জানিনে, স্বামীজির ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল, দেখি তখনো মিটিমিটি ক'রে আলো জ্বলছে, উনুনের আগুন নিবে গিয়েছে, মেয়েটিও চলে গিয়েছে, তার বদলে থালের উপর অনেকগুলি গরম লুচি, খোসাওয়ালা 'রহড়কা ডাল' আর ছোট একতাল গুড়, তাতে বালী কাঁকর প্রভৃতি এমন অনেক জিনিস প্রচুর পরিমাণে মিশানো, যা কোন কালে খাদ্যশ্রেণীর মধ্যে ধর্তব্য হ'তে পারে না। কিন্তু তাই পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করা গেল। আমার অনুরোধক্রমে দোকানদার তার মেয়েটিকে নিয়ে এল, বোধ হয় সে ঘুমিয়েছিল। প্রথমে কিছুতেই সে খাবার নিতে চায় না, শেষকালে তার বাপের উপদেশে কিছু কিছু নিলে। দোকানদার নিজের বা গৃহিণীর হাতের রান্না ভিন্ন খায় না, ব্রাহ্মণদের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ব'লে নিজের পরিচয় দিল, সুতরাং আমাদের এই আনন্দভোজন হ'তে তাকে বঞ্চিত হ'তে হ'লো। আমরা খুব পরিতোষের সঙ্গেই আহার কল্লুম, পথের সমস্ত কষ্ট এবং ক্ষুধা এই গরম পুরী ও 'রহড়কা ডালের' সঙ্গে পরিপাক হ'য়ে গেল। আমাদের সঙ্গী রোগা ছেলেটির প্রতিও এই পথ্যের ব্যবস্থা হ'লো ; কিন্তু এ ব্যবস্থার সমালোচনা করবার উপযুক্ত লোক সেখানে ছিল না ; এক স্বামীজি নাড়ি টিপতে জানতেন, কিন্তু তিনিই রোগা ছেলেটিকে স্বহস্তে 'ডাল ও পুরী' দিলেন।

আহারান্তে আবার নিদ্রা—অতি চমৎকার নিদ্রা। এই দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হ'য়ে আমাদের সকল জিনিসেরই অভাব ছিল, অভাব ছিল না কেবল একটি জিনিসের, সেটি হচ্ছে—সুনিদ্রা। বাস্তবিকই এই অতিদুর্গম দীর্ঘ পথে নিদ্রা আমাদের সন্তাপহারিণী মায়ের মত হ'য়েছিল। এই নিদ্রার অভাব হ'লে বোধ করি আমরা এতটা কষ্ট সহ্য ক'রতে পারতুম না। বিছানা ত কোন দিন জোটেই নি, কোনদিন কদাচিৎ পর্ণকুটীরে মাথা রাখবার জায়গা পেয়েছি ; অধিকাংশ সময়ই হয় অনাবৃত পর্বতবক্ষে না হয় গাছের তলায় রাত্রি কাটাতে হ'য়েছে ; কিন্তু তখন সেই পর্বত গহ্বরে ভূমিশয্যায় কম্বল মুড়ি দিয়ে যেমন ঘুম হ'তো, সেরূপ নিদ্রালাভ করার জন্যে এখন কতদিন সুকোমল শয্যার উপর শয্যাকণ্টক ভোগ ক'রতে হ'য়েছে। সন্ধ্যার সময় শুয়েছি, আর এক ঘুমেই রাত্রি ভোর হয়েছে ; সঙ্গে সঙ্গে শরীরের জড়তা, পায়ের বেদনা, মনের অবসন্ন ভাব দূর হ'য়ে গিয়েছে ; সম্মুখের বড় বড় উৎরাইগুলো ভাঙতে কিছুই কষ্ট বোধ হয় নি। আজ এই বাঙ্গালাদেশে সে সব কথা স্বপ্ন ব'লে মনে হয়, আরও দিনকতক পরে হয় ত মনেই ক'রতে পারবো না যে, আমার দ্বারা এমন একটা গুরুতর কাজ সম্পন্ন হোয়েছিল।

৪ঠা জুন, বৃহস্পতিবার।...আজ সকালে যাত্রা আরম্ভের উদ্‌যোগ করলুম। স্থির করা গেল লালসাঙ্গা গিয়ে দু'পুর বেলা বিশ্রাম ক'রতে হবে। লালসাঙ্গার কথাটা আমার এখনও বেশ মনে আছে। এই পথ দিয়ে নারায়ণে যাবার সময় এইখানেই সেই জুতোচোর সাধুর বিড়ম্বনা দেখেছিলুম। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আজও কিছু লজ্জাজনক ব্যাপার দেখতে হ'লো। নারায়ণচটি হ'তে লালসাঙ্গা ছয় মাইল, পথের বর্ণনার আর দরকার নেই। আজ এই একমাসের উপর হ'তে শুধু চড়াই ও উৎরাই, নামা আর উঠা, পর্বত নির্ঝর এবং নির্ঝর পর্বত এই নিয়েই আছি। এসব কথা শুনতেও বোধ হয় কাহারও আর ভাল লাগবে

www.pathagar.com

না, কিন্তু এখন নেমে যাচ্ছি, আর কখন এ সব জায়গাতে ফিরে আসতে পারব না—তাই ভেবে মনে বড় কষ্ট হ'চ্ছে। একরাত্রিও যে দোকানে বাস করেছি, সেটা ছাড়তে মনে হ'চ্ছে যেন চিরকালের জন্য একটা আশ্রয় ছেড়ে চ'ল্লুম। নারায়ণে যাবার সময় মনে হ'য়েছিল যেন মহাপ্রস্থানের পথে স্বর্গে চলেছি। এখন মনে হ'চ্ছে আবার সেই আকাঙ্ক্ষা-কাতর ধূলিময়, রৌদ্রদগ্ধ পৃথিবীতে ফিরে যাচ্ছি। আমার চিরদিনের মাতৃভূমিতে যাচ্ছি এই যা কিছু সান্ত্বনা ; কিন্তু সেখানেও দুঃখ যন্ত্রণা, হাহাকারের বিরাম নেই।

এই সকল কথা ভাবতে ভাবতে চ'লতে লাগলুম ; শেষে বিস্তর চড়াই উৎরাই ভেঙে শ্রান্তদেহে বেলা প্রায় এগারটার সময় লালসাঙ্গায় পৌঁছলুম। আজ আমার পথশ্রম বড়ই বেশী হয়েছিল। ধীরে ধীরে চলা আমার অভ্যাস নয়, এ কথা পূর্বেই ব'লেছি, চলতে চলতে মাঝরাস্তাতে ব'সে আমি কোনদিনই বিশ্রাম ক'রতে পারি নি। যেদিন যতটুকু যাওয়া দরকার, এক দম চ'লে, তারপর হাত পা ছড়িয়ে সে দিনের মত ছুটি। এইরকম হিসাবে চ'লে আসা যাচ্ছিল, কিন্তু আজ আমাকে বাধ্য হ'য়ে এ অভ্যাস ছাড়তে হ'লো। আমাদের সঙ্গে সেই রোগা ছেলেটি আছে ; সে নিতান্ত ভালমানুষ, মুখে কথাটি নেই। তাকে সঙ্গে ক'রে পথ চলা বড় কঠিন ; পাছে দ্রুত চ'লতে তার কষ্ট হয়, এই ভেবে আমি বড় আস্তে আস্তে চ'লছিলাম। সে দশ পা যায়, আবার নিতান্ত অবসন্ন হ'য়ে পড়ে ; তখন গাছের ছায়ায় কি পাথরের পাশে ব'সে তাকে অঞ্জলি পুরে ঝরণার জল খাওয়াই, ইংরেজী পুঁথির দু' চারটে ভাল গল্প বলি, কখন বা দুই একটা কবিতা বলে তার মনটা প্রফুল্ল করবার চেষ্টা করি। তারপর আবার তাকে নিয়ে উঠি—ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে তাকে নানারকমের অদ্ভুত গল্প ব'লে—মা যেমন ছোট ছেলেটির মন গল্পে আকৃষ্ট ক'রে তাঁর চঞ্চল শিশুটিকে ঘুমের রাজ্যে নিয়ে যান, তেমনি আমিও তার অজ্ঞাতসারে তাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, অজ্ঞাতসারে তার গতিবৃদ্ধি হ'চ্ছে। এই রকম ক'রে ছয় ঘণ্টায় প্রায় ছয় মাইল পথ পার হ'য়ে লালসাঙ্গায় হাজির হওয়া গেল।

নারায়ণে যাওয়ার সময় লালসাঙ্গার বাজারটি পর্যন্ত ঘুরে দেখি নি। এবার লালসাঙ্গায় এসে সেবারকার সেই দোকানের উপর ঘরেই বাসা নেওয়া গেল। আহারাদির বন্দোবস্তের ভার সঙ্গীদের উপর সমর্পণ ক'রে বাজার দেখতে বেরিয়ে পড়া গেল।

বাজারের ঘরগুলি বেশ বড় বড়, অধিকাংশই দোতলা। দোকানগুলিতে প্রচুর পরিমাণে জিনিসপত্র আছে। চারিদিক দেখতে দেখতে আমি বাজারের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হ'লুম। সেখানে একটা ছোট অথচ বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কুটীরের সম্মুখে একটু জনতা দেখতে পেয়ে সেখানে গিয়ে দেখি চার পাঁচজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপার কি জানবার জন্যে একটু অগ্রসর হ'য়ে দেখি, দু'জন স্ত্রীলোক হিন্দী ও বাঙালায় কথা মিশিয়ে ঝগড়া ক'রচে। এই দূরদেশে বাঙালা কথা তা আবার স্ত্রীলোকের মুখে। আমি আরও খানিকটে অগ্রসর হ'লুম। সে সময় আমার চেহারা এমন হ'য়েছিল যে, আমার অতি নিকটবন্ধু আমাকে বাঙালী ব'লে সন্দেহ করতো না, সুতরাং সেখানে যে সমস্ত পাহাড়ী দাঁড়িয়ে ঝগড়া দেখছিল, আমিও তাদের মধ্যে একজন হ'য়ে প'ড়লুম। কিন্তু গিয়ে দেখি সেখানে না গেলেই ভাল হ'তো। সে দৃশ্য দেখে আমার যেমন কষ্ট তেমনি রাগ হ'লো। অনেক দিন হতেই সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে চলা-ফেরা, আহার উপবেশন ক'চ্চি, সাধারণের কাছে আমিও একজন সন্ন্যাসী ব'লে পরিচিত কিন্তু সাধুসন্ন্যাসীর মধ্যে থেকেও সন্ন্যাসীর জাতের

www.pathagar.com

উপর শ্রদ্ধা অপেক্ষা আমার অশ্রদ্ধাই বেশী হ'য়েছে। সন্ন্যাসীদের দূর হ'তে দেখতে বেশ ; কোন আসক্তি নেই, বিলাস-লালসা, সংসার চিন্তার নামমাত্র নেই ; মুক্ত, স্বাধীন, বন্ধনহীন ; কিন্তু শরীরের উপরের মত তাদের অধিকাংশেরই মনের ভিতরে এত ময়লা-মাটি যে, এদের ঘৃণা করাই অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে বোধ হয়। শ্রেষ্ঠতীর্থ কাশীধামের পবিত্রতার আবরণতলে যে বীভৎস কাণ্ডের অভিনয় হয় পবিত্র সন্ন্যাসী- নাম গ্রহণ ক'রে কত সমাজ-তাড়িত লোক যে সন্ন্যাসধর্মের উপর কলঙ্ক ঢেলে দিচ্ছে, তার আর অবধি নেই। অধিকাংশ সন্ন্যাসীই শুধু গাঁজাখোর, ভিক্ষুক, কোপন-স্বভাব ; সকল দোষের ঝুলি নিয়ে তীর্থে তীর্থে পাপের বীজ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তবে বাঙালী সন্ন্যাসীর সংখ্যা নিতান্ত কম, তাই তাদের কুকীর্তি বলবার কোন সুযোগ হয় না, কিন্তু খুঁজে দেখলে বাঙালী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর মধ্যেও অনেক ভণ্ড নজরে পড়ে।

আজ যে স্ত্রীলোক দুটিকে প্রকাশ্য বাজারের মধ্যে দাঁড়িয়ে অশ্লীল ভাষায় ঝগড়া ক'রতে দেখলুম, তারা বাঙালী সন্ন্যাসিনী, ভৈরবী বেশ, পরিধানে গৈরিক বস্ত্র, সিঁথিতে রক্তচন্দনের কি সিন্দূরের ফোঁটা, রুক্ষকেশপাশ আলুলায়িত, হস্তে ত্রিশূল ও কমণ্ডলু, গলে রুদ্রাক্ষের মালা, কাঁধের ঝুলি বোধ হয় কুটীরের মধ্যে আছে ; অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই, যাত্রার দলে নির্লজ্জ ছোকরারা যেমন গোঁফ কামিয়ে সন্ন্যাসিনীর পোষাকে দর্শকদিগের সম্মুখে দর্শন দেয়, কিছুমাত্র সংকোচ কিংবা শ্লীলতা নেই, এদের দু'জনেরও ঠিক সেইভাব দেখা গেল। অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি না থাকলেও এদের আর কিছুই নেই ; ধর্ম নেই, কর্ম নেই, সতীত্বের সৌকমার্য নেই। স্ত্রীলোক দুজন মধ্যবয়সী, একটি প্রৌঢ়বয়স্কা বল্লেও অতুক্তি হয় না। যার বয়স কিছু বেশী, সে এইমাত্র লালসাঙ্গায় এসেছে ; দেখে বোধ হ'লো সে এখনও বাসা নেয় নি ; সর্বশরীর ধূলিধূসরিত, শ্রান্ত ক্লান্ত। এদের বিবাদের কারণ শুনে আমার মনে যুগপৎ লজ্জা ও দুঃখ হ'লো। এরা দুজনেই কেদারনাথ দর্শন ক'রতে গিয়েছিল। বড় ভৈরবীর সঙ্গে একটি সাধুপুরুষ ছিল, কনিষ্ঠা ভৈরবী পূর্বদিন অপরাহ্নে সেই সাধুটিকে ভুলিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে। জ্যেষ্ঠা সন্ন্যাসিনী বহু পরিশ্রমে এখানে এসে তার হারানিধিকে আবিষ্কার ক'রেছে। এ বিবাদের কথাবার্তা সমস্ত হিন্দুস্থানীতে পুষিয়ে ওঠে নি, কাজেই হিন্দুস্থানী ছেড়ে এখন বাঙালায় কথা চ'লেছে, সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেই হাত মুখের অতি কুৎসিত ভঙ্গী ক'রচে। আমি আর সেখানে লজ্জায় দাঁড়াত পাল্লুম না। যে সকল দর্শক সেখানে উপস্থিত ছিল, তারা বাঙালা জানে না, কাজেই তারা পরম তৃপ্ত মনে এই বীরত্ব গাঁথা শুনে যাচ্ছিল। আমি সেখান হ'তে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে এলুম। কথায় কথায় অচ্যুত ভায়া এই কলঙ্ককাহিনী শুনতে পেলেন ; আমাকে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন "তারা সত্যিসত্যিই বাঙালী নাকি? এতক্ষণ বল নি!" —এই বলে তিনি তাঁর সুবৃহৎ পার্বত্য-যষ্টি নিয়ে ভৈরবীদ্বয়ের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় চটি ত্যাগ ক'ল্লেন। আমি ও স্বামীজি মিলে কি তাঁকে ঠাণ্ডা করতে পারি? শেষে অনেক নীতিকথা ব্যয় করে তাঁকে ফিরাই। ভৈরবীদ্বয় আপাততঃ রক্ষা পেলে, কিন্তু ভায়া তর্জন ক'রতে ক'রতে ব'ল্লেন যে একবার তাদের সঙ্গে দেখা হ'লে এক লাঠির বাড়িতে তাদের ভণ্ডামী ভেঙে দেবেন।

নারায়ণে যাবার সময়ে লালসাঙ্গায় এক বিনামাচোর সাধুর কীর্তিকাহিনী ব'লেছিলুম, এখন ফিরবার সময়ে দুটি বাঙালী ভৈরবী পাশবদশা দেখা গেল। স্বামীজির ইচ্ছা ছিল

www.pathagar.com

যে, আজকার দিনটা লালসাঙ্গায় থাকা যাক, বৈদান্তিক ভায়ারও তাতে বড় একটা আপত্তি ছিল না ; কিন্তু না-হক ব'সে থাকা আমার ভাল লাগলো না ; কাজেই আমরা সেই অপরাহ্ণেই বেরিয়ে প'ড়লুম। শীঘ্র শীঘ্র নন্দপ্রয়াগে আসবার আমার আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল ; আমাদের সঙ্গে একজন অজ্ঞাতকুলশীল বালক সন্ন্যাসী জুটেছিল, তার শরীরের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। আজ অনেক কষ্টে তাকে লালসাঙ্গা অবধি নিয়ে এসেছি। আজ রাতটা যদি এখানে বাস করি, তা হ'লে এমনটি হওয়াও অসম্ভব নয় যে, সে একেবারে অবসন্ন হ'য়ে প'ড়বে ; তার শরীর এমন ভেঙে প'ড়বে যে, আর তার চলবার শক্তি থাকবে না। যদিও লালসাঙ্গাতেও চিকিৎসালয় আছে, কিন্তু যাকে আজ কয়দিন থেকে সঙ্গে ক'রে ফিরচি, তাকে এই অপরিচিত স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয়ে ফেলে যাব, এ কথাটা যেন মনে কেমন ঠেকতে লাগলো। তাকে হয় ত দুদিন পরে ডাক্তারখানা থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে। অথবা সাধারণতঃ দাতব্য চিকিৎসালয়ের রোগীদের প্রতি যে প্রকার যত্ন লওয়া হয়, তাতে এই দুর্বল রুগ্ন অসহায় বালকটি দু'দিন আগেই জীবনলীলা শেষ ক'রে ব'সবে। কোন রকমে তাকে নন্দপ্রয়াগে নিয়ে যেতে পারলে আমার আর সে ভয় থাকবে না। যখন নারায়ণ দর্শনে যাই, সেই সময়ে নন্দপ্রয়াগের দাতব্য-চিকিৎসালয়ের ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় হ'য়েছিল ; তাঁকে একজন দয়ালু ভাল লোক ব'লে আমার বেশ বিশ্বাস হ'য়েছিল। এই রোগীটিকে তাঁর হাতে দিয়ে যেতে পারলে তার যে অযত্ন হবে না এবং সেই ডাক্তারের যতটুকু বিদ্যা তাতে যদি বালকের রোগমুক্তির সম্ভাবনা থাকে তা হ'লে চাই কি, সে আবার সুস্থ হ'য়ে নিজ গন্তব্য স্থানেও চ'লে যেতে পারবে। এই জন্যই সেই অপরাহ্ণে তাড়াতাড়ি নন্দপ্রয়াগে আসবার জন্য বেরিয়ে পড়া গিয়েছিল।

প্রাতে ছয় মাইল রাস্তা হেঁটে বালকটি কাতর হ'য়েছিল ; এবেলা আমাদের বাহির হবার আয়োজন দেখে সে যে অতি অনিচ্ছায় তার ঝুলিটি কাঁধে ফেলে বাহির হ'লো, তা' তার আকার-প্রকারেই বেশ বুঝতে পারা গিয়েছিল। কিন্তু কি করা যায়! তার মঙ্গলের জন্যই তাকে আজ এই অপরাহ্ণে আবার ছয় মাইল পথ যেতে হ'লো। অপরাহ্ণ ব'লে আজ আর আমরা কেহই একাকী চল্লুম না ; আমরা চারজন মানুষ একসঙ্গে চলতে লাগলুম। বালকটিকে ধীরে ধীরে চলবার জন্য স্বামীজি তার সঙ্গে নানাপ্রকার গল্প জুড়ে দিলেন। সে এমনই ধীর অথবা তার স্বাভাবিকতা গোপন করবার তার এতটাই দরকার যে, সে 'হুঁ' 'না' এই প্রকার দুই একটি কথা ভিন্ন বেশী বাক্যব্যয় মোটেই ক'রলে না। তার এই প্রকার সঙ্কোচের ভাব দেখে সে যে নিশ্চয়ই বাঙালী এ বিশ্বাস আমার ক্রমেই দৃঢ় হ'চ্ছিল। সে যদি বালক না হ'তো তা হ'লে তার পরিচয়ের জন্য এত আগ্রহ হ'তো না ; কারণ বাঙালীই হ'ক আর হিন্দুস্থানীই হ'ক সন্ন্যাসীদলের মধ্যে এ প্রকার লোকের সংখ্যা খুব বেশী, যাদের পূর্বজীবন না জানাই ভাল। আইনের হাত থেকে পালিয়ে জটাধারী হ'য়ে ভস্ম মেখে কত জন তাদের দুর্বহ জীবন যাপন করে, তার ঠিকানা কি? কি কষ্টেরই জীবন তাদের। হৃদয়ের মধ্যে সন্ন্যাসের বোঝা প্রকৃত সন্ন্যাসী অপেক্ষা তাদেরই বেশী ক'রে বইতে হ'চ্ছে ; তাদের ভান বেশী, কারণ তাদের আত্মগোপন বেশী দরকার। বালকটি অবশ্যই এমন কোন অপরাধ করে নি, বা তার পক্ষে এমন কোন কাজ করা সম্ভবপর নয়, যার জন্যে সে এই নবীন বয়সে সব ছেড়ে বনে বনে নিতান্ত অসহায়

www.pathagar.com

অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। পারিবারিক কোন প্রকার অশান্তি, বা মনের কষ্টেই সে ঘর ছেড়ে ফকির হ'য়েছে ; নতুবা ছেলেমানুষ ইংরেজী Entrance অবধি পড়েছে, বয়সও অল্প এবং জাতিতে সম্ভবতঃ বাঙালী, সে যে ধর্মের জন্যে সব ছেড়েছে, এ কথা এই কলিযুগের শেষভাগে পুনরায় প্রহ্লাদের ন্যায় ভক্তের আগমন সম্বন্ধে বিশ্বাসবান ব্যক্তি ব্যতীত আর কেউ সহজে মোটেই বিশ্বাস ক'রতে চাইবে না।

রাস্তায় এমন কোন ঘটনা উপস্থিত হয়নি, যার কথা বলা যেতে পারে, তবে রাস্তার বর্ণনা একটা দেওয়া অনায়াসেই যেতে পারে ; কিন্তু তার ভিতরে ত আর নূতন কথা কিছু নাই ; সেই চড়াই আর উৎরাই, সেই বন আর নির্ঝর ; সেই হিমালয়, সেই পাখীর কলতান, আর সেই জনশূন্য পথে আমাদের মধুর গমন। রাস্তার ধারে তেমনি অতুল শোভা বিকাশ ক'রে ফুল ফুটে র'য়েছে, অলকানন্দা তেমনি কুলকুলস্বরে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে ; বনের মধ্যে পাখীসকল তেমনি গান ক'রছে। এসব দেখতে আমরা একেবারে অভ্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছি।

লালসাঙ্গা থেকে নন্দপ্রয়াগ ছয় মাইল। আমাদের নন্দপ্রয়াগে পৌঁছিতে রাত হ'য়ে গেল ; তাতে আমাদের বিশেষ কোন অসুবিধার ভয় ছিল না। এখন প্রত্যাবর্তনের পথ ; কোথায় কি আছে সব আমরা জানি ; যেখানে গিয়ে সুবিধামত থাকতে পারা যায়, তারও বন্দোবস্ত আমরা পূর্ব হ'তেই ক'রতে পারি। নন্দপ্রয়াগে উপস্থিত হ'য়ে আমাদের সেই পূর্ববাসেই অবস্থিতি হ'লো। রাত্রিকালে আর বালকটিকে দাতব্য-চিকিৎসালয়ে নিয়ে যাওয়া হ'লো না। যতক্ষণ তাকে আমাদের কাছে রাখতে পারি, সেই ভাল। আমাদের পৌঁছান সংবাদ পেয়েই থানার দারোগা মহাশয় আমাদের সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন। নারায়ণে যাবার সময়ে এখানেই পুলিসের ইনস্পেক্টর বাবুর সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছিল, সেই সূত্রে নন্দপ্রয়াগ থানার দারোগা বাবুও আমাকে একটা বড় লোক ঠাউরে রেখেছিলেন। রাস্তায় কোনপ্রকার অসুবিধা হ'য়েছে কিনা, পুলিসের কর্মচারী কোন যাত্রীর উপর কোন প্রকার অত্যাচার ক'রেছে কিনা, ইনসেপক্টর সাহেবকে আমি কোন পত্র লিখেছি কিনা, এই সব কথা তিনি একটি একটি ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রতে লাগলেন। তাঁর কথাগুলির জবাব দিয়ে আমি সঙ্গী বালকের কথা পাড়লুম ; তাকে যে দাতব্য চিকিৎসালয়ে রেখে যাব সে কথা জানিয়ে দিলুম, এবং তাঁদের ভরসায় যে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বালকটিকে ফেলে যাচ্ছি, সে কথা ব'লতেও ত্রুটি করা গেল না। দারোগা সাহেব প্রাণপণে এ কাজ ক'রবেন ব'লে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'লেন। একে সে রোগী, তার তত্ত্বাবধান করা ত কর্তব্যকর্ম ; তারপর আমি যখন এত ক'রে অনুরোধ কচ্ছি এবং ছেলেটির সম্পূর্ণ ভার তাঁর উপরে দিয়ে নিশ্চিন্ত হচ্ছি, তখন তিনি যে প্রকারে হউক, তাকে আরাম ক'রে দেবেন ; সেই রাত্রেই বালকটিকে চিকিৎসালয়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত, কিন্তু রাত্রিটা আমরা একসঙ্গে বাস ক'রবো এই অভিপ্রায় প্রকাশ করায় অতি 'সবেরে' এসে একত্রে ডাক্তারখানায় যাওয়া যাবে, এই বন্দোবস্ত স্থির ক'রে 'বন্দেগি' জানিয়ে নন্দপ্রয়াগের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা মহাশয় প্রস্থান ক'রলেন। তিনি চ'লে গেলেন বটে, কিন্তু তাঁর অনুচরগণ সে রাত্রি আমাদের ছেড়ে সহজে যায় নি। আমার কথা ত ব'লেই রেখেছি, কোন রকমে একবার কম্বলখানি গায়ে জড়িয়ে প'ড়তে পেলেই হয়, তা হ'লে স্বয়ং কুম্ভকর্ণও পেরে উঠেন কিনা সন্দেহ। পরদিন ভোরে উঠে শুনলুম সমস্ত রাত্রিই কনেষ্টবলগণ বাজারে পাহারা দিয়েছে এবং তাদের চীৎকারে

www.pathagar.com

মরা মানুষেরও নিদ্রাভঙ্গ হয় ; বৈদান্তিক ভায়া নাকি অনেক রাত্রে দুই-তিনবার তাদের উপর চটে উঠেছিলেন, কিন্তু আজ তারা মনিবের হুকুম পেয়েছে, আজ বেশ ভাল ক'রে পাহারা দিতে হবে। কেউ যেন মনে না করেন, আমাদের মত অজ্ঞাতকুলশীল মুসাফির লোক আজ বাজারে বাসা নিয়েছে, রাত্রে হয় ত কিছু চুরি ক'রে নিয়ে আমরা পালিয়ে যেতে পারি, সেই জন্যই এত কড়াকড়ি পাহারা। ব্যাপার এই, নীচে নেমে যাচ্ছি, খুব সম্ভবতঃ নীচে কোন জায়গায় ইনস্পেক্টর বাবুর সঙ্গে দেখা হ'লে নন্দপ্রয়াগের পুলিস বন্দোবস্ত সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'রলে আমি খারাপ কিছু ব'লতে পারি ; যাতে তা না বলে, তারি জন্যে আজ এ প্রকার পাহারা! নতুবা দোকানদারদের কাছে শুনলুম অন্য কোন রাত্রে পাহারাওয়ালাদের সাড়াশব্দও পাওয়া যায় না।

পরদিন প্রাতঃকালে (৫ই জুন শুক্রবার) আমরা প্রস্তুত হবার পূর্বেই দারোগা সাহেব ও দুইজন বরকন্দাজ ধড়াচূড়া প'রে এসে হাজির। স্বামীজি, বৈদান্তিক ও আমি তিনজনেই বালকটির সঙ্গে সঙ্গে দাতব্য চিকিৎসালয়ে গেলুম। ডাক্তারবাবু খুব খাতিরযত্ন ক'রলেন। পথে কোনপ্রকার অসুখ হয়েছিল কিনা তার তত্ত্ব নিলেন ; স্বামীজির সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিলুম। ডাক্তার অতি ভক্তিভরে তাঁর চরণ-বন্দনা ক'ল্লেন। শেষে বালকটির কথা বলায় অতি আগ্রহে তাকে হাসপাতালে একটি ছোট ঘরে একাকী থাকবার বন্দোবস্ত করবার আদেশ দিলেন। বালকটিকে বিশেষ রকমে তত্ত্ব লওয়ার জন্যে এবং তাকে ভাল ক'রে শুশ্রূষা ক'রতে যদি কিছু ব্যয় হয়, আমি তা দিয়ে যেতে প্রস্তুত হওয়ায় ডাক্তারবাবু বড়ই দুঃখিত হলেন। চিকিৎসালয়ের নিয়মানুসারে সরকার থেকেই সব দেওয়া হয়ে থাকে ; তা ছাড়াও যদি বিশেষ কিছু দরকার হয়, তা হলে সে দেওয়ার ক্ষমতা ভগবান তাঁহাকে দিয়েছেন, এ কথা তিনি অতি বিনীতভাবে বললেন।—আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলুম।

বালকটির জন্যে বিছানা প্রস্তুত হলে তাকে সেই ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে গেলুম। এখন বিদায় গ্রহণের সময় উপস্থিত হ'ল। আজ তিনদিন যদিও বালকটিকে পেয়েছি, তবুও তাকে আমাদের একজন নিতান্ত আপনার জন বলে মনে হ'তে লাগলো। এই অসহায় রুগ্ন অবস্থায় তাকে এই পর্বতের মধ্যে ফেলে যাচ্ছি ; এ জীবনে হয় ত আর তার সঙ্গে দেখা হবে না। এই দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে সে যে আর বাহির হ'তে পারবে, তারই বা নিশ্চয়তা কি, এই সব কথা ভেবে প্রাণের মধ্যে কেমন করতে লাগলো। তারপর যখনই তার সেই রোগক্লিষ্ট মলিন মুখের দিকে দৃষ্টি পড়তে লাগলো, তখনই একটা অব্যক্ত শোকের ছায়া এসে আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন করতে লাগলো। তবুও আমি ধীর নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইলুম ; বৈদান্তিক ভায়ার দুইটি চক্ষু বিস্ফারিত দেখে বেশ বুঝতে পারলেম, মায়াবাদী অনেক কষ্টে মনের কোমল ভাব গোপন করছেন। স্বামীজি কিন্তু কেঁদে ফেললেন। তিনি আর আত্মসংবরণ করতে পারলেন না ; বালকটির হাত ধরে তিনি কান্না জুড়ে দিলেন। হায় সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী তুমিই ধন্য। নিজের সব ত্যাগ করে এসে এখন পথেঘাটে যাকে কাতর দেখ, যাকে দুঃখী দেখ, তারই জন্যে কেঁদে আকুল। আমরা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর এই অশ্রুত্যাগ দেখতে লাগলুম। পরের জন্যে যে এমন ক'রে চোখের জল ফেলতে পারে, সে দেবতা নয় ত কি!

বেলা হয়ে যায় দেখে, আমরা অতিকষ্টে বালকের নিকট হ'তে বিদায় গ্রহণ করলুম।

www.pathagar.com

ডাক্তারবাবু ও দারোগা মহাশয়কে বিশেষ ক'রে অনুরোধ করা গেল। শেষে তাঁদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আমরা নন্দপ্রয়াগ ত্যাগ ক'রে চলে এলুম। আর হয় ত জীবনে নন্দপ্রয়াগ দেখা হবে না। যে সব স্থান ছেড়ে যাচ্ছি, কতদিনের সাধনবলে তবে এমন সব পবিত্র স্থান দেখা হ'য়েছিল ; আবার কি এ পুণ্যভূমিতে আসা হবে? কে জানে ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে? কে জানে অদৃষ্টদেবী অন্তরাল থেকে আমাদিগকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন। রাস্তায় যেতে যেতে শুধু বালকটির কথাই মনে হতে লাগলো। সে যদি আপনার পরিচয় দিত, তা হ'লে তার জন্যে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারতুম। সে ত নিজের পরিচয় দিলে না। কি এক মনের আবেগে, কি এক হৃদয়ভেদী কষ্টে, যন্ত্রণায় সে লোকালয় ছেড়ে এই ভয়ানক পর্বতপ্রদেশে মাথা দিয়েছে, তা না জানতে পেরে তার উপরে আমাদের স্নেহ আরও বৃদ্ধি হ'য়েছিল। এমনি ক'রে কত পথিকের সঙ্গে কত দিন কত পথে দেখা হ'য়েছিল। আজ হয়ত তাদের চেহারা পর্যন্তও মনে নাই।

অদ্য ৫ই জুন, শুক্রবার—নন্দপ্রয়াগ ত্যাগ ক'রে আমরা তিনটি মানুষ ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে লাগলুম ; কারও মনে প্রসন্নতা নেই। কেমন একটা গভীর বিষাদ বুকে ক'রে আমরা নিঃশব্দে পথ বেয়ে চল্লুম, পা দু'খানি যেন কলে চলছে। মুখে কথা নেই। এমন অবসাদ নিয়ে কি বেশী পথ চলা যায় ; কাজেই বেলা যখন দশটা, তখন আমরা সবে চার মাইল রাস্তা এসে কালকা চটিতে বাসা নিলুম। এখন পথ-ঘাট সব চেনা ; যে চটিতে যাবার সময় বাস ক'রে গিয়েছি, সে চটিওয়ালাকে পর্যন্ত বেশ ভাল ক'রে মনে ক'রে রেখেছি। বিদ্যাবুদ্ধি মোটেই নেই, টাকা-কড়ি দিয়ে যে লোককে বশ করবো তা তেমন ছিল না ; তবে একটি জিনিস সম্বল করে এ পথে বেরিয়েছিলুম, সেটি শীতল বুলি। একটা দোঁহা আমি সর্বদাই আবৃত্তি করতুম এবং জীবনে সেটিকে কার্যে পরিণত করবার জন্য অনেক চেষ্টাও করেছি ; সে চেষ্টা যে নিতান্তই বৃথা করি নি, তার প্রমাণ এই নারায়ণের পথে পেয়েছি। দোঁহাটি ঠিক হবে কিনা বলতে পারি না, তবে আমি তাকে এই আকারেই পেয়েছি :—

"ইয়ে রসনা বশ কর, ধর গরিবি বেশ,
শীতল বুলি লেকে চলো, সবহি তুমহারা দেশ।"

এই 'শীতল বুলি'—এই মিষ্ট কথাতেই সকলের সঙ্গে মিলে মিশে চলে এসেছি। আমার ত এই অভিজ্ঞতা জন্মেছে যে পথেঘাটে চলতে হলে টাকায় কুলোয় না, মান মর্যাদা, গর্ব অহঙ্কার পদে পদে বিড়ম্বিত হয় ; তারা কোন দিনই পথের সঙ্গী নয়, তা এই পাহাড়ের মধ্যেই হউক, আর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রেলের গাড়ীর মধ্যেই হউক। নিজের ধন, মান, মর্যাদা, বংশগৌরব নিজের গ্রামে বা আশ্রিতমণ্ডলীকে বেশ গুছিয়ে আপন আধিপত্য বিস্তার করতে পারে, পথেঘাটে তা বিশেষ অসুবিধাই ঘটিয়ে দেয়। এই মিষ্ট বাক্যে সকল চটিওয়ালাকেই বাধ্য করে আমরা পথ চলেছি।

কালকাচটিতে আমরা পৌঁছিলে চটিওয়ালা আমাদের দেখে বড়ই আনন্দিত হ'ল। কতদিন সে কতজনের কাছে আমাদের কথা বলেছে ; প্রতিদিনই আমাদের প্রত্যাগমনের পথের দিকে চেয়ে থাকত। তার কথাগুলি শুনে আমাদের মনে বড়ই আনন্দ হলো। আমরা কোথাকার কে, কবে এক রাত্রির জন্যে তার দোকানে আশ্রয় নিয়েছিলুম, আর সে আমাদের কথা মনে রেখেছে, এ কথা শুনে বড়ই আনন্দ হ'ল।

www.pathagar.com

আমরা চটিতে বিশ্রাম ক'চ্ছি ; দোকানদার আমাদের আহারাদির আয়োজন করছে। সে দিন আমরা ব্যতীত সে চটিতে আর কোন যাত্রী বাসা নেয়নি ; তাই দোকানদার তার যা কিছু সম্বল সমস্তই আমাদের সেবায় নিযুক্ত করেছে। বেলা যখন প্রায় ১১টা সেই সময় নীচের দিক থেকে একজন বৈষ্ণব সাধু এসে ঐ চটিতে উপস্থিত হলেন। তাঁর ভাব দেখে বোধ হলো, তিনি আজ অনেক পথ হেঁটেছেন। তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয় লোকটি নেই। আমাদের দেশের বৈষ্ণবের মত বেশ ; স্কন্ধে একটি ছোট রকমের ঝুলি আছে। তিনি দোকানে প্রবেশ করেই নিজের ঝুলিটা নামিয়ে রেখে একেবারে মাটির উপর শুয়ে পড়লেন, এবং কতকক্ষণ চোখ বুজে রইলেন। তাঁর ভাব দেখে বোধ হ'লো, এমনি ক'রে শুয়ে তিনি বেশ আরাম বোধ কচ্ছেন। তাঁর সে আরামে বাধা দিয়ে কথাবার্ত্তা বলা সঙ্গত নয় মনে ক'রে আমরাও চুপ ক'রে বসে রইলুম। একটু পরেই তিনি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলেন এবং স্বামীজির দিকে চেয়ে বল্লেন, "পথশ্রমে বড়ই কাতর হয়ে পড়েছিলুম, তাই আপনার সঙ্গে কথা কইতে পারি নি, কিছু মনে করবেন না।" স্বামীজি অবাক হয়ে গেলেন ; তাঁর সেই আজানুলম্বিত দাড়ি এবং গৈরিক বস্ত্রের প্রকাণ্ড উষ্ণীষ সত্ত্বেও কি ক'রে বৈষ্ণব তাঁকে বাঙালী ঠাউরে নিয়ে বেশ দিব্বি বাঙালায় কথা বল্লেন, এই স্বামীজির বিস্ময়ের কারণ। কিন্তু বৈষ্ণব মহাশয় তা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন ; কারণ পরক্ষণেই তিনি বল্লেন, "আপনি সন্ন্যাসীর বেশেই থাকুন, আর যাই করুন, আপনার দাড়ি আমরা কোন দিন ভুলব না। আপনার হয় ত মনে নাই ; কিন্তু আপনারা যখন মুঙ্গেরে ছিলেন, আমি তখন জামালপুরে থাকতুম।" স্বামীজি তাঁকে চিনতে পারলেন না। বৈষ্ণব শেষে আত্মপরিচয় দিলেন। তিনি জামালপুরে কোন্ আফিসে চাকরি করতেন। যখন মুঙ্গেরে কেশববাবু সদলবলে অবস্থান করছিলেন, সে সময়ে ঐ অঞ্চলে খুব একটা ধর্মান্দোলন উপস্থিত হয়েছিল। অনেক শিক্ষিত যুবক ব্রাহ্মসভা, সংশোধনী-সভা প্রভৃতি স্থাপন করে খুব একটা সোরগোল উপস্থিত করেছিলেন, তার পর কেশববাবুরা চলে এলেন ; কিন্তু ধর্মের আন্দোলন সহজে মুঙ্গের জামালপুর ত্যাগ ক'রল না ; কতকগুলি যুবক যথারীতি ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করলেন ; কেউ শৈব হলেন, কেউ বৈষ্ণব হলেন ; পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, যিনি পরে কৃষ্ণানন্দ স্বামী নাম ধারণ করেছিলেন, তিনি সেই মুঙ্গেরের যুবকদলের একজন উৎসাহী নেতা ছিলেন। কতকগুলি যুবক ধর্মের জন্য চাকুরি আদি ত্যাগ করলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন হিন্দুধর্মের প্রচারক হয়ে দেশে দেশে ফিরতে লাগলেন, তাঁর বক্তৃতা শুনে চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল! আমাদের সঙ্গে যে বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ হ'ল, তিনি কিছুদিন সেই দলেই ছিলেন, কিন্তু শেষে নিজের রুচি অনুসারে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ ক'রে যথারীতি ভেক নিয়ে এখন বৃন্দাবনে বাস করছেন। নারায়ণ দর্শন উদ্দেশ্যে তিনি এদিকে আসেন নাই। তাঁর একজন বাঙালী বন্ধু কানপুরে থাকেন ; সেই বন্ধুটির একমাত্র পুত্র কোথায় চলে গিয়েছে। তাঁরা কেমন ক'রে সন্ধান পেয়েছেন যে, সে ছেলেটি বদরিকাশ্রমের দিকে এসেছে ; তাই এই বৈষ্ণব সেই ছেলের অনুসন্ধানে এসেছেন। বৃন্দাবনে বসেও প্রভুর নাম করছিলেন, পথেও তাঁরই নাম করবেন ; বন্ধুর ছেলেটি যদি পাওয়া যায়, তা হলে বন্ধুর যথেষ্ট উপকার করা হবে বন্ধুপত্নীও প্রাণ পাবেন। পরের উপকারের জন্যই সাধু বৈষ্ণব এই ভয়ানক পথে এসেছেন।

আমরা ত তাঁকে একেবারে নিরাশ ক'রে দিলুম। তিনি যে লোকের উদ্দেশে যাচ্ছেন

www.pathagar.com

তার চেহারা যে ভাবে বললেন, তাতে তেমন চেহারার লোক ত আমাদের নজরে পড়ে নাই। একটি ছেলেকে আমরা সেদিন ডাক্তারখানায় রেখে এসেছি, তাকে দেখে আমাদের বাঙালী বলে বিশ্বাস হয়েছে ; সে কথা তাঁকে জানিয়ে দিলুম। তিনিও সেই দিনই যে করে হোক, সেই ডাক্তারখানা অবধি যাবেন। যখন এতদূর এসেছেন, তখন আর নারায়ণ দর্শন ক'রে শ্রীধামে ফিরবেন না। লোকটি বড়ই সুন্দর প্রকৃতির। চৈতন্যদেব উপদেশ দিয়ে ছিলেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা,
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি।

সে উপদেশ আধুনিক বৈষ্ণব মহাশয়েরা কতদূর পালন ক'রে থাকেন সে বিষয়ে সন্দেহ আছে ; আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা তাতে ত ব'লতে পারি বৈষ্ণব মহাশয়েরা উপদেশের শেষাংশ পালন ক'রে থাকেন, সর্বদা হরিনাম কীর্তন তাঁরা ক'রে থাকেন ; তবে তার কতখানি হরির জন্য, আর কতখানি ভিক্ষার জন্য, পদ-প্রসারের জন্য, তা তাঁরা এবং তাঁদের হরিই ব'লতে পারেন। বৈষ্ণব নাম শুনলেই তার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি কথা, অনেকগুলি ভাব আমাদের মনে এসে পড়ে ; সেগুলি নামের সঙ্গে এমন দৃঢ়রূপে জড়িয়েছে যে তাদের স্থানচ্যুত করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার হ'য়ে পড়েছে। ভাল বৈষ্ণব বড় একটা নজরে পড়ে না। প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে যে বৈষ্ণব দেখতে পাই, তারা শুধু ভিক্ষা পাবার জন্যই তিলক-মালা ধারণ ক'রছে ব'লে মনে হয়। বৈষ্ণবদের কথা ব'লতে ব'লতে একটা অনেক দিনের কথা আমার মনে প'ড়ে গেল। যিনি সে কথাটি ব'লেছিলেন, তিনি আজ স্বর্গে ; এখন তাঁর কথা আর প্রতিদিন মনে হয় না। তিনি আমার স্বর্গীয়া মাতৃদেবী। তিনি যদিও হিন্দু পরিবারের মধ্যে বর্ধিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ধর্মভাব সার্বভৌমিক ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত ছিল। তিনি কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের গোঁড়ামী দেখতে পারতেন না। তিনি একদিন এই বৈষ্ণবদের সমালোচনা ক'রতে গিয়ে ব'লেছিলেন যে, আমরা সংসারের মধ্যে থেকে হরিনাম অনেক সময়ে ভুলে যাই, সুতরাং আমরা পাপী তার আর সন্দেহ নেই ; কিন্তু এই বৈষ্ণবগুলো সংসারটাকে এতই ভালবাসে যে, তাকে একদণ্ড কাছছাড়া ক'রতে পারে না ; তাই তারা তাদের সংসারের ঊনকুটি চৌষট্টি ঝুলির ভিতর পুরে দিনরাত কাঁধে করে, পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এরা এই ঝোলাই বইবে, না হরিনাম ক'রবে! কথা কয়টি বড় ঠিক। বৈষ্ণব সাধু-সন্ন্যাসী আমি জীবনে অনেক দেখেছি, কিন্তু তাদের অধিকাংশই প্রাণের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা সংসার। তারা যে কেমন ক'রে, সংসার-বাসনা ঝুলিতে বোঝাই ক'রে নিয়ে বেড়ায়, তাই ভেবে উঠা যায় না।

সে কথা যাক। আজ এই চটিতে যে বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখা হ'লো, তাঁর উপরে এত কথা খাটে না। তাঁকে দেখে সেই অল্প সময়ের মধ্যে যতটুকু আমি বুঝতে পেরেছিলুম, তাতে ব'লতে পারি লোকটি বেশ ধার্মিক ; আর তিনি সত্যসত্যই ধর্মের জন্যই এই আশ্রমে প্রবেশ ক'রেছেন। তিনি এত বেলায় রান্না ক'রতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আমরা আর তাঁকে সে কষ্ট পেতে দিলুম না ; আমাদের জন্য যে খাবার তৈয়েরি হ'য়েছিল, তাই তাঁর সঙ্গে ভাগ ক'রে গ্রহণ করা গেল।

আহারান্তে তিনি আর একদণ্ড বিশ্রাম ক'রলেন না ; আমরা যে দেশ ছেড়ে এসেছি, তিনি সেই দেশের দিকে চ'লে গেলেন। আমার প্রাণের মধ্যে আবার বাসনা জেগে উঠল।

www.pathagar.com

মনে হ'তে লাগলো, নেমে কোথায় যাব? আমার আবার প্রত্যাবর্তন কেন? বেশ ত গিয়েছিলুম। নেমে আসবার কি এমন একটা দরকার হয়েছিল, তা ত আজ বুঝতে পাচ্ছি না। কি মনে ক'রে যে এতটা রাস্তা এসেছি, তা আজ মোটেই মনে আনতে পাল্লুম না। বড়ই ইচ্ছা হ'লো বৈষ্ণবের সঙ্গে আবার নারায়ণের পথে চ'লে যাই ; সেখানে গিয়ে শেষে যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে। যে কথা সেই কাজ ; আমি তখনই কম্বল কাঁধে ক'রে বের হবার উদ্যোগ ক'চ্ছি দেখে স্বামীজি নিষেধ ক'ল্লেন, এত রৌদ্রে বাহির হ'য়ে কাজ নেই। আমি তাঁকে জানিয়ে দিলুম যে আমি আবার নারায়ণের পথে যাচ্ছি ; নীচে ফিরে যাওয়ার মত পরিবর্তন হ'য়েছে। স্বামীজি শুনে একেবারে অবাক ; সত্যসত্যই তিনি হাঁ ক'রে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন ; দেখে যেন বোধ হ'ল, হয় তিনি আমার কথা মোটেই বুঝতে পারেন নি, আর না হয় তিনি আমার মস্তিষ্ক-বিকৃতির কথা ভাবছেন। আমি তাঁকে এই অবস্থায় দেখে নিজেই নীরবতা ভঙ্গ ক'রে দিলুম 'তা হলে আসি', এই ব'লে আমি যখন পা বাড়িয়েছি, তখন সেই সন্ন্যাসী, সেই সংসারত্যাগী সর্বত্যাগী সাধু এসে একেবারে দুই হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধ'রলেন ; সেই শীর্ণ দুর্বল দুইখানি হাতের বাঁধন দিয়ে আমাকে আটকিয়ে রাখবেন ব'লে মনে ক'রলেন। শুধু তাই নয়, নির্বাক সন্ন্যাসী দুই-চারিবিন্দু চোখের জল ফেললেন। হায় কপট সন্ন্যাসী, হায় ভণ্ড সাধু, আজ তুমি বাহুবন্ধনে ও চোখের জলে ধরা প'ড়েছ। তোমার গৈরিকবসন, দণ্ড কমণ্ডলু ও তোমার এই কষ্ট স্বীকার, এত সাধন ভজন মিথ্যা, তুমি ঘোর সংসারী ; তুমি এক সংসার ছেড়ে এসে আর এক সংসারে পড়েছ। তুমি ভগবানের দ্বারে পৌঁছিতে পারছ না। এত যার স্নেহ মমতা, এত যার মানুষের উপর টান, সে ভগবানকে ডাকে কি ক'রে? আমি সন্ন্যাসীর সে বাহুবন্ধনে মহা বিপন্ন হয়ে প'ড়লুম, তাঁর চোখের জল দেখে আমার সব ঘুরে গেল। আমি আর কথাবার্তা না ব'লে সেখানে ব'সে প'ড়লুম। স্বামীজিও আমার কাছে ব'সে সস্নেহে আমার দীর্ঘকেশ, রুক্ষ মস্তকে হাত বুলাতে লাগলেন। আমার আর নারায়ণের পথে যাওয়া হ'ল না ; কিন্তু তখনই সকলে মিলে সে চটি থেকে বেরিয়ে পড়া গেল। সন্ধ্যার সময়ে কর্ণপ্রয়াগে এসে নীরবে নিঃশব্দে একটা দোকানঘরে রাত্রিবাস করা গেল। কর্ণপ্রয়াগে পেড়া কিনতে পাওয়া যায় ; সেই পেড়া খেয়েই সে রাত্রি কাটিয়ে দেওয়া গেল।

৬ই জুন।—প্রাতে উঠে দেখি আকাশ একেবারে মেঘে ছেয়ে ফেলেছে, আর ধীরে ধীরে বেশ বৃষ্টি হ'চ্ছে। পাহাড় অঞ্চলে এ রকম বৃষ্টি দেখলেই বুঝতে হবে যে, সে দিন বৃষ্টি বড় শীঘ্র থামবে না। আমার আর এ বৃষ্টির মধ্যে বার হওয়ার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, আবার বেশ গুছিয়ে কম্বলখানি মুড়ি দিয়ে শয়ন ক'রতে যাচ্ছি, এমন সময়ে বৈদান্তিক ভায়া বাধা দিলেন ; তিনি ব'ল্লেন, "এ রকম বাজারে জায়গায় আর একবেলাও থেকে দরকার নেই, যদি এক আধ বেলা বিশ্রাম করা নিতান্তই দরকার হয় ত পাহাড়ের মধ্যে কোন একটা নির্জন চটিতে দুই এক দিন কাটিয়ে দেওয়া ভাল।" বৈদান্তিক ভায়ার কখন যে কি মত হয়, তা দেবতারাও ঠিক ক'রে ব'লতে পারেন না। যেখানে বেশ জিনিসপত্র পাওয়া যায়, সেখানে থাকতে ইতঃপূর্বে কোন দিনও তাঁর কোন প্রকার আপত্তি হয় নি ; কিন্তু আজ তিনি জঙ্গলের মধ্যে জনহীন পর্বতগহ্বর, কি সামান্য চটিতে বিশ্রাম ভাল ব'লে মত প্রকাশ ক'রলেন। হয় তিনি আমাকে বার হ'তে অনিচ্ছুক দেখেই বার হবার জন্য

www.pathagar.com

প্রস্তুত হ'লেন, না হয় আজ এই বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে প'ড়ে রাস্তায় কিঞ্চিৎ কষ্টভোগ আমাদের অদৃষ্টলিপি ছিল, তাই বৈদান্তিক আজ সকলের আগে কম্বল কাঁধে ক'রে বেরিয়ে প'ড়লেন। আমি বাক্যব্যয় না ক'রে তাঁর অনুবর্তী হলুম।

খানিকটা দূর এগিয়ে এমন ঝড়ে আটকিয়ে যাওয়া গেল যে, আর এক পা অগ্রসর হবার শক্তি রইল না। মড় মড় ক'রে বড় বড় গাছ সব ভেঙ্গে প'ড়তে লাগলো, প্রতি মুহূর্তে বোধ হ'লো যেন এই বারেই হয় আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে, বা উপর থেকে হয় গাছ ভেঙ্গে না হয় পাহাড়ের ধস্ নেমে আমাদের সন্ন্যাসীগিরি জন্মের মত ঘুচিয়ে দেবে। আমরা তখন এক জায়গাতেও নেই যে, একত্র জড়িয়ে প'ড়ে থাকব। কে যে কোথায়, তা আর সে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে দেখতে পাওয়া গেল না। আমি একে নিজের প্রাণ নিয়ে ব্যস্ত তার মধ্যে আবার স্বামীজির কথা মনে হ'তে লাগলো। একটা গাছের শিকড় প্রাণপণে দুই হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে আমি শুয়ে প'ড়েছি। মাথার উপর দিয়ে কত কি ব'য়ে যাচ্ছে, একবার একটা হয় ত প্রচণ্ড ডালই হবে, আমার মাথার কাছ দিয়ে চ'লে গেল। কম্বলখানির দুই তিন জায়গা ছিঁড়ে গেল, গানের বইখানি কিন্তু বুকের মধ্যে আছে। ঝড় আর থামে না, তবু একটু নরম হ'য়ে গেল ; বৃষ্টি খুব কম হ'য়ে গেল। বৃষ্টি কম হওয়াতে কিছু এলো গেল না ; তার চাইতে যদি বাতাসটা কমে গিয়ে বৃষ্টি সমভাবেই থাকতো তাতে আমার কোনই ক্ষতি ছিল না ; কাপড় ও কম্বল যতটা ভিজে গিয়েছিল তার চাইতে বেশী ভিজবার যো ছিল না। এ ভাবে আমাকে অধিকক্ষণ আর থাকতে হয় নি। অচ্যুত বাবাজী আমার সম্মুখে কোথায় ছিলেন : তিনি বিপুল বিক্রমে বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে ক'রতে আমার কাছে এসে উপস্থিত হ'লেন এবং তাঁর সেই বিশাল দেহ দিয়ে আমাকে আবৃত ক'রে বসলেন। আমার মনে পড়ে যখনই ঝড়বৃষ্টি হয়েছে, তখনই বৈদান্তিকের নির্মম কঠোর বক্ষতলে আমি আশ্রয় পেয়েছি। পক্ষিমাতা যেমন নিরাশ্রয় শাবককে বিপদকালে নিজের পাখা দুইখানির নীচে লুকিয়ে রাখে, বৈদান্তিকের সেই বিপুল বক্ষ তেমনি আমাকে অনেক বিপদের সময়ে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা ক'রেছে। আমি বিপন্ন হ'লে কোন দিনই সে মায়াবাদের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে আমাকে উড়িয়ে দিতে পারে নি। এ মানুষটি এতদিন আমাদের সঙ্গে রইল, তবু এর ভাবগতিক আমি ত মোটেই বুঝতে পারলুম না ; তার মতামতের একটা সামঞ্জস্য কখনও দেখা গেল না। কি একটা এলোমেলো হৃদয় নিয়ে সে যে দেশত্যাগ ক'রেছে, তা আর বলতে পারি নে ; সে বোধ হয় এত দিনেও তার প্রাণের বিক্ষিপ্ত জিনিসগুলিকে একত্র সংগ্রহ ক'রে একটা বুদ্ধি স্থির করতে পারেনি।

আর একটু পরেই ঝড় থেমে গেল। স্বামীজি আমাদের পশ্চাতে আছেন, তাঁর উদ্দেশ করা দরকার হ'য়ে প'ড়লো ; কারণ এখনও তাঁর কোন খোঁজ-খবরই নেই। আমরা দুই জনে তাঁর বিলম্ব দেখে বড়ই ব্যস্ত হ'য়ে যে পথে এসেছিলাম সেই পথে ফিরে যেতে লাগলুম। বেশী দূরে যেতে হ'ল না ; একটু পথ যেতে না যেতেই দেখি তিনি ভারি ব্যস্ত হ'য়ে আসছেন। আমাদের দুই জনকে দেখে একেবারে ব'সে প'ড়লেন। তাঁর এই প্রকার হঠাৎ ব'সে পড়া দেখে আমরা বেশ বুঝতে পারলুম, তিনি অনেক দূর থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে আমাদের যে কি দশা হ'লো তাই জানবার জন্য বিশেষ আকুল হয়ে আসছিলেন, সম্মুখে আমাদের দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। আমরা তাঁর কাছে গিয়ে চুপ

www.pathagar.com

ক'রে ব'সে রইলুম। তিনি যখন একটু কথা কইবার মত হ'লেন, তখন আমরা কি ক'রে কোথায় আশ্রয় পেয়েছিলুম, তাই জানবার জন্য উৎসুক হ'লেন এবং আমাদের ভিজে কাপড় ও কম্বল দেখে দুঃখ করতে লাগলেন। তাঁর নিজের শরীরে মোটেই জল লাগে নি ; তিনি ভগবানের কৃপায় একটি প্রশস্ত গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেখানে ঝড়বৃষ্টি মোটেই ঢুকতে পায় নি। আমাদের অবস্থা শুনে তিনি ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানালেন; আজ যে ঝড়জল, তাতে ভগবানের কৃপা না হ'লে আমরা আর বাঁচতুম না। স্বামীজি ভগবদ্‌প্রেমে এতই বিগলিত হয়ে পড়লেন যে সেখান থেকে যে তিনি শীঘ্র গা-ঝাড়া দিয়ে উঠবেন, তেমন রকমটা মোটেই বোধ হ'লো না। প্রথমে তিনি চক্ষু মুদ্রিত ক'রে বসলেন, আমরা দুইটি হতভাগ্য পাষাণহৃদয় জীব হাঁ ক'রে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। একটু পরেই তিনি গান আরম্ভ ক'রে দিলেন।—আমার উপর তাঁর একটা আদেশ ছিল যে যখনই যেখানে তিনি যে অবস্থায় গান ধরবেন, আমাকে তাতে যোগ দিতেই হবে। আমার ভাগ্যক্রমে তিনি কখনও এমন কোন গান করেন নি যা আমি জানিনে ; গাইতে যদিও ভাল জানি না—ভাল কেন, নিজের তৃপ্তি ব্যতীত আমার গান শুনে দ্বিতীয় ব্যক্তির তৃপ্তি জন্মাবার দুরাশা, আমিও কোন দিনও মনে স্থান দিই নি, কিন্তু তা ব'লে আমার গানের তহবিল শূন্য নয়। গাইতে পারি আর না পারি, গান আমার অনেক সংগ্রহ আছে ; আর তা না হলে যদিও কম্বল ও যষ্টি সম্বল ক'রে পথে বেরিয়েছিলুম, কিন্তু আমার পরমারাধ্য কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের গানের বইখানি কোন দিনও ছাড়ি নি, সেখানিকে বৈষ্ণবের জপমালার মত বুকে ক'রে নিয়ে বেড়িয়েছি।

স্বামীজি গান ধরলেন ; তার সবটা মনে নেই। তবে তার মুখখানি মনে আছে, পাঠকগণের মধ্যে যাঁদের জানা আছে তাঁরা সবটা গেয়ে নেবেন, গানটি এই—"হরিসে লাগি রহো রে ভাই।"

এই গানটি মীরাবাইয়ের রচিত। স্বামীজি যখন-তখনই গানটি গাইতেন। তিনি যে ভাবে উল্টে-পাল্টে গানটি গাইতে লাগলেন, তাতে কতক্ষণে যে তিনি গান ছেড়ে দেবেন তা মোটেই বুঝতে পারা গেল না ; এদিকে বেলাও হয়ে উঠতে লাগলো। অগত্যা আমি গান ছেড়ে দিলুম ; তাঁর স্বরও ধীরে ধীরে নামতে লাগলো, শেষে একেবারে বাতাসে মিলিয়ে গেল। কিন্তু তখনও তিনি উঠলেন না। গান শেষ হয়েছে দেখে আমরা দুজনে উঠে এদিক ওদিক করতে লাগলুম। কিছুক্ষণ পরে তিন আপন মনেই চলতে লাগলেন ; আমরা দুইজন ধীরে ধীরে তাঁর পশ্চাতে যেতে লাগলুম।

আজ দুই প্রহরে যে চটিতে আশ্রয় নিয়েছিলুম তার নামটি আমার খাতায় লেখা নেই, সে জায়গাটা ফাঁক রয়েছে ; বোধ হয় সেই দুই প্রহরে কোন নূতন চটিতে ছিলাম, তার নামটি শুনে নিতে মনে ছিল না, বিশেষতঃ এই প্রত্যাবর্তনের সময়ে আমার ডাইরীটা তেমন নিয়মমত লেখাই হ'তো না ; তার কারণ হচ্ছে এই যে, নারায়ণে যাবার সময় যেমন একটা স্ফূর্তি নিয়ে বেরিয়েছিলুম, আসবার সময় তার সম্পূর্ণ অভাব। এখন কলের পুতুলের মত যাচ্ছি। এ কথাটা মনে হ'লে আমার প্রাণের ভিতর কেমন একটা ঘোর অবসাদের ভাব এসে উপস্থিত হ'তো ; আমার উদাস প্রাণকে আরও উদাস ক'রে ফেলতো ; আমি মোটেই মনটাকে স্থির ক'রে নিতে পারতুম না ; কাজেই সে সময়ে কোন কাজই ভাল লাগতো না, আর সেই জন্যই প্রত্যাবর্তনের ডাইরী শুধু যে ভাল

www.pathagar.com

ক'রে রাখা হয় নি তা নয়, অসম্পূর্ণ পড়ে রয়েছে। যতই নীচে নেমেছি ততই জড়তা, বিষাদ, দুঃখ কষ্টের ছবি সব আমার প্রাণের ভিতরে বেশি ক'রে ফুটে উঠেছে, আর ততই আমি অন্যমনস্ক হয়েছি।

সেই অজ্ঞাতনামা চটিতে দুই প্রহরে বিশ্রাম ক'রে অপরাহ্ণে আবার পথে নামলাম। আজ সন্ধ্যার সময় আমরা শিবানন্দী চটিতে এসে রইলুম। এই চটিতে আমাদের একাকী ফেলে অচ্যুত বাবাজী চলে যান। আমরা শিবানন্দীর সেই ঠাকুরবাড়িতে পূর্ব বারের মত বাসা ক'রে রইলাম। রাত্রিটা বেশ কেটে গেল।

৭ই জুন।—শিবানন্দী হতে রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত পথ অতি কদর্য, এমন ভয়ানক রাস্তা যে কিছুতেই পা ঠিক রাখা যায় না। আর এই পথের মধ্যে পাহাড়গুলো আবার এমন নরম যে একটু জল হলেই অনেক ধস্ নামে। গভর্ণমেণ্ট এ রাস্তাটিকে ঠিক রাখতে না পেরে শিবানন্দীর ৪ মাইল উপরে পিপলচটিতে একটা লোহার সেতু নির্মাণ ক'রে রাস্তাটাকে নদীর অপর পার দিয়ে চালিয়েছেন এবং সেই রাস্তা রুদ্রপ্রয়াগে এসে আবার আর একটা লৌহসেতুর সাহায্যে পূর্ব রাস্তায় এসে মিশেছে। আমরা এ সংবাদ জানতুম, কিন্তু আমাদের এও জানা ছিল, এই নূতন রাস্তায় আশ্রয়স্থান নেই। তাই আমরা নারায়ণে যাবার সময়েও সে রাস্তায় যাই নি, এখন ফিরবার সময়েও সে রাস্তায় গেলাম না। পিপল চটিতে অপেক্ষা না ক'রে আমরা একেবারে শিবানন্দীতে এসে উঠেছিলুম। আজ শিবানন্দী হ'তে বাহির হয়ে একটু বোধ হয় মাইল দেড় কি দুই মাইল হবে, অগ্রসর হ'য়েই দেখি রাস্তার চিহ্নমাত্র নেই। গতকল্য যে ঝড় জল হয়েছিল, তাতে রাস্তা একেবারে ধুয়ে নেমে গিয়েছে। এখন কি করা যায়। স্বামীজি বল্লেন, আর কি করা ; ফিরে পিপলচটিতে আজ রাত্রিবাস ক'রে, কাল খুব ভোরে উঠে নদী পার হয়ে নূতন রাস্তা ধরে যেমন ক'রে হ'ক, না খেয়ে সন্ধ্যা নাগাদ কি চার ছয় দণ্ড রাত্রের মধ্যে রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছুতে হবে ; তা ছাড়া আর উপায় নেই। ফিরে যেতেও আমাদের আপত্তি ছিল না। তার পরের দিন অনাহারে সারাদিন চলতেও যে বড় একটা ভারি কষ্ট হবে তাও মনে হয় নি : কিন্তু আজকের সারা দিন রাত্রি পিপলচটিতে বাস করা অপেক্ষা গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া ভাল ; অচ্যুত ভায়ারও সেই মত। যে পিপলচটির লক্ষ লক্ষ মাছির দৌরাত্ম্যের কথা আজও আমার মনে আছে, সেখানে কিছুতেই রাত্রিবাস করা হবে না ; অচ্যুত ভায়া ব'ল্লেন, "আপনারা এইখানে অপেক্ষা করুন, আমি একটু উপরে উঠে গাছ ধরে ধরে এগিয়ে দেখি এই সমুখের পাহাড়ের ও-পাশে রাস্তা আছে কিনা।" যে কথা সেই কাজ ; তিনি তাঁর বেদান্তদর্শনের বোঝা ও কম্বলখানি নামিয়ে রেখে বিপুল বিক্রমে গাছপালা ধরে ধরে উপরে উঠতে লাগলেন ; এবং কখন গাছের পাতা সরিয়ে, কখন শিকড় ধরে বেশ যেতে লাগলেন ; এবং মধ্যে মধ্যে আমাদের দিকে সগর্ব দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই চীৎকার ক'রে ব'ল্লেন, "ভয় নেই এদিকের রাস্তা তেমন ভাঙ্গেনি।" তারপর আবাব যেমন ক'রে গিয়েছিলেন ঠিক তেমনি ক'রে ফিরে এলেন। আমি তাঁর গমনাগমন দেখে বেশ যেতে পারব বলে মনে ভরসা বাঁধলুম, কিন্তু স্বামীজি তেমন সাহস পান নাই। অবশেষে কি করেন, আর ত কোন উপায় নাই ; কাজেই তাঁর দণ্ডকমণ্ডলু অচ্যুত ভায়ার জিম্মা ক'রে দিয়ে তিনিই আগে রওনা হলেন ; বৈদান্তিক তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগলেন ; সে সময়ে বৈদান্তিকের দৃষ্টি এমন সতর্ক যে, তা লিখে বোঝাতে পাচ্ছি না। তিনি শুধু

www.pathagar.com

স্বামীজির গতিবিধির উপর নজর রেখে অগ্রসর হচ্ছেন, আর মধ্যে মধ্যে খবরদারী করছেন। বোধ হয় আমি তাঁর প্রদর্শিত পথে অনায়াসে যেতে পারব ভেবে তিনি আর আমার দিকে লক্ষ্য রাখলেন না, শুধু সাবধান ক'রে দিতে লাগলেন। কখনও গাছের ডাল ধরে, কখনও লাফিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন। শেষে অনেক কষ্টে নিরাপদে একটা রাস্তায় ওঠা গেল। এই আমাদের কষ্টের শেষ নয়। রাস্তায় পাঁচ সাত জায়গায় ভেঙে গিয়েছে ; তবে এই ভাঙনটা যেমন অনেকটা স্থান জুড়ে, অন্যগুলি তেমন নয়। সেগুলি পার হতেও লাফালাফি করতে হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে তেমন বেশী কষ্ট হয় নি। যাই হোক, দুই ঘন্টার পথ পাঁচ ঘন্টায় চলে বেলা প্রায় এগারোটার সময় আমরা রুদ্রপ্রয়াগে এসে উপস্থিত। নারায়ণে যাবার সময়ে আমরা রুদ্রপ্রয়াগের গভর্ণমেন্টের ধর্মশালায় ছিলাম এবং সেখানে পীড়িত হয়ে আমাদের তিন দিন থাকতে হয় ; এবারে সেইজন্য আর ধর্মশালায় গেলাম না ; বাজারে একটা দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল।

আমরা আহারাদি শেষ করে বিশ্রামের আয়োজন কচ্ছি, বেলা তখন দুইটা বেজে গিয়েছে বলে বোধ হ'ল। সে সময়ে দেখি একজন বাঙালী সন্ন্যাসী বাঙলা ভাষায় যাচ্ছেতাই বলে দোকানদারগণকে গালাগাল দিতে দিতে আমাদের সম্মুখ দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমরা যে দোকানখানিতে ছিলুম, সেখানি বাজারের একপ্রান্তে অবস্থিত। লোকটির গৈরিক বসন দেখে তাকে সন্ন্যাসী বলেছি। তারপর গৈরিক রং করা ক্যামবিসের একজোড়া জুতা, পরিধানে গৈরিক বস্ত্র, গায়ে গৈরিক পিরাণ, কাঁধে ১ খানি কম্বল তাকেও রং ক'রে পোষাকের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে, হাতে একটা সেতার ; তারও পরিত্রাণ নাই, তাকেও গৈরিক খোলে মোড়া হ'য়েছে। লোকটাকে বড়ই রাগান্বিত দেখে আমি তাকে ডাকতে লাগলুম, বাঙালা ভাষায় তাকে ডাকছি, তবু সে রাগের ভরে চলে যায় দেখে আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে তার পথ রোধ করে দাঁড়ালুম এবং কেন সে এত চটে গিয়েছে জিজ্ঞাসা করায় সে দোকানদারের পিতৃমাতৃ উচ্চারণ ক'রে গালি দিতে লাগলো এবং রাগে গর গর ক'রে কতকগুলি কথা ব'লে ফেললে ; তার সার এই যে আজ ভোরে রওনা হ'য়ে সাত আট ক্রোশ রাস্তা সে হেঁটে এসেছে, সঙ্গে একটি পয়সা নেই। এখানে এসে যে দোকানে যায় সেই দোকানদারই বিনা পয়সায় তার আহার যোগাতে অসম্মত হয়। বেলা আড়াই প্রহরের সময় বেচারার উপর এ প্রকার অত্যাচার করায় সে কি ক'রে তার মেজাজ ঠিক রাখতে পারে ; আপনারাই তার বিচার করুন। অনেক বুঝিয়ে তাকে এনে আমাদের দোকানে বসালুম এবং দোকানদারের ঘরে জলখাবার যা ছিল তা দিয়ে তার উদরদেবকে শান্ত করা গেল। সে যখন প্রকৃতিস্থ হ'ল তখন তাকে আমি বুঝিয়ে দিলাম যে, সে যে প্রকার চটা মেজাজের লোক তাতে বিনা সম্বলে এ পথে চ'লতে পারবে না ; তার চাইতে তার পক্ষে ফিরে যাওয়া ভাল, এবং সে যদি সম্মত হয়, তা হ'লে তাকে আমরা সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজী আছি। সে তাতে সম্মত হ'ল না ; যে ক'রেই হ'ক সে নারায়ণ দর্শন ক'রতে যাবেই। তার সদুদ্দেশ্যে বাধা দেওয়া অকর্তব্য মনে ক'রে আমি যথাসাধ্য তাকে সাহায্য কর'লুম, শেষে এক সঙ্গেই সকলে বাহির হওয়া গেল। দুর্বাসার ছোট সংস্করণ সাধু নারায়ণের পথে গেলেন, আমরাও শ্রীনগরের দিকে অগ্রসর হ'লুম। এই স্থানে একটি কথা না বলা ভাল হয় না। নারায়ণে যাবার সময়ে এই রুদ্রপ্রয়াগে একজন জুতাওয়ালার পরমাসুন্দরী মেয়েকে দেখেছিলুম ; তার কথা আমার মনেই ছিল,

www.pathagar.com

এবং এখানে এসেই তার দোকানের দিকে গেলুম ; কিন্তু গতকল্য যে ঝড় বৃষ্টি হয়েছিল, তাতে তাদের সে ক্ষুদ্র দোকানঘরখানি নদীতে নেমে গিয়েছে, তারা কোথায় গিয়েছে কে তার উদ্দেশ ব'লে দেবে আর কাকেই বা সে কথা জিজ্ঞাসা ক'রব।

আজ অপরাহ্ণে আমরা ভজনী চটিতে রাত্রিবাস করি। এ চটির কথা আমার খাতায় বেশী কিছুই লেখা নাই।

৮ই জুন—আজ আমরা এই দীর্ঘ প্রবাসের সঙ্গী অচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারীকে হারিয়েছি। তিনি পথে আসতে আসতে কয়েকজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হ'লে তাদের দলে মিশে ফিরে গিয়েছেন। আমি আগে এসেছিলুম, স্বামীজি পরে, সর্বশেষে বৈদান্তিকের আসবার কথা। আমরা দু'জনে এসে একটা চটিতে ব'সে বৈদান্তিকের জন্য অপেক্ষা ক'রছি ; তিনি আর এসে পৌঁছেন না। কতক্ষণ পরে সেই পথে একজন সন্ন্যাসী এলেন ; তিনি এসে আমাদের সংবাদ দিলেন যে, আমাদের সঙ্গী তাঁর মুখে ব'লে পাঠিয়েছেন যে, তিনি একদল সাধুর সঙ্গে মানস সরোবরের দিকে গেলেন ; আমাদের মনে বড়ই কষ্ট হ'ল। লোকটা এতদিন সঙ্গে ছিল ; যাবার সময়ে একটি কথাও ব'লে গেল না, বা বিদায় নিয়ে গেল না। হঠাৎ রাস্তার ভিতর থেকে ফিরে চ'লে গেল। তার কি একবারও মনে হ'ল না যে, আমরা দুইটি মানুষ তার জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকব ; এবং শেষে যখন শুনবো যে সে আমাদের ছেড়ে চ'লে গেছে, তখন আমাদের মনে যে একটা ভয়ানক কষ্ট হবে, সে ভাবনাটাও কি মায়াবাদী বৈদান্তিকের মনে ক্ষণকালের জন্যও ওঠেনি। আর যাকে সে সংবাদ দিতে ব'লেছিল, সে যদি সংবাদ না দিত, তার যদি সে কথাটা মনে না থাকতো, তা হ'লে ত আমরা দুইটি মানুষ সে দিন কেন দুই তিন দিন ধ'রে তাকে সেই বনপ্রদেশের পর্বতগাত্রে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হ'য়ে যেতুম! এ সব কথা তার মনে হ'লে সে অমন ক'রে নিতান্ত অপরিচিতের মত আমাদের পরিত্যাগ ক'রে যেতে পারত না। কে জানে ভগবান তাকে কোথায় নিয়ে গেলেন ; এ জীবনে তার সঙ্গে আর দেখা হবে ব'লে মনে হ'ল না। এতদিন একত্র ছিলাম, পথশ্রমে কাতর হ'লে তার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিয়ে বেশ সময় কাটান গিয়েছিল, বিপদে আপদে সে তার বিশাল বক্ষঃস্থল পেতে দিয়ে কতদিন আমাকে রক্ষা ক'রেছে ; —গতকালই আমার প্রতি স্নেহপ্রকাশ ক'রেছে, আজ কিনা সে অনায়াসে চ'লে গেল। পথে ছেড়ে যেতে কি তার প্রাণে একটি কথাও উঠেনি ; দুইজন স্বদেশবাসী সঙ্গীকে সে অনায়াসে ফেলে চ'লে গেল। স্বামীজি বড়ই দুঃখ ক'রতে লাগলেন এবং ব'ললেন যে, তার অদৃষ্টে অনেক কষ্ট আছে। তাঁর সে কথা সত্যসত্যই ফলে গিয়েছিল। অনেকদিন পরে, বোধহয় চার পাঁচ মাস হবে, একদিন রুগ্ন জীর্ণশীর্ণ দেহে অচ্যুতানন্দ স্বামী আমার দেরাদুনের বাসায় এসে পৌঁছেছিলেন এবং তাঁর সেই পঞ্চমাসব্যাপী কষ্ট যন্ত্রণার কাহিনী যা আমাকে বলেছিলেন, তা শুনলে পাষাণও বিগলিত হয়। তিনি অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন, আমি তাঁকে কয়েকদিন বাসায় রাখি, তারপর তিনি আলমোড়ায় যাবেন বলে আমার নিকট হ'তে বিদায় নিয়ে যান। সেই হ'তে তাঁর আর কোন সংবাদ পাইনি, কিন্তু এখনও তাঁর কথা মনে পড়ে ; এখনও আমার এই দরিদ্র গৃহস্থালীর মধ্যে অচ্যুতানন্দকে পেলে আমি কত সুখী হই এবং তাঁর সঙ্গে হিমালয়ের প্রবাস-কাহিনী ব'লে অতুল আনন্দ পেতে পারি।

এই দিন থেকে আমি আর ডাইরি রাখিনি। কোন দিন আমার ভ্রমণকাহিনী মানুষের

www.pathagar.com

নিকটে ব'লতে হবে সে কথা তো তখন আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আর যে দেশে ফিরে আসবো, সে চিন্তা একদিনের জন্যেও আমার মনে হয়নি। ডাইরি লিখবার অভিপ্রায়ও আমার ছিল না। আমার সঙ্গে একখানি গানের বই ছিল, সেই বইখানি যখন ভাল ক'রে বাঁধান হয়, সেই সময়ে তাতে অনেকগুলি শাদা কাগজ জুড়ে রাখি, উদ্দেশ্য নূতন নূতন গান পেলে সেখানে লিখব। যখন নারায়ণের পথে যাই, সে সময়ে সেই খাতায় শাদা কাগজ দেখে স্বামীজি আমাকে কিছু লিখে রাখতে বলেন এবং তাঁরই আদেশে আমি যে দিন যেখানে যা দেখেছিলুম, তা লিখে রাখি। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পথে শ্রীনগর অবধি এসে আর আমার লেখবার তেমন ইচ্ছা হ'ল না। আসল কথা এই যে, যতই আমি লোকালয়ের দিকে নেমে আসছিলুম, ততই যেন কেমন ক'রে আমার সব গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছিল, আমার মনের অবস্থা ততই কেমন খারাপ হ'চ্ছিল। এ অবস্থায় কি আর রোজনামচা লিখে রাখবার ইচ্ছা হয়। বিশেষ যে পথে গিয়েছিলুম, সেই পথেই প্রত্যাবর্তন ; নূতন ব্যাপার, নূতন দৃশ্য কিছুই আমার সম্মুখে পড়েনি ; ডাইরি না লিখবার ইহাও একটি কারণ।

শ্রীনগর হিমালয়ের মধ্যে হ'লেও সেটা লোকালয়। আমরা লোকালয়ে পৌঁছেছি। শ্রীনগরে আমার অনেক বন্ধু অনেক ছাত্র আছেন, তাঁদের সঙ্গে কয়েকদিন কাটিয়ে আমি ফিরে আসি।

এখন আমার বিদায় গ্রহণের সময়। হিমালয়ের পরম পবিত্র মহিমা আমি কীর্তন ক'রতে পারি নাই। যেটি যেমন ক'রে ব'ললে ভাল হ'ত, যেটি যে ভাবে বর্ণনা ক'রলে ঠিক কথাটি বলা হ'ত, আমার দুর্বল লেখনী তা ব'লতে পারেনি। যে দৃশ্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর সর্বপ্রধান শিল্পী নিজের দুর্বল হস্তের অযোগ্যতায় কাতর হ'য়ে তুলিকা দূরে নিক্ষেপ ক'রে সেই মহান দৃশ্যের সম্মুকে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থেকেই কৃতার্থ হন, আমি সেই হিমালয়ের মহিমা ব'লতে গিয়েছিলুম—আমার স্পর্ধা কম নয়! আর যেরকম ক'রে দেখলে ঠিক দেখা হ'ত, আমার তা মোটেই হয়নি। আমি শ্মশানের জ্বলন্ত অগ্নিশিখা বুকে নিয়ে হিমালয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলুম ; আমি শুধু দুই হাতে হিমালয়ের শীতল বাতাস, হিমালয়ের কঠিন বরফ বুকে চেপে ধ'রেছি ; চারি দিকে যে স্বর্গের দৃশ্য জগৎপিতার অনন্তমহিমা অনুক্ষণ কীর্তন ক'রত, আমার কি সে সব দেখবার শুনবার সময় ছিল, না তেমন আমার মন ছিল? আমি তখন মাথা উঁচু ক'রে কি আকাশের দিকে, স্বর্গের দিকে চাইতে পারতুম ; সে ভাবই তখন আমার ছিল না। আর হৃদয়ের মধ্যে যে কবিত্ব থাকলে মানুষ গাছের ফল, নদীর জল, ফুলের সৌন্দর্য, নির্ঝরিণীর কলতান, বিহঙ্গের হৃদয় মনোমোহন কূজন বর্ণনা ক'রতে পারে, আমার সে কবিত্ব কোন দিনই ছিল না, আমার কবিত্বানুভবের অবকাশ বা সুবিধা কোন দিনই হয় নাই, সুতরাং কিছুই বলা হয় নাই। আমার এই অতি সামান্য ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়ে যদি কারো প্রাণে হিমালয় দর্শনের ইচ্ছা প্রবল হয়, তাহা হ'লেই আমার এ সব লেখা সার্থক হবে, এবং সেই হিমালয়ের দেবতা ভগবানের চরণে যদি কেহ অগ্রসর হ'তে পারেন, তা হ'লে আমার জীবন সার্থক হবে।

---

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মিত্র ও ঘোষ